বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম ঃ
(১৮০০-১৯৮০ খৃঃ)

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০০২ ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

উপস্থাপনায়
মোহাম্মদ আলী আকবর
এম. ফিল. ২য় বর্ষ
রেজিঃ নং ৯৫-(৯৫/৯৬ইং)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ণ পত্র

প্রত্যয়ণ করা যাইতেছে যে, মোহাম্মদ আলী আকবর, এম. ফিল. ২য় বর্ষ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার তত্ত্বাবধানে থেকে "বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম ঃ (১৮০০-১৯৮০খৃঃ)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের (Thesis) কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। আমি বিষয়টি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি। বিষয়টি মৌলিক ও সময়োপযোগী । আমার জানা মতে, অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর অংশ বিশেষ কোন ডিগ্রী লাভের জন্য বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। তাই এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দ্যেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেওয়া যাইতে পারে।

১০-০৭-০২

ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

তারিখ ঃ ১০/০৭/২০০২ইং
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ		III
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা	ঃ		IV
ভূমিকা	ঃ		V-VII
অধ্যায়- ১	ঃ	ফরিদপুরের ভৌগোলিক পরিচয় ও ইসলামের বিস্তার।	১-১৩
অধ্যায়- ২	ঃ	উনিশ শতকে ফরিদপুরের সমসাময়িক অবস্থা।	১৪-১৮
অধ্যায়- ৩	ঃ	বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৮০০-১৮৫০খ্রিঃ)।	১৯-৫৩
অধ্যায়- ৪	ঃ	বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৮৫১-১৯০০ খ্রিঃ)।	৫৪-১২৪
অধ্যায়- ৫	ঃ	বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৯০১-১৯৮০ খ্রিঃ)।	১২৫-১৬৫
উপসংহার	ঃ		১৬৬-১৬৭
তথ্যর্নিদেশ	ঃ		১৬৮-১৭৩

400618

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
Dhaka University Library
400618

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানব জাতির মুক্তির দূত ও হিদায়াতের আলোক বর্তিকা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ এ.আর.এম.আলীহায়দার-এর প্রতি । তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মান সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর আন্তরিক সহযোগিত ছাড়া আমার এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হত না। এজন্য তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সেই সহপাঠিদের যাদের সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণা কর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তারা হলেন যথাক্রমে পিএইচ. ডি. গবেষক মোঃ হুসাইন মাহ্‌মুদ ফারুক ও এম. এ. বাসার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবা মোসাম্মৎ কুলসুম বিবি ও মোহাম্মদ আকফ্‌ত আলী এবং বড় ভাই জনাব বি. এম. আলী আশরাফকে । যাঁদের ঐকান্ত উৎসাহ ও দিকনির্দেশনায় আমি দ্বীনি ইলম শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। তাঁদের অপত্য স্নেহ, অকৃত্রিম ভালবাসা ও দোয়া হলো আমার জীবন চলা ও জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পাথেয়। তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের ছিল এক অনুপম নিয়ামক। এ জন্য আমি তাঁদের প্রতি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের নিকট বিভিন্নভাবে ঋণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরী ছাড়াও ফরিদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে আমি আমার গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ সব প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সুধীজন বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল ।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জুলাই, ২০০২ ইং

গবেষক
মোহাম্মদ আলী আকবর

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

(আ)	-	আলাইহিস সালাম
ইং	-	ইংরেজী
ই. ফা. বা.	-	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ্রিঃ	-	খ্রিস্টাব্দ
খ্রিঃ পূর্ব	-	খ্রিস্ট পূর্ব
ডঃ	-	ডক্টর
পৃ.	-	পৃষ্ঠা
বাং	-	বাংলা
(মৃ.)	-	মৃত্যু
(র)	-	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
(রা)	-	রাদিয়াল্লাহু আনহু
(সঃ)	-	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	-	হিজরী
p .	-	page

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরব জাতি বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেন এবং তাঁরা বিদেশ-ভ্রমণে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অভ্যস্ত ও উন্নত ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব-বণিক দলে দলে বাণিজ্য পরিচালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতে থাকেন এবং এইভাবে ভারতের সঙ্গেও তাঁদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা তাঁদের ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধ-বিহারের (প্রকৃতনাম সোমপুর বিহার) ধ্বংস-স্তূপে আবিস্কৃত একটি প্রাচীন আরবী মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটি আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ রাজত্বকাল) এর শাসনামলে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে (১৭২ হিজরী) আল-মুহাম্মদীয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী যে সময় বঙ্গ বিজয় (১২০৪ খ্রিস্টাব্দে) করেন, তার অনেক কাল আগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র কূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবিশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয় এবং এই ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ায়র বহু পীর, দরবেশ ও সূফী-সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ব-বঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অতঃপর তুর্কীগণের দ্বারা বাংলাদেশে বিজিত হলে বাংলাদেশের পীর, দরবেশ ও সূফী-সাধকগণ ধর্মপ্রচারের মহান ব্রত গ্রহণ করেন। তুর্কী মুসলমান শাসকেরা এদেশ বিজয়ের পরেও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দেশের আভ্যন্তরীণ গঠণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই এদেশে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসারের জন্য দেশীয় ও বহিরাগত পীর, দরবেশ, ওলী, আবদাল, আউলিয়া, সূফী, গাউস্, কুতুব প্রমুখকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

ধীরে ধীরে আরবীয় সূফী-সাধকদের দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। সূফী দরবেশগণ মনে করেছিলেন যে, প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও তা আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়বে। এ ধারণা একেবারে অমূলক নয়; কারণ বনে-জঙ্গলে সাধনা করে ইসলাম কখনও বিস্তৃত হয়নি, হয়েছে লোকালয়ের মধ্যে। তাছাড়া, আরব, পারস্য, বুখারা, বাগদাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু পীর ও সূফী-সাধক যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমণ করেন, তার কিছু পূর্বে এদেশে ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই ধর্মীয় আন্দোলন বা ধর্ম কলহ কেবল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মমতের ক্ষেত্রেও ছিল বিদ্যমান।

বস্তুতঃ হিন্দু-বৌদ্ধের ধর্ম কলহের মূলে হিন্দু ধর্মের সমাজ ব্যবস্থা ছিল প্রধানত দায়ী। বাংলাদেশ-পাক-ভারতের বহু অঞ্চলে সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলাদেশে হল তারই প্রতিক্রিয়া।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হল একেশ্বরবাদ। আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ তা'আলার এই একত্ববাদ প্রচারে সূফী-দরবেশগণ নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। যুগে যুগে এখানে বহু আউলিয়া ও সূফীর আবির্ভাব ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নবুয়ত সমাপ্তির পরে এরাই হলেন প্রকৃত ধর্ম পথের দিশারী। বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র), মাওলানা জালালউদ্দীন রূমী (র), খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (র), বাহাউদ্দীন নাখ্শবন্দ (র), মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) প্রভৃতি বুজুর্গান আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক সূফী ও আউলিয়া ছিলেন। এদের অনুসরণ করে বহু সূফী-সাধক ও দরবেশ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং ইসলাম প্রচারকল্পে বাংলাদেশে আগমণ করে এদেশে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে আউলিয়াদের সম্পর্কেই কিছু জানা যায়। আর তাঁদের মধ্যে হযরত শাহ্-সুলতান বলখী (র), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রূমী (র), বাবা আদম শহীদ (র), মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ (র), শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার (র), শেখ ফরিদউদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর (র), হযরত বদিউদ্দীন শাহ মাদর (১৩১৫-১৪৩৭ খ্রিঃ) (র), হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখ করা যায়। এসব আউলিয়াদের প্রত্যেকেই যে ফরিদপুর এসেছিলেন তা নয়, তবে প্রথমোক্ত চারজন আউলিয়া ফরিদপুর আগমণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারে তাদের প্রভাব রয়েছে। এছাড়া বাকী সকলে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারে আগমণ করেছিলেন। শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার (র) ও শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) এর যে কোন একজনের নামে ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়। বদিউদ্দীন শাহ মাদার মাদারীপুর জেলায় আগমণ করেছিলেন। তাঁর নামে মাদারীপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে।

কাজেই ইসলাম প্রচারের প্রেক্ষপটে আরব বণিকগণের আগমণ, বহিরাগত মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপন, যারা ইসলাম প্রচারের কাজে নিবেদিত সূফী সাধক। যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রচারের ফলে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন ও ফরিদপুর জেলা অঞ্চল মুসলিম রাজ্যভুক্তি, মুসলমানদের শাসনের অবসান এবং ইংরেজদের কূটকৌশল ও ক্ষমতাগ্রহণ, ইংরেজদের ১৯০ বছরের শাসনে উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও ফরিপুরের কৃতি সন্তান হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র), মোহসেন উদ্দীন আহম ওরফে দুদু মিয়া (র) এর বিপ্লবী ভূমিকা, মুসলিম জাগরণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর আত্মিক উত্তরাধিকারী মাওলানা শামসুল হক (র), আবা খালেদ রশিদ উদ্দিন ওরফে বাদশা মিয়া (র), মাওলানা আব্দুল আলী (র), মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল্ আযাহারী (র), মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) প্রমুখ উলামা ও মাশাইখ সেই সংগ্রামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ইসলামী শিক্ষা সাধনার বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ইসলামী শিক্ষা সাধনার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। আলোচ্য বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম ঃ (১৮০০-১৯৮০ খ্রিঃ) অভিসন্দর্ভে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম সাজানো হয়েছে। এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ অভিসন্দর্ভটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ভৌগলিক অবস্থান ও এতে ইসলামের বিস্তারের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচিত সময়ে (১৮০০-১৯৮০ খ্রিঃ) বাংলাদেশ বিশেষত ফরিদপুরের সমকালীন বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮০০-১৮৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত ফরিদপুর এলাকার উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮৫১-১৯০০ খ্রিঃ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯০১-১৯৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহার ও সহায়ক গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ফরিদপুরের ভৌগোলিক পরিচয় ও ইসলামের বিস্তার।

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুরের ভৌগোলিক পরিচয় ও ইসলামের বিস্তার

স্বাধীন বাংলাদেশের একটি গুরত্বপূর্ণ জেলা ফরিদপুর। উত্তাল পদ্মা, আড়িয়ালখাঁ ও মধুমতি বিধৌত এ জেলায় যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন অসংখ্য আলিম উলামা, পীর-মাশাইখ ও রাজনীতিক। বহু ক্ষনজন্মা মহাপুরুষের এ লীলাভূমি কালের নিরব সাক্ষী হয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে বিরাট অবদান রেখে চলছে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সাথে এ জেলার নাম বিশেষভাবে জড়িত। আবহমানকাল থেকে ফরিদপুর জেলার অস্তিত্ব ছিল। ফরিদপুর প্রচীন বঙ্গ ভূমির অন্তর্ভূক্ত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। এ জেলার পশ্চিমে রয়েছে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বাগের হাট জেলা। দক্ষিনে বরিশাল সদর ও পিরোজপুর জেলা। উত্তরে মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও পবনা জেলা। এর পূর্বে রয়েছে চাঁদপুর জেলা। বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্রে এর ভৌগলিক অবস্থান।[১]

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ২২°৪৫ উত্তর হতে ২৩°৫৫ দক্ষিণ এবং ৮৯°১৫ পূর্ব হতে ৯০°৪০ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জেলার আয়তন ৬,৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারী অনুযায়ী জেলার অধিবাসীদের মধ্য ৮১% মুসলমান বাকী ১৯% অনন্যা ধর্মাবলম্বী।[২]

ফরিদপুর জেলার পূর্ব নাম ছিল 'ফতেহাবাদ'। শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ্ শাহ্র (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিঃ) নামানুসারে এ জেলর নামকরণ করা হয় ফতেহাবাদ। ফতেহ শাহ্ আরব দেশীয় একজন ভাগ্যান্বেষী ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি পূর্বের 'ধলেশ্বরী পরগণার' নাম পরিবর্তন করে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন ফতেহবাদ। কবি আলাউলের ভাষায় ঃ-

"গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেহবাদ ভূম
বৈসে সাধু সৎলোক হর্ষ মনোরম।
অনেক দানেশ মন্দ খলিফা সুজন
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থান"।[৩]

পরবর্তীতে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডাল হৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) খ্রিস্টাব্দে যশোর ও ঢাকা জেলার কিয়দাংশ নিয়ে একটি নতুন জেলা গঠন করেন এবং এই নতুন জেলার নামকরণ করেন ফরিদপুর।[৪] ফরিদপুর জেলার নামকরণের পিছনে দু'জন সূফী সাধকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ- এক জন শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র) (১১৩০-১২৩০ খ্রিঃ) অপরজন শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) (১১৭৭-১২৬৯ খ্রিঃ)।[৫] জনশ্রুত থেকে জানাযায় ফরিদপুর কোর্ট কাচারীর দ্বার প্রান্তে 'শাহ্ ফরিদ' নামে যে মাযারটি অবস্থিত তা কোন সূফী সাধকের মাযার। আর ঐ মাযারের নামানুসারেই ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়েছে।[৬]

কারো মতে উক্ত মাযার শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র) এর। আর তাঁর নামানুসারেই এ জেলার নামকরণ করা হয়েছে। কারো মতে, উক্ত মাযার শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) এর আর তাঁর নামানুসারেই এ জেলার নামকরণ করা হয়েছে। তবে এ দু'জন সূফী সাধকের এক জনকেও ফরিদপুরে সমাহিত করা হয়নি। শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র) কে ইরানের নিশাপুরে সমাহিত করা হয় এবং শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) কে পাঞ্জাবের পাক পতন শহরে সমাহিত করা হয়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

তবে উভয় সূফী সাধক ইসলাম প্রচারে ফরিদপুর শহরে আগমন করেছিলেন। শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর 'শাহ্ ফরিদ দরগা' নামক স্থানে পুরাতন যে বটগাছ ছিল তার ছায়ায় বসে আল্লাহ্র আরাধনা ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ফলে অনেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। অপর দিকে শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র) একজন ব্যবসায়ী ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তিনিও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ফরিদপুর আগমন করেন। ফরিদপুরে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত ঘটে ছিল। তাদের দাওয়াতের ফলে ফরিদপুরে ইসলামের প্রসার ঘটে। তাঁদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য পরবর্তীতে 'ফতেহাবাদের' পরিবর্তে এ জেলার নামকরণ করা হয় 'ফরিদপুর'।[৮]

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। ১৯৮৩ খ্রিঃ ১৮ জুলাই তৎকালীন (১৯৮১-১৯৯০ খ্রিঃ) রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয় করণের উদ্দেশ্যে মহকুমাকে জেলায় পরিনত করেন।৯ ফলে বৃহত্তর ফরিদপুরকে পাঁচটি জেলা (১. ফরিদপুর সদর ২. গোপালগঞ্জ ৩. মাদারীপুর ৪. শরীয়তপুর ৫. রাজবাড়ী) ও ২৭ টি উপজেলায় পরিনত করেন। ১৯৯২ খ্রিঃ ৩০ জুন অন্য এক ঘোষনা বলে পূর্বঘোষিত উপজেলাকে থানা নামে ঘোষণা করা হয়। পুরাতন মহকুমা (নব সৃষ্ট জেলাগুলোকে) এক যোগে বুঝানোর জন্য সাবেক ফরিদপুরকে বর্তমানে বৃহত্তর ফরিদপুর নামে অবিহিত করা হয়।[১০]

ইসলামের বিস্তার ঃ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, তৌহিদবাদী সভ্যতা, সংস্কৃতির শেষ শিক্ষক ও সত্য ধর্ম ইসলামের সর্বশেষ প্রচারক। তিনি নবুয়াত লাভের পর দীর্ঘ ২৩ বছর ইসলাম প্রচার করেন। আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করেন। তিনি ১৩ বছরে স্বল্প সময়ের পরিসয়ে একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধমীর্য় জীবনের সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তিনি জীবদ্দশায় এ দায়িত্বকে যথাযথ ভাবে পালন করে যান। তাঁর ইন্তিকালের পরে সাহাবাগণ, সাহাবাগণের পরে তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীগণের পরে তাবে তাবেয়ীগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্য বাণী নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যা যে, উক্ত প্রচারকদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ইসলামের সূচনা হয়। তবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় । যথা ঃ- ১. আরব বনিক আগমন। ২.আউলিয়া দরবেশদের ইসলম প্রচার। ৩. মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিজয়। তবে আরব বনিক ও আউলিয়া দরবেশদের আগমনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বৃহওর ফরিদপুয় জেলার ইসলামের সূচনা ও প্রসার ঘটে।[১১]

১. আরব বণিকদের আগমন ঃ

ইসলামের আগমনের পূর্ব থেকে আরবরা তাদের জীর্বিকা নিবাহের জন্য ব্যবসা বানিজ্যকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই তারা ইসলাম পূর্ব যুগ হতে ব্যবসা-বানিজ্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেন। আরব বনিকগণ বঙ্গ বিজয়ের (১২০৪ খ্রিঃ) বহু পূর্বে থেকে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করতেন। কেননা সুদূর অতীতকাল হতে আরবগণ সমুদ্র যাত্রা ও বানিজ্যিক কার্যকলাপে পৃথিবীর সেরা জাতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই আরবগণ সাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দূর দেশে গমনাগমন করেছিল। ৭১২ খ্রিঃ আরব কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, দেবল বন্দরে রাজা দাহিরের জলদস্যু কর্তৃক আরব বণিকদের মালামাল ও জাহাজ লুণ্ঠিত হয়।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু রাজা দাহিরের জলদস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়ার কারণে মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় করা হয়। তবে আরব বনিকেরা তারও পূর্বে সিংহল ও মালাবর অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন কারেন। আর বনিকদের প্রাচ্য দেশীয় বানিজ্য এত বেশী প্রসার লাভ করে যে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর আরব্য জলাশয়ে পরিনত হয়। ইসলাম পূর্ব যুগ হতেই আরব বনিকগণ সমুদ্র পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং এখানে পণ্য বিনিময় করতেন। সেই যোগাযোগের সুত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরব বণিকরা ইসলাম প্রচারে এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়। ডক্টর এ, রহীম তাঁর "Social and Cultural History of Bangal" গ্রন্থে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, "চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, এমন কি চাটগাঁ নামটাও আসলে তাদেরই দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থা বলে আরব বণিকরা এর নামকরণ করেন শাতি-উল-গঙ্গা (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ) তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও ও চিটাগাং নামের রূপান্তর ঘটে"।[১৩]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে যে অতি প্রাচীনকাল হতে আরব বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ আরাকান রাজবংশীয় উপাক্ষ্যাণ "রাদজা তুয়ে" বর্ণিত একটি উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছে, এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রাদজা-গীর বংশধর মহত ইজ্জাত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহন করেন। এই রাজা ২২ বছর রাজত্ব করার পরে মারা যান।[১৪] কথিত আছে , এ সময়ে (৭৮৮-৮১০) কয়েকটি বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। খ্রিস্টিয় ৭ম ও ৮ম শতকে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন রিচার্ড সাইমন্ড বলেছেন, "The culture that developed in Bengal was entinely different from that of Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the in fluence of the Arabs as early as the 7th century. A.D. and many of Arab veyegers and traders had left a Permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very early in this respective sail"[15]

অষ্টম ও নবম শতকে আরবীয় মুসলমান বণিকরাই এ পথে চীন পযর্ন্ত বাণিজ্য করতেন। পাহাড়পুরের প্রত্নত্বিক খননকার্য আমাদের এক অভিমত আরো শক্তিশালী করে। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্বিক খনন কার্যের ফলে বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশা হারুন-অর-রশীদের আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী সনের (৭৮৮ খ্রিঃ) তারিখ খোদিত রয়েছে। এসময় বাংলার নৃপতি ধর্মপালের শাসন চলছিল। ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্যদিকে কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলে ও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের দেবপালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন।[১৬]

বস্তুত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলামের সুত্রপাত হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবী মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। কিন্তু ডঃ আবদুর রহীম তাঁর চট্টগ্রামে ইসলাম গ্রন্থে এ ধারনা সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তবে আরব বণিকগণ চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীনকাল থেকে আবরদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব লক্ষণীয়।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবীয় শব্দের তুলনায় এর সংখ্যা দ্বিগুণের ও বেশী। চট্টগ্রামের অনেক পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশদ্ভোত বলে দাবী করেন। চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায় এখনও আরবী নাম যেমন আল করণ, সুলক বহর, বাকালিয়া ইত্যাদি নামের প্রচলন রয়েছে। উপরোক্ত তথ্যাবলী বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে আরব বণিকদের প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও আরবীয় রক্তের মিশ্রণই এলাকায় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।[১৮]

অপর পক্ষে প্রাচীনকাল থেকেই ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ায় একটি সামুদ্রিক বন্দর ও সভ্য জনপদের কথা ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে। এ বন্দরের মাধ্যমে আরব বণিকগণ এ অঞ্চলে আসার বিষয়টি মোটেও বিচিত্র নয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে বাঙ্গালী বনিকগন এ বন্দর হয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেত। বিদেশী বনিকরাও এ বন্দরে ভীড় জমাত। এখানে বানিজ্যতরী ও জাহাজ নির্মাণ হতো।[১৯]

তবে এখানে বাঙ্গালী বণিক বলতে মুসলমানদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা, হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা রকম বাধা-নিষেধের দরুন সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। ফলে হিন্দুরা পানিপথে তাদের প্রাধান্য রক্ষা করতে পারেনি। ৭০০ খ্রিঃ আরবরা প্রাচ্য সমুদ্রে নৌযানের উৎকর্ষে হিন্দুগণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২০]

৮ম ও ৯ম শতক কিংবা তার পূর্ব ও পরে কোটালিপাড়া বা ফরিদপুরের ভূমি গঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্থল ভাগ বদ্বীপ বা চট্টগ্রামের খুব নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরবগণ লবন ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ৮ম ও ৯ম শতকে সন্দ্বীপে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল বলে অনেকের ধারণা।[২১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরব বণিকগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরিদপুর অঞ্চলে আগমন করেছিলেন এবং আরব বণিকগণ তাদের ব্যবসায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের বাণী প্রচার করেন। তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র বা ইসলামী বিধান মতে লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় করে সহজ বাজার নীতি প্রতিষ্ঠা করে এদেশের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মূলত আরব বণিকদের সাহচার্য বাংলার মানুষ, একজন বিশ্বস্ত ও ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট ইসলামের আর্দশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আর তার সত্যানুরাগী মানুষকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাছাড়া আরব বণিকদের অনেকে এদেশে আগমন করে বহুদিন অবস্থানের ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আর সেই সুবাদে কেউ কেউ এ অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। কেননা উত্তপ্ত মরুভূমির চেয়ে বাংলাদেশের আবহাওয়া মানুষের বসবাসের অধিক উপযোগী ছিল। তাই তারা ফরিদপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিজেকে নিয়োগ করেন।

২. আউলিয়া দরবেশদের আগমন ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় কিছুসংখ্যক সাহাবী সংসারের মোহ্ ত্যাগ করতঃ কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে আত্মস্থ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উচচস্তরে উন্নীত হন। কোরআন, হাদীসের শিক্ষা নিজে গ্রহণ এবং অপরকে তা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য, তাঁরা মুসলমানদের রাজ্য বিজয়ের অনেক পূর্বেই কোরআন, হাদীসের শিক্ষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তাই ভিন্ন অঞ্চলে এবং এর প্রচার করতে গিয়ে পবিত্র মক্কা ও মদীনার বাইরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। এমনকি মদীনা হতে কয়েক হাজার মাইল পূর্বে সুদূর চীনের ক্যান্টন শহরেও শেষ নবী (সঃ) এর জনৈক সাহাবীর জীবনাবসান হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সঃ) এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশের যেখানেই আস্তানা স্থাপন করেছেন সেখানেই জ্ঞান চর্চার একটি ইসলাম প্রচারে খানকা গড়ে তোলেন। কেন্দ্র করে ইসলামের প্রতি নিবেদিত প্রান একটি শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে। পারস্য, ইরাক, খোরাসান, হিরাত, বলখ প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন শহরে তাঁদের শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে উঠে। এ সকল কেন্দ্র থেকে পরবর্তীকালে আলিম, মুজাহিদ, সূফী ও ওলিগন ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী নিয়ে সুদূর দক্ষিণে ভারত উপ-মহাদেশে পাড়ি জমান। তাঁদেরই কয়েকটি দল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে দশম-একাদশ শতকে দিল্লী অতিক্রম করে গঙ্গোয় ব-দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। তবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গঙ্গোয় ব-দ্বীপ বলতে ফরিদপুর ও তার আশপাশের জেলাগুলোকে বিশেষভাবে বুঝানো হতো।[২৩]

আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত এসব উলামা-মাশাইখ, সুফী-সাধকদের কার্যক্রম শুধু খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাঁরা জন সাধারণের অন্তরে ও সমাজ জীবনে বিপুল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। তারা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পান। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণরা এদেশের হিন্দুদের বর্ণবাদের নাগপাশে বাঁধতে ব্যস্ত, তখন এসব সূফী সাধক তাদের কাছে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী পেশ করে তাদের হৃদয় জয় করেন। আর এসকল আউলিয়া দরবেশ (সুফীসাধক) দেশের অভ্যান্তরে প্রবেশ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ইসলামের বাণী, আদর্শ ও রীতিনীতি প্রচার করেন। তখন তাঁদের জন্য প্রচলিত নিয়মে মসজিদ মাদ্‌রাসার প্রয়োজন হয়নি, তাঁরা কোন সংগঠনেরও ব্যবস্থা করেননি। লোকালয়ের আশেপাশে অনাবৃত আকাশের নিচে গাছের ছায়ায়, টিলায় অবস্থান করে একদিকে সাধনা করেন অপর দিকে সাধনার ফল জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন।[২৫]

তৎকালীণ সমাজে ইসলাম প্রচারের এটাই ছিল একমাত্র মাধ্যম। কেননা তখন চারিদিকে বিধর্মীয় সভ্যতা বিরাজ করছিল। ইসলামের বাণী শোনার মত আগ্রহ তাদের ছিল না। তখন সমাজের উচ্চস্তরে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। যার কারণে তাদের পূঁথি বা মন্ত্র পাঠকে অতি পবিত্র বলে মনে করা হতো। সমাজের ক্ষত্রিয়, বৈশূ ও শূদ্ররা জ্ঞানের আলো থেকে ছিল অনেক দূরে। ফলে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা কোন ধর্ম চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। উক্ত পরিবেশে আউলিয়া দরবেশগণ ইসলাম প্রচারের জন্য তাদের নিকটস্থ পরিবেশ থেকে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। এ কারণে কখনো তাঁদেরকে বিধর্মীদের সাথে সংঘর্ষে যেতে হয়নি। তবে যখন উত্তর উত্তর ইসলামের প্রসার ঘটে তখন, অনেক রাজার স্বার্থে আঘাত হানলে কোন কোন রাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। অবশ্য তাঁদেরকে নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের ইসলামের প্রচারক হিসেবে গন্য করা যেত না। বাংলাদেশে অজস্র আউলিয়া, সূফী, দরবেশ এসেছিলেন এবং এদেশে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলাদেশে একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীতে ওলীগণ ইসলাম প্রচার সর্ম্পকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তার পূর্বে কেউ এদেশে ইসলাম প্রচারে আগমন করলেও তাদের সর্ম্পকে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যারা ইসলাম প্রচারে আগমন করেছিলেন তাঁদের মধ্য হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (র), শাহ্ মোহাম্মাদ সুলতান রূমী (র), বাবা আদম শহীদ (র), মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ (র), মৃসন শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র), শেখ ফরিদ ইদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) ও হযরত বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার (র) প্রমূখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তবে এ সকল আউলিয়া কেরাম সকলে ফরিদপুর আগমন করেননি। মোট চারজন ফরিদপুরে আগমন করেছেন বলে কোন প্রমান পাওয়া যায় না। তবে ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারে তাদের অবদান রয়েছে। শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (র) ও শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) ফরিদপুর ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে প্রমান পাওয়া যায়। হযরত বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার(র) ইসলাম প্রচারে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর এলাকায় আগমন করেন। [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

শেখ ফরিদউদ্দীন আক্তার (র) ঃ

শেখ ফরিদউদ্দীন আক্তার (র) এর প্রকৃত নাম শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবু বাকার ইব্রাহীম। তাঁর ডাক নাম ফরিদউদ্দীন। তিনি ৫৩১ হিজরী মোতাবেক ১১৩৩ খ্রিঃ মধ্য এশিয়ার নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আতরের ব্যবসা করতেন বলে লোকে তাঁকে আত্তার বলা হয়।[২৭] পরবর্তীতে তিনি এ নামেই পরিচিতি লাভ করেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেন। কর্মজীবনে আতরের ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে কোন এক সময় ভিক্ষুকের অনুশোচনায় নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সব কিছু গরীবদের মাঝে বন্টন করে নিজে ফকিরবেশে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য রুকন উদ্দীন আত্তার ও শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদীর শরণাপন্ন হয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপুর্ন জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি কবে কখন ফরিদপুর জেলায় আগমন করেন, তার সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকালে শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জেসকরের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি ১২৩০ খ্রিঃ নিশাপুরে ইন্তি-কাল করেন। তাঁকে নিশাপুরে সমাহিত করা হয়।[২৮]

শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) ঃ

ফরিদপুরে আগমনকারী অপর এক সূফী সাধক শেখ ফরিদ উদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র)। তিনি ১১৭৭ খ্রিঃ (৫৬৯ হিজরীতে) পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত খোটওয়াল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৬৯ খ্রিঃ পাঞ্জাবের পাক পতনে ইন্তিকাল করেন।[২৯] সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর পিতার নাম শেখ জালালউদ্দীন সুলায়মান (র)। শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) মাত্র এগার বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ হন। অতঃপর খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র) এর খলিফা কুতুবল আলম বখতিয়ার কাকীর (র) (১১৪২-১২৩৬ খ্রিঃ) অধীনে থেকে মুলতানে শিক্ষা লাভ করেন।[৩০] অতঃপর বখতিয়ার কাকী তাঁকে শিক্ষা লাভের জন্য পরস্যের কান্দাহারে মাওলানা সৈয়দ নাজির আহমদের নিকট প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ৫৯৩ হিঃ পযর্ন্ত কোরআন, হাদীস, ফিক্‌হ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ৬১২ হিঃ বখতিয়ার কাকীর নিকট হতে খিলাফত লাভ করেন। খিলাফত লাভের পূর্বে ১৯ বছর ও খিলাফত লাভের পরে ২১ বছর দেশ বিদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে দামেস্ক, নিশাপুর, গজনী, বুখারা, বায়তুল মোকাদ্দাস ও সুলতান প্রভৃতি স্থান ভ্রমন করেন। তিনি দিল্লীতে থাকা অবস্থায় এক বা একাধিকার ফরিদপুরের ইসলাম প্রচারে আগমন করেন। ফরিদপুরে ঐতিহ্যবাহী পুরাতন বট গাছটির নিচে শেখ ফরিদের ধ্যানমগ্ন থাকা ও চিল্লার কথা শোনা যায়। আসলে তিনি তাঁর পরিভ্রমনের সময় সেরূপ চিল্লা করতেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে । শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ খোটওয়াল থেকে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়ে উচ এ পৌঁছতেন। সেখানে ৪০ দিন যাবত এশার নামায শেষে একটি রশি দিয়ে পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে কূপের মধ্যে ঝুলে পড়তেন। উক্ত মসজিদের মোয়াজ্জিন রশীদ উদ্দীন ফজরের আযানের সময় তাঁকে কুপ থেকে টেনে উঠাতেন। এভাবে চিল্লা করে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। তবে তিনি যে চিল্লা করতেন তার সাথে ফরিদপুরের চিল্লার মিল পাওয়া যায়। কথিত আছে, ফরিদপুর শাহ্ ফরিদের দরগায় যে পুরানো বট গাছ ছিল। তিনি উহার ছায়ায় বসে আল্লাহর ইবাদত করে সাধনায় লিপ্ত থাকেন ও বিধর্মীদের ইসলামের দাওয়াত দেন।[৩১]

শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ(র) ফরিদপুর ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন। চট্টগ্রামে শেখ ফরিদের চশমা নামক স্থানেও তিনি কিছু দিন ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এছাড়া পাবনা জেলার একটি থানার নামও শেখ ফরিদের নামানুসারে 'ফরিদপুর' রাখা হয়েছে। চাঁদপুর জেলার একটি থানার নাম 'ফরিদগঞ্জ' রাখা হয়েছে। [৩২]

Dhaka University Institutional Repository

শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ (র) ফরিদপুরে 'শাহ ফরিদ দরগাহ' নামক স্থানে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসেছিলেন। তবে তিনি কত সনে কোন তারিখে ফরিদপুর এসেছিলেন তার কোন সঠিক দিন তারিখের তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি যে যুগে ফরিদপুর এসেছিলেন সেই যুগ ছিল ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফরিদপুরে ইসলাম বিজয়ী বেসে আগমন। এয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে তার পূর্ণতা আসে। কাজেই শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ (র) ফরিদপুরে এসেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৩৩] তাছাড়া তাঁর ফরিদপুর আগমনের ক্ষেত্রে তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। যথাঃ (১) শেখ ফরিদের মায়ের দোয়া ও নির্দেশে দেশ ভ্রমণ করে মানুষের নিকট ইসলাম প্রচার করা (২) দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে দিল্লী হতে চট্টগ্রাম আসার পথছিল ফরিদপুর (৩) তখন মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা না থাকায় ফরিদপুর আসার প্রমান পাওয়া যায়। সূফী সাধকগণ গাছের ছায়ায় বসে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কাজেই এসব যুক্তি থেকে শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদের ফরিদপুরে আসার প্রমান পাওয়া যায়।[৩৪]

শাহ্ বদি উদ্দিন শাহ্‌মাদার(র) ঃ

শাহ ফরিদউদ্দীন আত্তার (র) ও শেখ ফরিদউদ্দীন মাসুদ গঞ্জেশকর (র) ব্যতীত যে সকল আউলিয়া দরবেশ ফরিদপুরে ইসলাম প্রচারে আগমন করেন, তাদের মধ্যে হযরত বদিউদ্দীন শাহ্ মাদারের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩১৫ খ্রিঃ সিরিয়ার হলব শহরের জুনার বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী কোদওয়াত উদ্দীন ওরফে হযরত সাইয়েদ আলী হাবলী (র) মাতা সাইয়েদ হাজেরা ফাতেমা ছানী। হযরত বদিউদ্দীন শাহ্‌মাদার (র) পিতা মাতা উভয় দিক হতে হযরত আলী (র) এর বংশধর ছিলেন। তিনি ১৪৩৭ খ্রিঃ ভারতের কানপুরে ইন্তিকাল করেন।[৩৫] চৌদ্দ বছর বয়সে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ সাহিত্যে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করে ইসলাম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি দীর্ঘ বার বছর এক বস্ত্রে ও অনাহারে নির্জনে আল্লাহর আরাধানায় কাটিয়েছেন বলে জানা যায়। তিনি কখন বাংলাদেশে আগমন করেন তার কোন সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে তিনি আজমীরে খাজা মইনুদ্দিন চিশতিয় (র) সাথে কোকলা পাহাড়ে মোলাকাত করেন।[৩৬] সেখান থেকে তাবলীগের কাজ করতে করতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেন এবং অসংখ্য অমুসলমান তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি মাদারীপুর আগমন করেন। মাদারীপুর ছাড়া শেরপুরের কেল্লাপুষি, সিলেট, কুহিস্তান, নেপাল ও বদরীনাথ সহ বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। সমগ্র বাংলাদেশে তাঁর অনুসরণে ইসলাম প্রচার এবং আল্লাহর ইবাদতের বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যা পরে 'মাদারীয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিতি লাভ করে।[৩৭]

হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র) ঃ

হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র) বাগদাদের বাদশা ফখরুদ্দীন শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১০০ জন অনুসারী নিয়ে প্রথমে দিল্লীতে হাজির হন। দিল্লী হতে ১৪১২ খ্রিঃ ফরিদপুর আগমন করেন। তিনি বাগদাদ থেকে আসার সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর এক গোছা চুল, আলী (রা) এর গোঁফ, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) এর গায়ের জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বর্তন ও চন্দন কাঠের তৈরী তাসবীহ সঙ্গে নিয়ে আসেন। তৎকালীন দিল্লীর বাদশা ছিল হরিশচন্দ্র । তিনি রাসূল (সঃ) এর চুল দর্শন করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শাহ্ আলী বাগদীকে ১২ হাজার বিঘা লাখেরাজ (খাজনা বিহিন) জমি দান করেন। তিনি ১০০ জন শিষ্যের মধ্যে হতে তিন জনকে নিয়ে ঢোল সমুদ্র গের্দা নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন।[৩৮] তাদের বসবাসের কারণে এ স্থানের নামকরণ করা হয় "মীরানে গের্দা"। তাঁর বাকী সকল অনুসারী বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় ইসলাম প্রচার করে চিল্লা আদায় কালে ৩৯ দিনের মাথায় ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর ইন্তিকালের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা গেজেটিয়াসের সংকলন অনুযায়ী ১৫৭৭ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন। অনেকে মনে করেন, তিনি ১৫১৭ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন। কিন্তু ডঃ আইউব আলী ও ডঃ আ,ন,ম, রইসউদ্দীন শাহ, আলী বাগদাদীর ফরিদপুরে আগমন ১৪১২ খ্রিঃ মৃত্যু ১৪৯৮ খ্রিঃ উল্লেখ করেন।[৩৯]

উপরোক্ত আউলিয়া, সূফী সাধক ব্যতীত ফরিদপুর জেলায় ১৮০০ খ্রিঃ পূর্বে যে সকল আউলিয়া, সূফী সাধক ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন।

১. সৈয়দ শাহ হুসাইন তেগ বুরহান (র)
২. হযরত শাহ্ আবদুর রহমান গঞ্জেরাজ (র)
৩. হযরত শাহ্ বদিউদ্দীন (র)
৪. সৈয়দ শাহ্ ওসমান (র)
৫. হযরত শাহ্ কলিমউল্লাহ (র)
৬. হযরত শাহ্ লাল (র)
৭. হযরত শাহ্ সূফী শায়খ শাহ আলী ছতরী (র)
৮. শাহ্ সূফী হাক্কানী (র)
৯. শাহ্ জালাল বাগদাদী (র)
১০. শাহ্ রোখারী বাগদাদী (র)
১১. শাহ্ সুফী বুটকি বাগদাদী (র)
১২. শাহ্ চান্দ বাগদাদী (র)
১৩. শাহ্ জায়েদ বাগদাদী (র)
১৪. শাহ্ ময়েজ উদ্দীন তেগবোরহানী ইয়ামেনী (র)
১৫. হযরত উড়িখান শাহ্ (র)
১৬. শাহ্ মইজউদ্দীন কানী (র)
১৭. সৈয়দ শাহ্ হাবীবুল্লাহ (র)
১৮. হযরত শাহ্ আবদুল ওহাব (সদরে জাহান) (র)
১৯. হযরত শাহ্ মাসউদ হক্কানী (র)
২০. হযরত শাহ মীর (র)
২১. হযরত শাহ্ আবদুর রহমান দানিশমন্দ (র) [৪০]

৩. মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিজয় ঃ

মুসলিম জাহানের অধিপতি বাগদাদের হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১১ খ্রিঃ সিন্ধু আক্রমন করে ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেন। পরবর্তীতে গজনীর সুলতান সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ ৯৭৭ খ্রিঃ ক্ষমতা গ্রহণ করে বহুবার ভারত অভিযান করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। এভাবে মুসলিম শাসকগণ মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্যতীত ভারতের সবটুকু অংশ অধিকার করেন।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফগানের তুর্কী মুজাহিদ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ বা ১২০৪ খ্রিঃ মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলার সেন রাজার রাজধানী নদীয়া আক্রমন করে জয়লাভ করেন। বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের কয়েক শত বছর পূর্বে থেকে মুসলিম সূফী, দরবেশ, আলেম ও মুজাহিদগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করে আসছিলেন। সম্ভবত ইসলাম প্রচারকদের সাফল্যই বখতিয়ার খিলজীকে বঙ্গ অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে। বখতিয়ার খিলজী যখন নদীয়া ও গৌড় অধিকার করেন তার মাত্র কয়েক বছর পর শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী গৌড় থেকে ১৭ মাইল দুরে পান্ডুয়ায় অবস্থান করে সারা বাংলায় ইসলাম প্রচার অভিযান পরিচালনা করতেন।[৪২]

বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয়ের পর লক্ষণাবতী বা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। গৌড় অভিযানের পর বখতিয়ার খিলজী দু'বছর পর্যন্ত আর কোন অভিযানে বের হননি। এ দু'বছর গৌড়ের শাসন-শৃংখলা সুবিন্যস্ত করেন। সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে, নিজের বিভিন্ন সহযোগী সেনা নায়ককে বিভিন্ন বিভাগের শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। এ সকল মাদ্‌রাসাগুলোতে মুসলমানদের ইসলাম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। সূফী দরবেশদের জন্য তিনি কয়েকটি খানকাও নির্মাণ করেন।[৪৩]

বখতিয়ার খিলজী গৌড় অভিযানের দুবছর পর তিব্বত অভিযান করেন। কিন্তু তিব্বত অভিযানে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং বখতিয়ার খিলজী পীড়িত ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় বখতিয়ার খিলজী ১২০৬ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন।[৪৪]

বখতিয়ার খিলজীর ইন্তিকালের পর ১২০৬ খ্রিঃ হতে ১৩৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩২ বছর ২৩ জন শাসনকর্তা বাংলাদেশ শাসন করেন। তাদের অনেকেই দিল্লী থেকে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তখন বাংলার শাসন কর্তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এদিক দিয়ে এ আমলের মুসলিম বাংলাকে স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ বলা যায়।[৪৫]

বখতিয়ার খিলজী লাখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করলেও তিনি এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোর্টে (বর্তমানে গঙ্গারামপুর) বসে শাসন পরিচালনা করতেন। লাখনৌ হতে বাংলাদেশ বিজয়ের অভিযানের জন্যে বেশ কয়েকবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১২৪২ খ্রিঃ তুঘরল খাঁ (১২৩৬-১২৪৫) কর্তৃক গংগা যমুনা অঞ্চল অধিকার করার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনীসহ পরিকল্পনার প্রারম্ভেই দেখা গেল উড়িষ্যাধিপতিড় নরসিংহদের ঢ়ার ও বঙ্গ আক্রমনে এগিয়ে এসেছেন ফলে উক্ত বাহিনীদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে অবশেষে এ অঞ্চল অধিকার স্থগিত হয়ে যায়। অতঃপর ইয়যউদ্দীন বলবন-ই-ইউজবকী (১২৫৭-১২৫৯) ১২৫ খ্রিঃ বাংলা আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে মালিক তাজউদ্দীন আর সালাম খাঁ লাখনৌতির গদী দখল করেন। ইয়যউদ্দীন বলবন তাজউদ্দীন আরসালানের সাথে যুদ্ধে নিহত হন।[৪৭]

লাখনৌতির (গৌড়) একুশতম শাসক সুলতান মুগীসউদ্দীন তুগরীল (১২৭২-১২৮১ খ্রিঃ) ছিলেন মামলুক বংশীয় লাখনৌতির শাসনকর্তাদের অন্যতম। তিনি দিল্লীর গিয়াসউদ্দীন বলবন কর্তৃক নিয়োজিত লাখনৌতির আমিন খানের সহকারী শাসক ছিলেন। তিনি সহকারী শাসনকর্তা থাকাকালেই পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অংশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি পদ্মা নদী দুই তীরবর্তী বর্তমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ১২৮০ খ্রিঃ বিজয় করেন। বর্তমানে রাজবাড়ির ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নারকিল বাড়িতে (নড়িয়া) শক্তিশালী দূর্গ স্থাপন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিজয়ী বেশে ফরিদপুর জেলায় ইসলামের বাণী নিয়ে আগমন করেন। তাই তাকে ফরিদপুরে মুসলিম বিজয়ের নৃপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। মুগীসউদ্দীন তুগরীলের পর হতে ১৭৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অনেক মুসলিম শাসক ফরিদপুরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য শাসকগণ হলেনঃ সুলতান রুকনউদ্দীন বরবক শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১খ্রিঃ) তাঁর রাজত্ব কালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য আক্রমন করে কোটালীপাড়ার রাজা জয়দেবকে করদানে বাধ্য করেন। এসময় থেকে ফরিদপুর অঞ্চল পুরোপুরি মুসলিম শাসনে আসে।[৪৯] ১৪৮১ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন ইউসুফ শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ। কিন্তু রুকনউদ্দীন বরকপের ছোট ভাই ফতেহ্ শাহ্ সিকান্দর শাহ্কে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। এই ফতেহ্ শাহ্ ইতিহাসে জালালউদ্দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭) নামে পরিচিত। ফতেহ্ শাহ্ রাজ্য সীমা অক্ষুন্ন রাখেন। ফলে এ সময় ফরিদপুরের মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় মুসলমানরা গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। আর এ জালালউদ্দীন ফাতেহ্ শাহ্রে নামনুসারে ফরিদপুরের নামকরণ করা হয়েছিল ফতেহ্াবাদ।[৫০]

১৪৯৩ খ্রিঃ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ বাংলার ক্ষমতায় আসেন। হোসেন শাহের সময় ফতেহ্বাদ অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসে। প্রফেসর বোলস্ম্যান বলেন, হোসেন শাহ্ প্রথম ফতেহাবাদের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। আর উক্ত মুদ্রা ফতেহ্বাদ টাকশাল হতে তৈরী করা হত। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ তাঁর অধিকৃত অঞ্চল সমূহকে যশোর, খুলনা, পাবনা ও ফতেহাবাদ পরগনায় বিভক্ত করেন।[৫১]

এভাবে ১৭৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মুসলমান শাসক দ্বারা ফরিদপুর শাসিত হলেও ১৭৫৭ খ্রিঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হলে মুসলমানদের ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের উপর শুরু করে জুলুম, নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচার। এসকল জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত হতে মুসলমানদের উদ্ধার ও ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য ১৮০০ খ্রিঃ হতে ১৯৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত অসংখ্য উলামা ও মাশাইখদের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় আবির্ভাব ঘটে। যে সকল উলামা ও মাশাইখের আবির্ভাবে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উলামা ও মাশাইখদের জীবন ও কর্ম নিম্নে আলোচনা করা হলো।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. Nurul Islam khan. Bangladesh District Gazetteers Faridpur. Bangladesh Goverment press, Dacca 1977. p. 405

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১ ; তোফাজ্জেল হোসেন, মানচিত্রে কেমন আমরা বাংলাদেশ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৬ ইং পৃ. ৪৩, ৪৫, ৪৮

৩. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম আধুনিক প্রকাশনী ১৯৮০ইং পৃ. ২৩

৪. সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলাম,পৃ. ১৮

৫. মোঃ আআবদুর জলিল খান, ফরিদপুর গাইড, ১৯৯৮ইং পৃ. ৩১

৬. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফি সাধক, ই, ফা,বা, ১৯৮৮ ইং পৃ. ১৬৪

৭. মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ই, ফা,বা, ১৯৯৩ ইং পৃ.২

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, (১৪খন্ড) পৃ.৫০৭

৯. মোঃ আআবদুর জলিল খান, ফরিদপুর গাইড, ১৯৯৮ইং পৃ.৩১

১০. প্রাগুক্ত,পৃ.৩১

১১. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭

১২. সৈয়দ সুলতান নদভী (অনুঃ হুমায়ুন খাঁন) আরব নৌবহর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ ইং ভূমিকা

১৩. P.K.Hitti.The aryan london.1996. Introduction

১৪. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৬

১৫. K.A. Nizami some Aspects of Religion and politics in India in thirtenth Century.

১৬. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৭. K.A. Nizami some Aspects of Religion and politics in India in thirtenth Century.

১৮. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১৯. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২১. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২২. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৩. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৪. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফি সাধক, ই, ফা,বা, ১৯৮৮ ইংপৃ. ১১

২৫. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত,পৃ.১০

২৬. Dr.Md. Enamul Haq. A History of sufism in Bengla. Dhaka 1995.p. 239

২৭. সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ,ই,ফা,বা, ১৯৯৩ ইং পৃ.১১০

Dhaka University Institutional Repository

২৮. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৮

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩০. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩১. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ .৩

৩২. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৪. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৩৫. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

৩৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৩

৩৭. প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৪

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯, ৮০

৩৯. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮

৪০. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,পৃ.৮৪-৯২

৪১. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, (১৪খন্ড) পৃ.৫০৭

৪২. আবদুল করিম বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) বাংরা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৭ইং পৃ,৭১

৪৩. প্রাগুক্ত,পৃ.৭১

৪৪. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৬. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,পৃ.৬১

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৪৮. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৪৯. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৫০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬০

৫১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬২

৫২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর ফরিদপুরের মানচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকে ফরিদপুরের সমসাময়িক অবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে ফরিদপুরের সম-সাময়িক অবস্থা

৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভের পর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করেন। আর ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বিজয়ী বেশে বাংলায় ইসলাম প্রবেশ করে। অবশ্য এরও শত শত বছর পূর্বে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকগণ ইসলামের বাণী নিয়ে বাংলায় আগমণ করেছিলেন। ফরিদপুর তথা বঙ্গে ইসলামের রাজনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লগ্নে ফরিদপুরের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পুরো সমাজ ব্যবস্থা সামন্ত রাজা ও স্থানীয় ভূ-স্বামীদের অন্যায় দাপটে দিশেহারা ছিল। এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন। তবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি উনিশ শতকের বৃহত্তর ফরিপুরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরলাম ঃ-

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে মোঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অস্থিরতা, অশান্তি লক্ষ্য করা যায়। তখন একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সুবা বাংলা যেখানে আইন-শৃংখলা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। বরং অনেকের মতে মুর্শিদকুলী খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে সে সময় বাংলাদেশ পরম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে। সুবা বাংলার দেওয়ারন হিসেবে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের নিয়োগ এবং পরে তাকে সুবাদার হিসেবে নিয়োগ (১৭১৭) বাংলার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। মোঘল সম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের যেখানে আইন-শৃংখলা ও সেখানে মুর্শিদকুলীর যোগ্য শাসনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে। মুর্শিদকুলী খানের ঐতিহ্য পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বঙ্গিয় সমাজ তখন মোঘল রাজনীতি ও আভিজাত্যের ধারা ও মূল্যবোধের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিল। এ ধারার পরিবর্তন শুরু হয় কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর থেকে।[১]

পলাশী যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারের সাথে সাথে ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ইংরেজদের আগমনের ফলে সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। সতের শতকে বাংলাকে 'জান্নাত-আবাদ' বা 'স্বর্গরাজ্য' বলেও অভিহিত করা হত।[২] দ্বিতীয় মোঘল সম্রাট এই আখ্যা দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব বাংলাকে জাতির স্বর্গ উল্লেখ করতেন। সত্যিই কোন মোঘল ফরমান, নিশান বা অন্যান্য সরকারি নথিপত্রে বাংলাকে 'ভারতের স্বর্গ' জাতীয় আখ্যা ছাড়া উল্লেখ করা হতো ৰা। আঠারো শতকের মাঝামাঝি কাশিম বাজারের ফরাসী কুঠির প্রদান জা ল'র মতে সুবা বাংলার এই বর্ণনা যথার্থ আঠারো শতকের প্রথম ভাগে নবাবী আমলেও যে বাংলা সতের শতকের মতো সমান সম্পদশালী ও ক্রমন্নতীশীল ছিল তার স্বাক্ষর মিলে। রিয়াজ-উস-সালাতিন ফারসী ইতিহাসে বাংলাকে 'জন্নাত-উল-বিলাদ' বলে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট প্রাক বিটি যুগের বাংলা সমন্ধে বলেন এ রাজ্য ছিল সচ্ছল, ব্যয় বেশি নয়, স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ও দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এদেশের মানুষ কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে সুখী।[৩] তারা প্রাচুর্য ও শান্তিতে জীবন যাপন করত। হেরি ভেরেলস্ট নামে ইংরেজ কোম্পানীর অন্য এক পদস্থ কর্মকর্তার মতে ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

নবাবী বাংলার সম্পদশ্রীর কারণ তার শিল্পজাত দ্রব্যের সুলভ মূল্য ও গুণগত উচ্চমান, যার জন্য সর্বত্র এর জিনিষের প্রচন্ড চাহিদা ছিল। বড় বড় ইউরোপীয় জাতির রপ্তানি ছাড়াও বাংলার কাঁচা রেশম, বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে স্থল পথে এদেশের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে গুজরাট, লাহোর, এমনকি ইস্পাহান পর্যন্ত রপ্তানি হত।[৪]

অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদ ও শ্রী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সব অবস্থা তখন বাংলায় পূর্ণ মাত্রায় ছিল। উর্বরা ভূমি সম্পদ কৃষি ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতির অনুকূল ছিল। ফলে বাংলার কৃষিজাত সম্পদ ছিল বিচিত্র ও অফুরন্ত তাই বাড়তি কৃষিজাত পণ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও প্রতিবেশী দেশগুলোতে সরবরাহ করা সম্ভব হত। সতের শতকের প্রায় সব বিদেশী পর্যটকই এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আঠারো শতকে ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির এ ধারা অব্যাহত ছিল। ওলন্দাজ কোম্পানির মহাফেজ খানায় বাংলার বন্দরগুলো থেকে এশিয় বনিকদের যেসব জাহাজ আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল তার তালিকা রয়েছে। এ তালিকায় জাহাজগুলোর গন্তব্যস্থল ও পণ্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, প্রাক পলাশী বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ চাল, গম, চিনি, ঘি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও পূর্ব-ভারতীয় দীপপুঞ্জে রপ্তানি হত। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এখানে ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর আনাগোনা হ্রাস পায়। বলা যায় প্রায় থেমে গেছে। আঠারাশো তের খ্রিস্টব্দের পর ভারত অবাধ বাণিজ্য জগতে প্রবেশ করেছে বটে কিন্তু প্রায় অর্ধ-শতকের বেনিয়া সরকারের দুঃশাসন এবং বৃটিশ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্ব বাজারে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থান পুরোপুরি পাল্টে যায়। বাংলার অর্থনীতিতে তখন যুগান্তর সাধিত হচ্ছে, দেশের অর্থনীতি তখন রপ্তানিকারক থেকে আমদানীকারকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রকিয়া চলছিল। কোম্পানী যুগ শেষ হবার আগেই এ দেশে বৃটিশ শিল্প কর্মের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং রপ্তানীর মধ্যে থাকে শুধু কিছু কাঁচামাল।[৫]

আঠারাশো তের খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বিলুপ্ত হয়। এরপর থেকেই ক্রমশই রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮২০-এর দশকের শেষ দিক এবং ১৮৩০-এর দশকের প্রথম দিকে ইউরোপে মন্দার কারণে ভারতীয় রপ্তানী হ্রাস পেয়েছিল। আঠারো শতকের বেশিরভাগ সময়ে বাংলাদেশে পণ্য আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর চেয়ে কম ছিল। ১৭৯৩ থেকে ১৮১২ এর মধ্যে এর পরিমান ছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ।[৬]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে স্বল্পকালের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অবক্ষয়। স্বাভাবিক কারণেই সমাজের উপর অভিজাত্যের প্রভাব ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় একই সময় একটি নব্য সংস্কারমনা শ্রেণী গড়ে উঠে। পাশ্চাত্য পুষ্ট এই নব্য শ্রেণীর একটি লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সময়োপোযোগী পরিবর্তন সাধন। মুসলিম সমাজেও একই সময়ে কতিপয় সংস্কারমনা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। এই পরিবর্তন ধারার প্রথম পর্ব সূচিত হয় উনিশ শতকের প্রথমভাগে হাজি শরীয়ত উল্লাহ্, তিতুমীর, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক। মুসলমান ও হিন্দু উভয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় প্রায় একই সময়ে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পুরুষ হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (১৯৮১-১৮৪০) ধর্ম চিন্তায় আলোকপ্রাপ্ত হন প্রধানত তিনজন ইসলামী চিন্তাবিদের প্রভাবে। তাঁরা হলেন আত্মবের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭), শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬৩) এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)। কিন্তু হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ একটি বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারে ব্রতী হন।[৮]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে একদিকে ইংরেজদের বিজয় অন্যদিকে দিল্লির সম্রাট শাহ্ আলম, অযোদ্ধার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বাংলার মীর কাশেমের সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়। ক্রমান্বয়ে তাদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে তাদের সামাজিক জীবন পতিত হয় ধ্বংসের মুখে।[৯]

ইংরেজ আমল অতিবাহিত হতে না হতেই বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মুসলমান জনসাধারণ রাখালহীন মেষপালের মতো হয়ে পড়েছিল। তখন প্রখ্যাত ধর্ম সংস্কারক হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ দীর্ঘকাল আরবদেশে অবস্থান করে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা দেখে হতবাক হন এবং বলেন যে, বাংলায় ইসলামের বৃক্ষকে তিনি ঈমানের পানির অভাবে মৃত্যুপ্রায় দেখতে পান। জৌনপুরের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আগমণ করেন। এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখে তিনি বলেন যে, ইংরেজ আমলে ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও কোথাও বাংলার মতো এত কুরুণ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করেনি। তাই হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ও মাওলানা জৌনপুরী বাংলায় ইসলাম প্রচার অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন। তখন তাঁরা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিও প্রসার এ দেশের জনমনে এবং সমাজ ব্যবস্থাতে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এদেশের সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব জনগণ মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। কারণ এদেশে ছিল ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে এদেশের হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই উহার প্রতিবাদ শুরু করলো। হিন্দু গণ হিন্দুত্ব রক্ষার্থে ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রার্থনা সমাজ গড়ে তোলে। অপরদিকে মুসলমানরা ইংরেজি পড়া বর্জন করলো। ফলে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে রইল এবং মুসলমানদের নিকট হতে রাজত্ব কেড়ে নেয়ার পর বৃটিশগণকে মুসলমানগণ কখনোও আপষের দৃষ্টিতে দেখেনি। অপরদিকে বৃটিশগণ মুসলমানদেরকে সর্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। সে সুযোগে হিন্দু গণকে বৃটিশরা চাকুরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সুযোগ দান করলো এবং মুসলমানদের জীবনে নেমে আসলো নির্যাতন ও অমানিশার অন্ধকার। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমদের প্রভাবে মুসলমানদের সে ভুল ভাঙলো এবং শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর ফরিদপুরে উনিশ শতকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকায় সমাজে অস্থিরতা বিরাজ করে। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ও তাঁর অনুসারীরা সার্বিক পরিবর্তনের জন্য ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা করেন। যার ক্রমধারায় পরবর্তী সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১ ইং), ২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩ ইং পৃ. ২৯
২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০
৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬২
৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৫
৫. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১ ইং), ৩য় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩ ইং পৃ. ২৩৬
৬. মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) ৩য় সংস্ককরন, কলকাতা ১৩৮৫ বাং, পৃ. ২১৮
৭. মোহাম্মদ আমীর হোসেন, সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮০ ইং, পৃ. ৫৫৮
৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৬০-৫৬১
৯. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩৬
১০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৮০০-১৮৫০ খ্রিঃ)

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র)

(১৭৮১-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ)

যুগ যুগ ধরে ইসলাম প্রচারে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন। মহানবী (স) এর ইন্তিকালের পরে নবী রাসূলের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নবী রাসূলের দায়িত্ব অর্পিত হয় উলামা, মাশাইখ ও বীর মুজাহিদদের উপর ১২০৪ খ্রিঃ বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে বিজয়বেশে ইসলামের আগমন ঘটে। চারদিকে ইসলামের বাণী ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশের মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে নির্মম নির্যাতন, জুলুম ও অত্যাচার। দিনে দিনে মুসলমানরা হারিয়ে ফেলে তাদের ইসলামী আকিদা ও ঐতিহ্য। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে পূণরুদ্ধার করার জন্য বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় যে সকল সংগ্রামী নেতা, ধর্মীয় সংস্কারক ও বিপ্লবী রাজনীতিবিদের আগমন ঘটে তাঁদের মধ্যে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃহত্তর ফরিদপুর সহ সারা বাংলাদেশে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক নবজাগরণের সূচনা করেন। তিনি সামাজিক কুসংস্কার শিরক, বিদায়াত, কুফরকে উৎক্ষাত করে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ফরাযেজী আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর কৃতিত্বময় অবদানের জন্য আজও বাংলার মানুষ তাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর নামে নামকরণ করা হয় শরীয়তপুর জেলার। অতএব তাঁর কালজয়ী অবদান ও কর্মময় জীবন আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয় ঃ-

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১১৮৬ সনে তৎকলীন বাকেরগঞ্জ জেলার মাদারীপুর মহাকুমার (বর্তমান মাদারীপুর জেলার) অন্তর্গত শিবচর থানার শামাইল নামক গ্রামে তালুকদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তার পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। তিনি শামাইল এলাকায় একজন প্রজাবাৎসল্য তালুকদার ছিলেন।[২] হাজী শরীয়ত উল্লাহ্র (র) দুইজন পিতৃব্য ছিলেন। একজনের নাম জনাব মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন তালুকদার। তিনি নিজ বাড়িতে সাংসারিক কার্য করতেন। অপরজন হলেন মাওলানা মোহাম্মদ আশেক তালুকদার। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাব বাহাদুরের দরবারে মুফতি ছিলেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ ১৭৮৯ খ্রিঃ মাত্র ৮ বছর বয়সে মাকে হারান।[৩] মায়ের ইন্তিকালের কিছু দিন পরে ১৭৯০ খ্রিঃ হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ ও তাঁর এক ভগ্নিকে রেখে পিতা আব্দুল জলিল তালুকদারও ইন্তিকাল করেন। ফলে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ও তাঁর ভগ্নি চাচা মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন তালুকদারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

পিতা মাতার কাছে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। কিন্তু শৈশবে পিতা মাতার ইন্তিকালের ফলে তাঁর লেখা পড়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় চাচা মোহাম্মদ আজিম উদ্দীন তালুকদারের উপর।[৫] চাচা-চাচী নিঃসন্তান থাকায় তারা হাজী শরীয়ত উল্লাহকে নিজ সন্তানের ন্যায় লালন পালন করতেন এবং তাঁর লেখা-পড়ার প্রতি খেয়াল রাখতেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এলাকায় কোন উপযুক্ত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তাছাড়া চাচা-চাচী বালক শরীয়ত উল্লাহ্কে দূরে কোথাও লেখা পড়ার জন্য পাঠাতে ইচ্ছুক

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন না। কিন্তু তাসত্ত্বেও ১৭৯৩ খ্রিঃ ১২ বছর বয়সে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) চাচা-চাচীর অনুমতি না নিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে যান।[৬] তিনি কলকাতার তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম মাওলানা বশারত আলী (র) এর তত্ত্বাবধানে ও আশ্রয়ে কোরআন শিক্ষা শুরু করেন।[৭] কোরআন শিক্ষা সমাপ্ত হলে মাওলানা বশারত আলী (র) তাঁকে ১৭৯৪ খ্রিঃ কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা শরীফ মাদ্‌রাসায় ভর্তি করে দেন।[৮] এ মাদ্‌রাসায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) আরবী ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ফুরফুরা শরীফে অধ্যয়ন কালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদে তাঁর চাচা মুফতী মোহাম্মদ আশিক তালুকদারের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।[৯] ফুরফুরা শরীফে দুই বছর অধ্যয়ন শেষে ১৭৯৬ খ্রিঃ হইতে ১৭৯৮ খ্রিঃ পযর্ন্ত হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) চাচা মোহাম্মদ আশিক তালুকদারের নিকট অবস্থান করে আরবী,উর্দু,ফার্সী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন।[১০]

এলাকায় প্রত্যাবর্তন ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এর চাচা মুফতী মোহাম্মদ আশিক তালুকদার দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। পেশাগত ব্যস্ততার কারনে তিনি নিজ এলাকায় আসার সুযোগ পাননি। তিনি ১৭৯৮ খ্রিঃ মৃত পিতা মাতা ও বড় ভাই আব্দুল জলিল তালুকদারের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম শামাইলে যাওয়ার কথা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র নিকট ব্যক্ত করেন।[১১] এ সংবাদে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) বাড়ী যাওয়ার জন্য উৎসাহী হন। কেননা তিনি মাঝে মাঝে চাচা চাচী ও ভগ্নির কথা স্মরণ করে নিজ বাড়িতে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎ আশা ভংগ হবে চিন্তা করে কখনো বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। তবে চাচা বাড়ি যাচ্ছেন জেনে তাঁর সাথে তিনি বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[১২] ১৭৯৮ খ্রিঃ বাড়ির উদ্দেশ্যে চাচা চাচীসহ নৌকা যোগে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) রওয়ানা হন।[১৩] তখন নৌকা ছাড়া অন্যকোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। গঙ্গা নদী হয়ে নৌকা ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। বহুদিন পরে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র মনে আনন্দ। কিন্তু মোহাম্মদ আশিক তালুকদারের মুখে কোন হাঁসি নেই। তাঁকে নিরব দেখে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেনঃ চাচা আপনি চিন্তিত কেন ? উত্তরে চাচা বলেন, প্রিয়বৎস! পৃথিবীতে বসবাস করা মানুষ প্রকৃত পক্ষে একজন মুসাফির। মুসাফির যেরূপ পথব্রজে হাঁটিয়া ক্লান্তাবস্থায় কোন বৃক্ষের ছায়ায় কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে থাকে আমাদের জীবনও অনুরূপ। আমরা এতদিন কোথায় ছিলাম। এখন কোথায় যাইতেছি আবার কোথায় যাইব সেই ভাবনা করিতেছি"।[১৪]

চাচার এ আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ কথা শুনে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র অশ্রু ঝড়তে লাগল। তখনঃ চাচা তাকে বুকের সাথে আলিঙ্গন করে বললেন প্রিয় বৎস, শৈশবে তুমি পিতা হারায়ে ইয়াতিম হয়েছ, তদ্রুপ আমিও তোমাকে রেখে সংসারের মায়া ত্যাগ করিব। বিপদে ধৈর্য ধারন করিও, লেখাপড়া শিক্ষা করিতে ভুল করিও না। সাধ্য অনুযায়ী ইসলাম ও জাতীর সেবা করিও। চাচার এ উপদেশ-মূলক কথায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ মনে করলেন চাচা হয়তোবা বেশি দিন বেঁচে থাকবেন না । নৌকা চলতে লাগল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র চাচা তাঁর নিজ হাতে লেখা কোরআন পড়তে লাগলেন। ঝড়ের তীব্র গতি বাড়ার কারনে হঠাৎ নৌকা ডুবে গেল। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ একটি মাটির কলসি নিয়ে সাঁতরিয়ে তীরে উঠেন। কিন্তু চাচা-চাচীর কোন সন্ধান পেলেন না অনেক খোঁজা খুঁজির পরেও যখন চাচা-চাচীর কোন সন্ধান পেলেন না। তখন হাজী শরীয়ত উল্লাহ নিজ এলাকায় না এসে পূনরায় ভগ্ন হৃদয়ে কলকাতায় তাঁর শিক্ষক মাওলানা বশারত আলীর (র) নিকট ফিরে যান। মাওলানা বশারত আলী (র) হাজী শরীয়ত উল্লাহ্‌র এ হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে হাজী শরীয়ত উল্লাহকে পূনরায় তাঁর নিকট আশ্রয় দেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) পূনরায় লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করেন।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) পূনরায় মাওলানা বশারত আলী (র) এর তত্বাবধানে এক বছর অবস্থান করে জ্ঞান অর্জন করার পর ১৭৯৯ খ্রিঃ মাওলানা বশারত আলী (র) হাজী শরীয়ত উল্লাহ্কে ডেকে বললেন "হে! স্নেহের শরীয়ত উল্লাহ্ আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে হিজরত করিতে ইচ্ছা করেছি কারণ ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে থেকে মুসলমানের আকিদা, ইসলামের হুকুম আহকাম যথাযথ ভাবে পালন করা সম্ভব নয়। তাই তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে মক্কা শরীফ যেতে পার"।[১৮] এ কথা শুনে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ মাওলানা বশারত আলী (র) এর সাথে মক্কা শরীফ যাওয়ার সিদ্বান্ত নেন। অত!পর হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ মাওলানা বসারত আলী (র) এর সাথে মক্কাশরীফ গিয়ে মাওলানা বশারত আলী (র) এর বাল্য বন্ধু ফরিদপুর জেলা নিবাসী মাওলানা মোরাদ (র) এর বাসায় অবস্থান করেন।[১৯] তাঁর তত্বাবধানে দুই বছর থেকে আরবী সাহিত্য ও ইসলামী হুকুম আহকাম সম্বলিত বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৭৯৯ খ্রিঃ হইতে ১৮১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মক্কার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন।[২০] তিনি দীর্ঘ বিশ বছর অধ্যয়ন কালে যে সকল শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ শিক্ষক হলেন মাওলানা তাহের ছোম্বল। তিনি তাঁর তত্বাবধানে থেকে ১৮০৪ খ্রিঃ হইতে ১৮১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত একাধারে ১৪ বছর অধ্যয়ন করেন।[২১] এ সময় উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আরব সরকার হাজী শরীয়ত উল্লাহ্কে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কোরআন, হাদীস,আরবী ও ফিকাহ্ সাহিত্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করে মালানা উপাধী অর্জন করেন এবং ১৮১৮ খ্রিঃ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[২২]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ইলমে শরীয়ত অর্জনের সাথে সাথে ইলমে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮০৪ খ্রিঃ মাওলানা তাহের ছোম্বলের নিকট যখন ইলমে শরীয়তের শিক্ষা শুরু করেন তার কিছু দিন পর আধ্যাত্মিক শিক্ষা সবক নিয়ে নিয়মিত অজিফা ও জিকির-আজকার করতে থাকেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ মাওলনা তাহের ছোম্বল ছাড়া অন্যান্য আলিমদের নিকট হতে ও ইলমে তাসাওউফের সবক নেন। তবে মাওলানা তাহের ছোম্বলই ছিলেন তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষক।[২৩] তিনি তাঁর নিকট হতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন। নিম্মে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) হতে রাসূল (স) পযর্ন্ত তাসাওউফ শিক্ষার (পীরি জরা) শিক্ষকদের ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা হল।[২৪]

১. হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র)
২. হযরত তাহের ছোম্বল (র)
৩. হযরত মোহাম্মদ ওরফে আহ্ম্মদ (র)
৪. হযরত সৈয়দ গাদার রহমান (র)
৫. হযরত সৈয়দ শামছুদ্দীন (র)
৬. হযরত সৈয়দ গাদার রহমান ইবনে আবুল হাসান (র)
৭. হযরত শেখ শামছুদ্দীন (র)
৮. হযরত সৈয়দ আকিল (র)
৯. হযরত সৈয়দ বাহাউদ্দীন আহ্ম্মদ (র)

Dhaka University Institutional Repository

১০. হযরত শাহ্ আব্দুল ওহাব (র)
১১. হযরত শরফুদ্দীন কাওয়াল (র)
১২. হযরত সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক (র)
১৩. হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জেলানী (র)
১৪. হযরত আবু ছাইদ মাখদুমী (র)
১৫. হযরত আবুল হোসাইন (র)
১৬. হযরত শেখ আবুল ফারাহ্ তারতুছী (র)
১৭. হযরত শেখ আবদুল আজিক তামিমী (র)
১৮. হযরত আবু বকর শিবলী (র)
১৯. হযরত জেনায়েদ বোগদাদী (র)
২০. হযরত শেখ আবুল হোসাইন ছারি ছাখতী (র)
২১. হযরত শেখ মারুফ কারখী (র)
২২. হযরত ইমাম আলী রেজা (র)
২৩. হযরত মুসা কাজেম (র)
২৪. হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (র)
২৫. হযরত ইমাম বাকের ছাদেক (র)
২৬. হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (র)
২৭. হযরত ইমাম হোসাইন (সাহাবী)
২৮. হযরত আলী (রা)
২৯. হযরত মুহাম্মদ মস্তফা (সঃ)[২৫]

খিলাফত লাভ ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) যখন ১৮১৮ খ্রিঃ ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তাসাওউফে পূর্ণাঙ্গ ইলম অজর্ণ করেন তখন মাওলানা তাহের ছোম্বল তাঁকে খিলাফত দান করেন।[২৬] হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) খিলাফত লাভে তার কিছু দিন মক্কায় অবস্থান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলে মাওলানা তাহের ছোম্বলের নিকট তা ব্যক্ত করেন। মাওলনা তাহের ছোম্বল তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।[২৭]

হাজী উপাধি লাভ ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) শৈশবে একদা গ্রাম্য বালকদের সাথে আম কুড়াতে গিয়ে মাথায় ছুড়ির আঘাত পান এতে তাঁর মাতা কেটে যায়। চাচা চাচীর ভয়ে তিনি মাথায় গামছা দ্বারা পাগড়ীর ন্যায় বেধে রাখেন যাতে চাচা চাচী বুঝতে না পারে তাঁর মাথা কেঁটে গেছে। এভাবে তিনি দীর্ঘ কয়েক দিন পাগড়ী বেঁধে রাখার কারনে গ্রামের লোকজন তাঁকে হাজী বলে ডাকতে শুরু করে।[২৮] এছাড়া হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৭৯৯ খ্রিঃ হতে ১৮১৮ খ্রিঃ পযর্ন্ত ও পরর্বীতে আর দুই বছর মক্কা শরীফ অবস্থান কালে বহুবার হজ্জ্ব পালন করেন। যার কারণে সকলে তাঁকে হাজী উপাধিতে ভূষিত করে।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে কোরআন, হাদীস, ফিকহ্সহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেও মাওলনা তাহের ছোম্বলের নিকট হতে খিলাফত লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) বহু মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থ সাথে নেন। তিনি মক্কা শরীফ হতে জাহাজ যোগে ভারতের সুরাট বন্দরে পর্দাপন করে বিহার হয়ে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হন। পথে বিহার এলাকায় তাঁর সাথের মূল্যবান গ্রন্থসহ সর্বস্ব ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ইসলমের দাওয়াত দেন। তাঁর দাওয়াতে কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি পরিহার করে ইসলাম ধংসের রীতি নীতি গ্রহণ করে। এমনকি ডাকাতদের মধ্যে হতেও কয়েকজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ ও পান্ডুলিপি ফিরে পাননি। অতঃপর ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে পায়ে হেঁটে একদিন হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ নিজ বাড়ির মস্জিদে এসে মাগরিবের নামাযের আযান দেন। তাঁর আযানের ধ্বনি শুনে চারদিকের অনেক লোক জমা হয়ে যায়। কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সকলে তাঁকে বিদেশী লোক বলে মনে করে। নামায শেষে পারস্পরিক আলোচনা কালে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এর ভগ্নি ও চাচা তাঁকে চিনতে পারেন। দীর্ঘ দিন পরে চাচা ভ্রাতুস্পত্রের সাক্ষাতের ফলে রাত্রে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু চাচা মোহাম্মদ আজিমুদ্দীন তালুকদার শেষ রাত্রে ইন্তিকাল করেন।[৩০] পরের দিন সকালে আজিমউদ্দীন তালুকদারকে দাফন কাফন করার জন্য এলাকার বহু লোক সমবেত হয়ে দেশে প্রচলিত কুপ্রথা অনুযায়ী দাফন করেত চাইলে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ইসলামী নিয়ম নীতি অনুযায়ী চাচা আজিমউদ্দীন তালুবদারকে দাফন করেন।[৩১]

পূনরায় মক্কা শরীফ গমন ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮১৮ খ্রিঃ দেশে ফিরে এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তখন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগন ইসলামী আকিদা ভুলে গিয়ে হিন্দুদের ন্যায় বিভিন্ন পূজা পার্বনে অভ্যস্থ হয়ে পরে এবং একে পূন্যের কাজ বলে মনে করে। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদেরকে অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত করে। সমাজের সর্বত্র ছড়ায়ে পরে মদ-জুয়া,গান বাজনা,ঘোড়াদৌড়, নৌকা বাইচ সহ বিভিন্ন শেরেক বেদায়াতীর কাজ।হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) মুসলমানদের এ দূরবস্থা দেখে মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলাম প্রচারে নিয়োগ করেন। মুসলমানদের মাঝে ইসলামের মূল হুকুম আহকাম প্রচার শুর করেন। তিনি সর্ব প্রথম তার চাচী ভগ্নি, ভগিনাকে ইসলাম বিরোধী কার্যসমূহ হতে বিরত রেখে শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দেন। তার ডাকে অনেকে সারা দিয়ে হিন্দুদের কার্যকলাপ ত্যাগ করে তওবা করেন। হিন্দুরা এ অবস্থা অবলোকন করে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। ফলে অনেকে হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) কর্তৃক পাঠ করানো তওবাকে ফেরত নিতে বলেন। তখন হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) চিন্তা করলেন হয়তোবা আমার দ্বিনি প্রচার কার্যের কোথাও ভূল রহিয়াছে। যার কারণে সাধারন মুসলমানগন আমার দাওয়াতকে গ্রহণ করছে না। তখন তিনি পূণরায় মক্কা শরীফ চলে যাওয়ার সিদ্বান্ত নেন।[৩২]হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এক বছর নিজ বাড়িতে অবস্থান করে ১৮১৯ খ্রিঃ পূনরায় মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। তিনি বাড়ি হতে প্রথমে ফরিদপুর শেখ ফরিদ (র) এর মাজার যিয়ারত করেন। সেখান হতে ভারতের খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতি (র) এর মাজার জিয়ারত করেন। সেখান হতে ইরাকে হযরত ইমাম হোসাইন (র) ও আব্দুল কাদের জিলানি (র) এর কবর জিয়ারত করে মিশর ও বায়তুল মুকাদ্দাস সফর শেষে মক্কায় পৌছেন।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্ব প্রথম তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা তাহের ছোম্বলের সাথে সাক্ষাত করে বায়তুল্লায় হজ্জ আদায় করেন। তিনি এ সময় দুই বছর মক্কায় অবস্থান করে ইসলামের খুটি নাটি বিষয়-সমূহ ইলমে তাসাওউফ সাধনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। অতঃপর কিছু দিন মদিনায় অবস্থান করে মহানবী (স) এর কবর যিয়ারত করে স্বদেশী মুসলমানদের বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করে তাদের মুক্তি ও হেদায়েতের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করেন। অতঃপর স্বচ্ছায় স্বদেশে ইসলাম প্রচারের ইচ্ছা করেন। মদিনা হতে রওয়ানা হয়ে পূণরায় তিনি মাওলানা তাহের ছোম্বলের সাথে সাক্ষাত করেন।[৩৪]

"কুতুবুল বাঙাল" উপাধি লাভ ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) পূণরায় দু' বছর মক্কায় অবস্থান শেষে স্বদেশে প্রতগবর্তনের পূর্বে মাওলানা তাহের ছোম্বলের সাথে সাক্ষাত করে স্বদেশে আগমনের কথা ব্যক্ত করেন। তখন মাওলানা তাহের ছোম্বল (র) হাজী শরীয়তউল্লাহ-কে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ললাটে চুম্বন দিয়ে "কুতুবুল বাঙাল" অর্থাৎ বাংলার কুতুব নামে উপাধি দিয়ে স্বদেশে ইসলাম প্রচারের খিলাফত দিয়ে প্রেরণ করেন।[৩৫]

বিবাহ ও পরিবার ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮১৮ খ্রিঃ নিজ গ্রাম শামাইলের নেযামত বিবি নাম্নী এক রমনীকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে ১৮১৯ খ্রিঃ মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া নামে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) নেয়ামত বিবি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি।[৩৬]

হজ্জ পালন ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) জীবদ্দশায় ১৮ বার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। তিনি সর্ব প্রথম হজ্জ পালন করেন ১৭৯৯ খ্রিঃ ছাত্র অবস্থায়। অতঃপর মক্কা ভূমিতে অবস্থান কালে প্রতি বছর হজ্জ পালন করেন।[৩৭]

ইন্তিকাল ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ১৮৪০ খ্রিঃ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৪০ খ্রিঃ বাংলা ১২৪৫ সনের ১৪ মাঘ রোজ শুক্রবার ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তাঁকে নিজ গ্রাম শামাইলে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে আড়িয়াল খাঁ নদীর গর্ভে তাঁর কবর বিলিন হয়ে যায়।[৩৮]

সমাজিক কর্ম ঃ

দীর্ঘদিন হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাসের কারলে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সমাজের অনেক রীতিনীতি ও ধ্যান ধারণা প্রবেশ করে। যা ছিল ইসলামের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত। হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (র) শিরক, বিদায়াত পীর ফকিরের মাযারে সিজদা, মানত ও হিন্দুদের পূজার ন্যায় নানা রকম পূজাকে ইসলামের মূলনীতি ও কোরআন, হাদীসের বিপরীত বলে ঘোষণা করেন। তিনি সকল মুসলমানকে এ সকল সামাজিক কুসংস্কার থেকে বিরত থাকার আহবান জানান।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবগুলোতে অযথা অর্থ খরচ করাকে অপচয় বলে ঘোষনা দেন এবং এর বিরোধিতা করেন। তিনি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করার জন্য সকলকে দির্দেশ দেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) সকল প্রকার সামাজিক অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানকে এক হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষক, সাধারন মুসলমানগন একত্রিত হয়ে সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এ ব্যাপারে জেম্স ওয়েজ তাঁর "মেহামাডানস্ অব ইস্টার্ন বেঙ্গল" গন্থে বলেন,

"হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ নীতির সাথে দীর্ঘাদিনের সম্পর্কের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার ও দূর্নীতি দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলার প্রথম সোচ্চার প্রচারক হিসেবে তাঁর (হাজী শরীয়ত উল্লাহ) আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু বাংলার চেতনাহীন ও উদাসীন চাষী সমাজের মধ্যে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত করার ব্যাপারে যে সাফল্য অর্জন করেন তা আরও বেশী চমকপ্রদ"।[৪০]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) কুসংস্কারচ্ছন্ন মুসলমানদের সামাজিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালান। তিনি শিষ্যদের ফরায়েজী নিয়ম-কানুন পালন করার সাথে সাথে সামাজিক অবস্থা পরিবতর্নের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করতেন। এ ব্যাপারে জেম্স টেইলর বলেন,

"The (the Faraejese) Profess to adhere to the strict letter of Koran and reject all ceremonies that are not sanctioned by it. 'The commemoration of the martyrdom of' Hassan and Husein-is not only forbidden but even untnesting the ceremonies connected with it is avoided by them, They reject the rites puttee. Chuttee and chilla which were performed between the first and fortienth day after the birth of a child and observe the rite of Aqiqa. In the same way they have divested the marriage ceramony of its formalities" The funeral obserquies are concluded with a Corresponding degree of simplieity, Offerings of fruits, Flowers of the grave and the various fatiha ceremonies being prohilbited, their graves are not raised above the surface of the ground, not marked by the building or brick or stone"[41]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) কোরআন ও হাদীসের আলোকে পরিবর্তন ঘটাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে হিন্দু জমিদার, ইংরেজ ও কতিপয় উলামাদের সাথে। তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। তবে তিনি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে অনেকাংশে সফল হন। তাঁর আহ্ব্বানে অনেকে হিন্দুদের রীতিনীতি পরিত্যাগ করে কোরআন ও হাদীসের রীতিনীতিকে গ্রহণ করে।

ধর্মীয় কর্ম ঃ

হাজী শরীযত উল্লাহ (র) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের ধর্মীয় নিয়মানীতি দেখে বিচলিত হন। তখন মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মনে করে পালন কর। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) মুসলমানদের এ সকল কুফর, শিরক, বিদায়াত কর্ম হতে বিরত থাকার আহবান জানান। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ছিলেন হানাফী মতবাদের অনুসারী। ফরায়েজী অনুসারীদের এমন কিছু স্বতন্ত্র মতবাদ ছিল যার ভিত্তিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দিতেন। আর এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করা। ফরায়েজী অনুসারীরা পাঁচটি লক্ষ্যনিয়ে ধর্মীয় প্রচার কার্য পরিচালনা করেন।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

আর তা হলো ঃ-

১.তওবা ঃ-

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রথম ধর্মীয় লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের আত্ম শুদ্ধি ও পাপকাজ হতে বিরত থাকার শপথ করা। আর তাদের এ শপথকে 'তওবা' বা অনুশোচনা বলে অভিহিত করা হয়। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর মতে তওবার অর্থ অনুশোচনা আর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন পাপকাজের পূনরাবৃত্তি না করা। এই তওবা হচ্ছে ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখোমুখি বসে কোন প্রকার হাতে হাত না রেখে নিমোক্ত বাক্য পাঠ করা।

"আমি জানিয়া, ইচ্ছায় যে সমস্ত শেরেক বেদাত, নাফরমানী অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি সমস্ত হইতে তওবা করিলাম এবং ওয়াদা করিতেছি যে, আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও নির্দেশ যথাশক্তি পালন করিব এবং হযরত রাসূল (স) এর সুন্নত তরিকা মোতবেক চলিব"।[৪৩]

যারা এভাবে তওবা করে ফরায়েজী আন্দোলনে যোগদান করত তাদের এ তওবাকে তওবায় 'মুসলিম' বলা হত। আর যারা এ তওবা করে ফরায়েজী জামায়াতে প্রবশে করত তারা অন্যান্য ফরায়েজীদের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করত । এ তওবাকে 'ইকরারী বায়াত' ও বলা হত। এ বায়ত বর্তমান যুগের পীর মুরীদের ন্যায় হাতে হাত রেখে শরীর স্পর্শ করে করা হত না। তারা হাতে হাত রেখে বায়তাকে বেদায়াত মনে করত। কেননা হাতে হাত রেখে বয়াত করার বিধান কোরআন হাদীসে উল্লেখ নেই। আর এ নিয়েমের বায়াতকে মোহাম্মদী বায়াত বলে তারা দাবী করত।[৪৪]

২.ফরয ঃ-

ইসলামে যে সকল কাজ অবশ্য করনীয় ও বাধ্যতামূলক তাকে ফরয বলা হয়। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) আল্লাহ রাসূল (স) কর্তৃক নিধারিত বিষয়কে অবশ্য করণীয় ও ফরয হিসেবে গ্রহণ করেন। আর এ 'ফরয' হতেই ফরায়েজী জামায়তের সূচনা করেন। তিনি পাঁচটি বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর তা হলো ঃ-

ক. কালেমা খ. নামায গ. রোজা ঘ. যাকাত ঙ. হজ্জ[৪৫]

প্রথম তিনটি ধনী গরীব সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। পরবর্তী দুটি ধনী মালদার ব্যক্তিদের জন্য বাধ্যতামূলক। হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) এ পাঁচটি বিষয়ে যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে দুররী মুহাম্মাদী পুস্তকে পূঁথি আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

"সে পানি পাইল যবে দরাক্ত ইমান তবে,
তাজা হৈল হুকুমে আল্লাহর।
তৈয়ব কলেমা যেই ইমানের মুল সেই,
দিনে দিনে হৈল ওস্তত্তার।
রোজা যে বাগানের কলি নামায তাহাতে অলি,
যাকাত বুলবুল খোশ লাহান !!
হজ সে গাছের ডাল শুন যত নেক হাল,
মালদার যেই মুছলমান।
এই পাঁচ হৈতে যত দোশখা তেশাখা কত,
দীন এছলামির খুবি হৈল"।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

৩. তাওহীদ আর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ঃ-

হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ইসলামের অনুসারী হিসেবে সবাইকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ফিরে আমার আহবান জানান। ফরায়েজী অনুসারীরা তাওহীদের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। তাঁরা তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়কে কঠোর হস্তে দমন করতেন। সমাজে কোন প্রকার কুসংস্কার দেখলে সরাসরি প্রতিবাদ করতেন। যেমন শিরক, কুফর বিদায়াত ও বহুঈশ্বরবাদ ইত্যাদি। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) যখন তাওহীদের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরীর সাথে . ৩৫-৩০ মতভেদ দেখা দেয়।[৪৭] কারামত আলী জৈনপুরী হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ও তাঁর অনুসারীদের বাংলার খারেজী বলে আখ্যায়িত করেন। আর এর কারণ হিসেবে মাওলানা কারামত আলী বলেন, ফরায়েজী অনুসারীরা আমলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী (র) মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদুমিয়া (র) এর সময় ১৮৪৭ খ্রিঃ একটি হ্যানবিল বিলি করে তাঁতে উলেখ করেন।

"Because of the ignorance of the masses of Bangal notably of the masses of the towns of Dhaka, Faridpur and Barisal and their neigbourhood, and the Unacquaintance of the multitude with their religion (Din). School of Law (Madhhab) and creed (Aqaid) and because of their inability to discern between faith (lman) and work (Amal) they have fallen into the trap of the Fharijis"[48]

তাওহীদ সম্পর্কীত ফরায়েজীদের মতবাদকে অতি কঠোর মতবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এ মতবাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজ থেকে অন্যায় আনাচার দূরকরে মুসলিম সমাজকে বিশুদ্ধ করা। আর এ সম্পর্কে সমসাময়িক লেখকগণ মন্তব্য করেন-

James Taylor বলেন,

They (the Faraidis) profess to adhere to the strict letters of the koran, and reject all ceremonies that are not sanctioned by it,[49]

W.W. Hunter. বলেন,

The articles of faith on which he (Haji Shariat Allah) Chiefly insisted were the duty of the holy war (Jihad) the sinfulness of infidelity (Kufr) or introducing rites and ceremonies into worship (Bidat) and of giving partnership to the One God (shirk)"[50]

H. Beveridge বলেন,

A sort of primitive church movement or return to the doctrine of Mahamed and attempts to abandon 'the Superstitious practiees which have gathered round the earlier creed by lapse of time and by contact with Hindus and other infidels'[51]

তওহীদ মতবাদের ক্ষেত্রে ফরায়েজী ও আরব ওহাবীদের মধ্যে মিল ছিল। কিন্তু তাওহীদের ক্ষেত্রে ফরায়েজী ও অন্যান্য উলামাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. জুমআ ও ঈদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিমত ঃ-

হাজী শরীয়উল্লাহ (র) বৃটিশ শাসন কালে ভারত উপমহাদেশে ঈদও জুমআর নামায আদায় জায়েজ নয় বলে ফতোয়া জারী করেন। কারন হানাফী মাযহাবের মতে জুমআ ও ঈদের নামায আদায়ের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[৫২] যথা ঃ-

ক. জুমআর নামায আদায়ের জন্য জন বহুল শহর হওয়া।
খ. আমীর বা কাজী উপস্থিত হওয়া।
গ. কাজী ও আমীর মুসলিম বাদশা কর্তক নির্বাচিত হওয়া।

এ সকল শর্ত তৎকালীন সমাজে বিদ্ধমান না থাকার কারনে তিনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ভারত উপমহাদেশে জুমআ ও ঈদের নামায আদায় করা জায়েজ নয় বলে ঘোষণা করেন। হানাফী ইমামদের মতে জুমআ ও ঈদের নামায আদায়ের জন্য ছয়টি শর্ত পরিপূর্ণরূপে থাকতে হবে। তাছাড়া জুমআর নামায আদায় বৈধ হবে না। শর্তগুলো হলো ঃ-

1.To be in misr al jami 2. Presence of the Muslim ruler or his agent 3.prescribed time for prayer 4. Delivery of Khutbah or sermon 5. Jamaat or Congregation and 6. Access for all to the place of prayer.[53]

তৎকালীন সমাজে প্রথম দুটি শর্ত পরিপূর্ণরূপে না থাকার কারনে হাজী শরীয়তউল্লাহ এদেশকে দারুল ইসলামের পরিবর্তে 'দারুল হারব' বলে জুমআ ও ঈদের নামায আদায় করা জায়েজ নয় বলে ঘোষনা দেন। তাছাড়া বৃটিশ শাসন কালে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিধিবিধান যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেনি। তাদের বাক স্বাধীনতা ছিল না। তারা মুসলমানদের শত্রু ছিল। যার কারণে এদেশ দারুল আমান হিসেবে গণ্য করা হত না।

তৎকালীন দিল্লীর ধর্মীয় নেতা শাহ আব্দুল আল আজিজ বলেন, যখন মুসরিম রাষ্ট্রে কোন অমুসলিম শাসক ক্ষমতায় থাকে এবং ক্ষমতা থেকে তাকে তাড়ানো ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না তখন ঐ রাষ্ট্রের অধিবাসী ইচ্ছা করলে তাদের ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করতে পারে ইচ্ছ করলে নাও পালন করতে পারে। আর তখন ঐ রাষ্ট্রকে 'দারুর হারব' বলা হয়।[৫৪]

আঠার শতাব্দীর শেষের দুই দশক বাংলাদেশে জুমআর ব্যাপারে খুব প্রভাব ফেলে। তবে ফারায়েজীরা দেশের রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে ও দারুল হারবের উপর ভিত্তি করে জুমআ ও ঈদের নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকেন নি। বরং তারা শহর আল-জামি ও কাজী বা আমীর উপস্থিতির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং এদেশকে দরুল হারব ঘোষনা করেন। তিনি আরে ঘোষনা দেন এদেশে যতদিন দারুল ইসলাম না হবে ততোদিন এখানে জুমআ ও ঈদের নামায আদায় জায়েজ হবে না। ফলে মাওলানা কারামত আলী ও হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) এর মাঝে এ ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয়। মাওলানা কারামত আলীর (র) মতে এদেশে বৃটিশ সরকার মুসলমাদের ধর্মীয় ইবাদতে হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং এদেশ দারুর আমান। আর দারুল আমানে জুমআ ও ঈদের নামায আদায় করা জায়েজ। তখন এদেশের উলামাগণ জুমআর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল মাওলানা কারামত আলী (র) পক্ষ অবলম্বন করে জুমআর নামায আদায় করেন। অপরদিকে হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ও তাঁর অনুসারীগণকে জুমআর নামায আদায় না করার কারণে বেজুমআওলা বলা হত। পরবর্তীতে মাওলানা কারামত আলীর (র) ও ফরায়েজী উলামাদের মাঝে এ বিষয়ে বহু বহছ (দলীল প্রমানের ভিত্তিতে সমাধান) হয়। কিন্তু উভয় দল কোন ঐক্যে পৌছাতে পারিনি।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

৫. ধর্মীয় কুসংস্কারের অবসান ঃ-

হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ও ফরায়েজী অনুসারীরা তাওহীদ বিশ্বাসের পরীপন্থি যাবতীয় কুফর, শিরক বিদায়াত এবং সামাজিক কুসংস্কার হতে নিজেদের দূরে রাখতেন এবং সমাজ হতে এগুলো উচ্ছেদ করতেন। এ ব্যাপারে জেমস্ টেইলর বলেন,

ফরায়েজীরা পুট্টী, চুট্টি, চিল্লাহ এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৫৬] তৎকালীন সমাজে কোন শিশু ভূমিষ্ট হলে ভূমিষ্ট শিশুর ১৪ দিনের মাথায় অনুষ্ঠান পালন করত যা ইসলামে নিষেধ ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানে গানবাদ্য করা মৃত্যু দিবসে অনুষ্ঠান, ফাতেমার শিন্নি, খজখিজিরের নামে ভেলা ভাসানো এ ধরনের কাজকে ফরায়েজীরা কঠোর ভাবে দমন করেন।[৫৭] তৎকালীন অবস্থা উল্লেখ করে দূররী মুহাম্মদী গ্রন্থে পুঁথির ভাষায় উল্লেখ করা হয় ঃ

"মোশ্রেকগণের কাম ছিল কালে কালে।। খোযাজের ভেলা ভাসাইত জলে।
গাজী ও কালুর দূর্গা করিত তৈয়ার। পুজিত তাহাকে যত মোশরেক গাঙার।
বিধি ফাতেমার দূর্গ পুজিত যতনে ।। বারমাসে বার পূজা দিত জনে জনে।
নাচ বাদ্য রহুম ফাতেহা মশরেকের। আর যত বেদাত আছিল তাহাদের।
দশহরা রথ যাত্রা চরক দেখিত ।। পীরের নামেতে পূজা জনে জনে দিত"।[৫৭]

অনত্র বলা হয়েছে-

"মহরমে এমাম হাছেন হোছেনের ।।
হায় হায় জারি ছিল মশরেকগণের
পাঁচ পীরের নামেতে মোকান উঠাইয়া।
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া।
প্রথম হায়েজ যদি হইতে কাহার ।।
কলাগাছ গাড়িত বাড়ীর চারি ধার ।
সে সব বেদাত এবে হইল মেছমার।।
উঠিল এছলামি সূর্য্য গগণ মাঝার।
হাজী শরিতুল্লা হেথা তশরিফ আনিয়া।।
দীন জারি করিলেন বাঙালা জুড়িয়া"।[৫৯]

হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) উপরোক্ত কুসংস্কার ছাড়া আরো কতিপয় সমাজিক কুসংস্কার উচ্ছেদ করেন। আর তা হলো ।

পীরবাদ ঃ-

হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান কালে মাওলানা তাহের ছোম্বলের সাহচার্যে থেকে অধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। যার কারণে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পীর মুরীদ পন্থার বিরোধীতা করেন এবং ওরশ করা, হাতে হাত রেখে বায়াত করা শরীর স্পর্শ করাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। অনেকের ধারনা ছিল পীর আল্লাহ ও মুরীদের মাঝে যোগসূত্রকারী। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এটাকে অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন পীর মুরীদ সম্পর্ক হলো ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ন্যায়।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

বংশীয় কৌলিন্য ঃ

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয়, শূদ্র বৈশ্য এ চারটি বংশ কৌলিন্য বিরাজ করত। দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার কারনে মুসলমানদের মাঝেও বংশ কৌলিন্য দেখা দেয়। শেখ, সৈয়দ, মোল্লা, পাঠান, খন্দকার, চৌধুরী এদরেকে উচ্চ বংশের অধিকারী মনে করা হত। আর জোলা (তাঁতী) নিকারী (মাছবিক্রয় কারী) চাকার (বিবাহের পালকী বহন কারী) দায়ীদের নিম্ন শ্রেণীর মনে করত।[৬১] এ ব্যাপারে জেমস্ টেইলর বলেন ঃ-

"Several of the Communities into which the lower clesses of the Mahomedans are divided according to their Occupations and employ ments, have assvmed the quite exclusive as the Hindoos.[62]

ফরায়েজী জামায়াতের পদক্ষেপে সকল বংশ কৌলিন্য সমাজ থেকে উচ্ছেদ হয়। এ ব্যাপারে James wise বলেন, According tof the current tradition among the Faraidis the Haji at first changed the family tites of the julahas and the kulus to karigar he called those who could read the Quran and had some Knowledge of the fundamentals of religion as Mullah But later on the Faraidis were encouraged to drop their family tilles altogether,The fact that in the census of A.D. 1872 out of the total 588, 522 Muslims of Faridpur 574, 740 registered themselves as "Unspecified' Muslims and that 142 Muslim weavers registered as Karigar' against 6,036 of the same saste who regestered as julaha lend support to the above tradition.[63]

ধাত্রী সম্প্রদায়ের নিয়োগ ঃ-

১৮৭২ খ্রিঃ আদম শুমারী অনুযায়ী ফরিদপুর জেলার মুসলমান ধাত্রীদের তালিকা তৈরী করা হয়। ধাত্রী নিয়োগ সর্ম্পকে জম্স অয়েজ বলেন,

ধাত্রী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মহিলা ছিল পেশাদার। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল নগন্য। সমাজে এ পেশাকে সবসময় ছোট চোখে দেখা হত। কারণ তারা নবজাতক শিশুর নাভী কাটার ন্যায় কলঙ্ক জনক কাজ করত।[৬৪]

জেমস্ আয়েজ আরো বলেন,

ধাত্রীদেরকে নাভিকাটা (নারকাটা) বলে গালি দেওয়া হত। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাহিলারা এ কাজ করত না। ফারায়েজীরা দেখল যে এ কুসংস্কার হিন্দুদের মাধ্যমে মুসলমানদের ভিতর শিকড় গেড়েছে। শিশুর মাতাকে ধাত্রী না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত এবং ধাত্রী আসার পর নাভী বা নাড় কাটা হত। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এ ধরনের ধাত্রী নিয়োগের বিরোধীতা করেন এবং ঘোষনা দেন যে কোন বয়স্ক মহিলা এ কাজটি করতে পারে। এমনকি নবজাতকের পিতা ও একাজটি করতে পারে। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এ ঘোষনা দেওয়ার পরে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। এমনকি মাওলানা কারামতআলী জৈনপুরী (র) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন।[৬৫]

ফরায়েজীদের পোষাক ঃ

হাজী শরীয়উল্লাহ (র) মাথায় পাগড়ী গায়ে জামার উপর ছদরিয়া পড়তেন। তাঁর অনুসারীদেরকে তিনি ধূতীর পরিবর্তে পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি পড়ার আদেশ দেন। কিন্তু এ পোষাক হিন্দুদের জাতীয় পোষাক ছিল। তিনি বলেন, লুঙ্গি ও পাঞ্জবী প্রতিদিনের ইবাদতের জন্য উত্তম। তিনি আরো বলেন কেউ যদি ধুতি পড়তে চায় তবে দু পায়ের মাঝ খানে ভাজ করে পড়তে পারবে না। হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) এর এ নির্দেশ ইংরেজ লেখকদের নজর কেড়েছিল এবং তাদের সংশয় সৃষ্টি করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার বরেন,

ধূতী পড়ার কারণে হিন্দু মুসলমান একইরূপ মনে হত। মুসলমানদের পায়জমা খ্রিষ্টানদের মতই ছিল । হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) মুসলমানদের হাটুর নিচে পর্যন্ত ঢেকে রাখার জন্যই এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। হানাফী ও পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল। যার জন্য তাদের সঙ্গে তাদের প্রতি বেশীদের সঙ্গে কোন দ্বিমত ছিলনা। আর এ কারণগুলোই তাদের সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র দান করেছিল।[৬৬]

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

১২০৪ খ্রিঃ ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজয় বেশে ইসলামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হারাতে বসে। মুসলমানদের উপর শুরু হয় অত্যাচার জুলুম নির্যাতন। তখন মুসলমানদের জেগে উঠার আহবান নিয়ে যে সকল সংগ্রামী রাজনীতিবিদ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ভূমিষ্ঠ হন তাদের মধ্যে হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এর নাম বিষেশ ভাবে স্মরণীয়। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কালজয়ী অবদান রাখেন হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (র) ১৮১৮খ্রিঃ পবিত্র মক্কা ভূমি হতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের কৃষ্টি সভ্যতা আচার আচরন ও নৈতিকতা দেখে আতকে উঠেন। তিনি বৃটিশ শাসক ও হিন্দু জমিদারের নির্যাতন অত্যাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রামী আন্দোলন শুরু করেন এবং মুসলমানদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে খাজনা আদায়ের অজুহাতে অকারণে নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। মুঘলাদের রীতি নীতির পরিবর্তে হিন্দুদের রীতিনিতি পালন করতে বাধ্য করে দাঁড়ি রাখার পরিবর্তে গোফ রাখার নির্দেশ দেয় ও দাঁড়ির উপর ট্যাক্স বসিয়ে দেয়। হিন্দুদের ন্যায় ধূতী পড়তে বাধ্য করে। পূজার সময় চঁদা, ছাগল,হাস মুরগীসহ পূজার আনুষঙ্গিক জিনিস জোর পূর্বক আদায় করত। এমন কি জমিদাররা অবৈধ ভাবে ২৩ টি বিষয়ের উপর কর আরোপ করেছিল। হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) বৃটিশ ও হিন্দু জমিদারদের এ দৃশ্য দেখে মুসলমানদের মুক্ত ও বৃটিশ হিন্দু জমিদারদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৮৩১ খ্রিঃ ২৯ এপ্রিল ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করেন। তিনি ঢাকা জেলার নয়াবাড়ি নামক স্থানে প্রথম আন্দোলনের কর্ম ক্ষেত্র স্থাপণ করেন।[৬৭]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) কর্মক্ষেত্র স্থাপন করে 'ফরায়েজী' সংগঠনের কার্যক্রম চালাতে থাকেন। যারা ইসলামের বিধি বিধান পালন করতে আগ্রহী ছিল তারাই এ আন্দোলনের অর্ন্তভূক্ত হতে শুরু করেন। অল্প দিনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ আন্দোলনে শরীক হন। হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (র) এ সংগঠনের সদস্য ও সাধারন মুসলমানদেরকে ধর্মের সাথে কর্মের মিল রাখার জন্য আল্লাহর হুকুম মেনে চলা এবং শিরক, বিদয়াত থেকে দূরে থাকার আহবান জানান এবং ইসলামী সংস্কৃতি সভ্যতা ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফরায়েজী আন্দেলন সম্পর্কে জেমস্ টেইলর বলেন,

"কোরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কোরআন যে সব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই ছিল বর্জনীয়। মহরমের অনুষ্ঠান পালন শুধু নিষিদ্ধ ছিল না, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ"।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরায়েজী আন্দেলনের ফলে ফরায়েজী কৃষকরা হিন্দুদের কর্তৃক আরোপিত অবৈধ কর দিতে অস্বীকার করে। ফলে হিন্দু জমিদার ও ফরায়েজী অনুসারীদের মাঝে সংঘাত শুরু হয়। ফরায়েজী অনুসারীদের উপর জুলুম নির্যাতনের ফলে ফরায়েজী আন্দোলন চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। ১২২৭ বঙ্গাব্দে এ আন্দোলন ফরিদপুর,ঢাকা, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ছাড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন সাধারণত নির্যাতীত নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান কৃষক ও কারিগর শেণীর মধ্যে প্রসার ঘটতে থাকে। হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (র) ফরায়েজী আন্দোলনকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করে পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে জেমস্ টেনলর বলেন,

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ফরায়েজী আন্দোলনকে ৭ (সাত) টি ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। আর তা হলোঃ-

১. মুসলমান শাসিত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও জুমআ ও ঈদের নামায বৈধ নয় ।
২. মহরমের পর্ব ও অনুষ্ঠান পালন ইসলাম বিরোধী এবং পাপ কাজ।
৩.পীর মুরীদ পরিভাষাদ্বয় স্থানে 'ওস্তাদ' ও 'শাগরেদের' পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহা। কোন মুরীদ তার যথা সবর্স্ব পীরের কাছে সমর্পন করে যা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে শাগরেদকেও তা করতে হয় না।
৪. এ আন্দোলনে যারা যোগদান করবে তাদের মধ্যে উচ্চনীতি, আশরাফ ,আতরাফ কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরং সকলের মধ্য সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। পীর মুরীদের মধ্য যার অভাব দেখা যায়।
৫. পীর পূজা, কবর পূজা ইসলাম বহির্ভত বলে এ সকলের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
৬. তৎকালে পীরের হাতে হাত রেখে বায়াত করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তে ফরায়েজী আন্দোলনে যোগদান কারী শুধু মাত্র সকল পাপ কাজ থেকে খাঁটি দিলে 'তওবা' করে পরিপূর্ন ইসলামী জীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করবে।
৭. ধাত্রী কতৃক নব প্রসুত সন্তানের নাড়ী কর্তনকে ও ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষনা করেন এবং বলেন যে, এ কাজ স্বামীর। বেগানা ধাত্রীর নয়।[৬৯]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) উক্ত সাতটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ফলে ১৮৩৭ খ্রিঃ ফরায়েজী আন্দোলনের সদস্য সংখ্য দাঁড়ায় ১২০০০। [৭০] এ সকল সদস্যের বাহিরে বিশাল জনশক্তি ছিল যারা প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনে ও সহযোগিতা করত । ফরায়েজী আন্দোলন যখন চারদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে তখন ইংরেজ, হিন্দু জমিদার ও পুলিশের নির্যাতন ফরায়েজী সমর্থকদের উপর চালাতে থাকে। এমনকি হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) কে ঢাকা নয়াবাড়ি হতে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। আন্দোলন চলাকালে ১৮৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) কে কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোন অভিযোগ না থাকায় প্রত্যেক বার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে নয়া বাড়ি ছেড়ে ১৮৩৯ খ্রিঃ নিজ গ্রাম শামাইলে চলে আসেন। সেখান থেকে তিনি পূর্ণ গতীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সংগঠনের কার্যক্রম পৌছে যায়।[৭১]

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রশাসনিক পদ্ধতি ঃ

হাজী শরীয়তউল্লাহ (র) ফরায়েজী আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ৪ টি স্তরে বিভক্ত করে পরিচালনা করেন । যথা -

১. ইউনিট খলিফা (আঞ্চলিক প্রতিনিধি)
২. সুপারেন্টেন্ডেট খলিফা ।
৩. উপরাষ্ট্র খলিফা।
৪. ওস্তাদ (শিক্ষক)[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিট খলিফা ঃ-

প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রথম স্তর হলো ইউনিট খলিফা। গ্রামের ৩০০-৫০০ পরিবার নিয়ে ইউনিট খলিফা গঠিত হতো । ইউনিট খলিফা এ সকল পরিবারের ফরায়েজী বিধিবিধান পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন । দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে কালেমা, নামাজ, দ্বীনিয়াত শিক্ষা দিতেন। ইসলামী বিধিবিধানকে পরিপূর্ণরূপে পালন করতে বাধ্য করতেন । এলাকায় কোন মসজিদের ব্যবস্থা না থাকলে মসজিদের ব্যবস্থা করতেন এবং ইমাম নিয়োগ করতেন । পরামর্শের ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা করতেন। কেউ অসুস্থ হলে সেবার ব্যবস্থা করতেন । কোন লোক মারা গেলে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতেন। গ্রাম্য মক্তব পরিচালনা করতেন । ইউনিট কলিফা ফরায়েজী অনুসারীদের জমি থেকে উৎপাদিত ফসল থেকে উশর আদায় করতেন। তিনি বিভিন্ন ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা করতেন। তিনি দৈনিক কার্যাবলীর রির্পোট ওস্তাদের নিকট পেশ করতেন। তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু তাঁর ইউনিটের রাজনীতির খবরা খবর রাখতেন।[৭৩]

সুপারেন্টটেন্ডট খলিফা ঃ-

সুপারেন্টেন্ডেট খলিফা দশ বা ততোধিক ইউনিট খলিফার দায়িত্ব পালন ও পর্যবেক্ষন করতেন । তিনি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কাজ করতেন। তিনি প্রথমতঃ ইউনিট খলিফার কার্যবলী পর্যবেক্ষণ করতেন। ইউনিট খলিফার অধিনে যারা থাকত তাদের উপর কোন অত্যাচার বা তাদের কোন ক্ষতি করা হলে এবং ইউনিট খলিফার মিমাংসায় সন্তোষজনক না হলে। সুপারেন্টেন্ডেট খলিফা তাঁর সমাধান করতেন সুপারেন্টেন্ডেট খলিফা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতেন এবং ইসলঅমের মৌলিক বিষয় প্রচার করতেন। তিনি একটি 'আস্তানা' পরিচালনা করতেন। একজন সুপারেন্টেন্ডেট খলিফার দু'জন সহকারী পিয়ন ও পেয়াদা ছিল। পেয়াদার কাজ ছিল তাঁর কাজে সহযোগিতা করা। আর পিয়নের কাজছিল ওস্তাদের নিকট খবরা খবর আদান প্রদান করা। সুপারেন্টেন্ডেট খলিফা সেচ্ছা সেবকদের প্রশিক্ষনের দায়িত্বও পালন করতেন।[৭৪]

উপরাষ্ট্র খলিফা ঃ

ইউনিট খলিফা ও সুপারেন্টেন্ডেট খলিফার দৈনন্দিন কার্যাবলী রির্পোট বইতে লিখে রাখতেন। উপরাষ্ট্র খলিফা তাদের রির্পোট পর্যবেক্ষণে গেল তাদের রির্পোট বই দেখে সন্তোষ্ট হলে রির্পোট বইতে উপরাষ্ট্র খলিফা স্বাক্ষর ও সীল দিতেন। আর যদি তাদের রির্পোট সন্তোষ জনক না হতো তখন তাদের রির্পোট পর্যালচনা করার জন্য বাহাদুরপুর ওস্তাদের নিকট পাঠাতেন। উপরাষ্ট্র খলিফার বিচার মিমাংসাকে যর্থাথ মনে না করলে পুনরায় মীমাংসার জন্য ওস্তাদের নিকট আপিল করতে পারত। ওস্তাদ পূর্বের বিচার মীমাংসাকে যাচাই বাছাই করে সঠিক রায় দিতেন। উপরাষ্ট্র খলিফা ওস্তাদের সার্বিক্ষনিক পরার্মশ দাতা ছিলেন।[৭৫]

ওস্তাদ ঃ

সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওস্তাদের ছিলেন সর্বসর্বা। তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। সুপারেন্টেন্ডেট খলিফার রায়ে কেউ সন্তোষ্ট না হলে তারা ওস্তাদের নিকট আপিল করলে ওস্তাদ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি দিন ধার্য করে সুপারেন্টেন্ডেট খলিফাকে সমন জারি করতেন। কোন জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে উপরাষ্ট্র খলিফাকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করতেন। অতঃপর ওস্তাদ চূড়ান্ত রায় দিতেন।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

ওস্তাদের অনুমতি ছাড়া কোন 'ফরায়েজী' সরকারী কোর্টে বিচারের জন্য যেত না। ফরায়েজী আনুসারী ব্যতীত অন্য কারো সাথে বিবাদ হলে তাদেরকে ফরায়েজীদের আদালতে আসার ব্যবস্থা করা হত। যদি ফরায়েজীকের আদালতে না এসে সরকারী কোর্টে যেত আর এ ক্ষেত্রে বিচারের রায় সঠিক ভাবে না দিয়ে ফরায়েজীদের বিপক্ষে দিত তখন ফরায়েজীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।[৭৭] হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিন্যাস করে ফরায়েজী আন্দোলনকে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেন। তার ইন্তিকালের পর তদীয় পুত্র মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (র) ফরায়েজী আন্দোলনকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন এবং ইংরেজ হিন্দু জমিদারদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন ৮০০০ লাঠিয়াল বাহিনী । এ ব্যাপারে জেমস টেইলর বলেন,

contemporary of Hazy shariat allah states in A.D 1839 the faraidi movement spread with extra ordinary rapidity in the distriets of Dhaka Faridpur. Bakargong and Mymensingh in A.D 1843 of the Bengal police deseribed did Miyan as a leader at the head of 80,000 men,[78]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) প্রতিষ্ঠিত ফরায়েজী আন্দোলনকে স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য হিন্দু জমিদার ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠি নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) কে সন্ত্রাসী জুলুম নির্যাতনকারী হিসাবে চিহ্নিত করার পায়তারা চালায়। তৎকালীন ১৮৩৭ খ্রিঃ ২২ এপ্রিল "সমাচার দর্পন" পত্রিকায় একটি পত্রে তার বাস্তব চিত্র চিহ্নিত করা হয়। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

"ইদানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুরপুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক একজন বাদশাহী লওনেছুক হইয়া মূল্যধিক বার হাজার জেলা ও মুসলমান দলবদ্ধ করিয়া নিজ মতালম্বী লোকদের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটি দেশে ধর্মের রুজ্জ ভৈত করিয়া তৎচতুদিগস্থ হিন্দু দিগের বাটি চড়াও হইয়া দের দেবী পূজার প্রতি অশেষ প্রকার অঘাত জন্মাইতেছে এই জিলা ঢাকার অন্তঃ পতি মতলবগঞ্জ থানার রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জন দিয়েছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগোছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রি যোগে চড়াও হইয়া সর্বস্ব হরন করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যেটুকু ছিল ভস্ম রাশি করিলে একজন যবন মৃত হইয়া ঢাকায় দওরায় অর্পিত হইয়াছে"।[৭৯]

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এর ইন্তিকালের পরে তাঁর কৃতীত্বময় অবদানকে স্মবণীয় করে রাখা ও আর্ত মানবতার সেবার জন্য হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামে ফাউন্ডেশন বাস্তবায়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল

১. অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছেসেবী, সমাজকল্যাণ ফাউন্ডেশান হিসাবে কার্য এলাকায় অধিবাসীগনের মধ্যে একতা বিশ্বাস মানবতাবোধ জাগাইয়া তুলিতে ও মানব সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত থাকিবে।
২. এতিম খানা ও লিল্লাহ্ বডিং।
৩. পুরুষ ও মহিলা মাদ্‌রাসা।
৪. রোগী বহনের জন্য এম্বুলেন্স।
৫. লাশের মর্যাদা রাখান জন্য লাশ বহনের গাড়ি।
৬. বেকারত্বের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ঔষধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং বিরল গ্রুপের রক্তের সন্ধান করা সংরক্ষন ও মুমুর্ষ রোগীদের প্রয়োজনে সরবরাহ করা।

৮. দরিদ্র, দুস্থ, এতিম, অন্ধ, বিকলঙ্গ, বধির ও অসমর্থ লোকদের চিকিৎসা ও পূর্নবাসনের জন্য প্রকল্প গ্রহন করা।

৯. গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য দান করা।

১০. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের সাহায্য ও পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।[৮০]

পরিশেষে বলা যায়, হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ছিলেন ভারত উপমহাদেশ মুসলমান নবজাগরনের পুরোধা। তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভূমিকার ফলে বাংলাদেশের সামাজিক কুসংস্কার, কুফর, শিরক, বিধায়াতের ন্যায় অসামাজিক আমুল পরিবর্তন সাধিত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে পীর পূজা, কবর পূজা বিভিন্ন ধর্মীয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কোরআন ও সুন্নাহের আইন প্রতিষ্ঠায় আমূল পরিবর্তন আনেন। সাধারন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতার উৎস মনে করতেন না। তিনি কখনও বিপদে ধৈর্য হারা হননি। তিনি কোরআন, হাদিস ও আরবী সাহিত্যে একজন উচ্চস্তরের পন্ডিত ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. Nurul Islam Khan, Bangladesh District Gazetteers Faridpur, Bangladesh Govermment Press. Dacca-1977. p.41

২. মোশারফ হোসেন খান, হাজী শরীয়তুল্লাহ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৫ ইং.পৃ. ১১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২ ; জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বালাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, প্রগতি প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৮ ইং,পৃ. ২

৪. মোশারফ হোসেন খান, হাজী শরীয়তুল্লাহ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৫ ইং, পৃ. ৫৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৭. রাজিয়া মজিদ, শতাব্দীর সূর্য শিখা, ই. ফা. বা. ১৯৯৩ ইং, পৃ. ২৫

৮. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

১০. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), হাজী শরীয়ত উল্লাহ সাহেবের অমর জীবনী, শরীয়তিয়া প্রকাশনী গৌরনদী, বরিশাল, ১৯৫৮ ইং পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

১১. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ই.ফা.বা. (১৪ খন্ড) পৃ. ৫১০

১২. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

১৩. রাজিয়া মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৪. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৮. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, History of the Faridi Movement, Islamic Foundation of Bangladesh, 1948.p. 144

১৯. প্রাগুক্ত, p.145

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

২১. মাওলানা তাহের ছোম্বল মক্কার একজন প্রসিদ্ধ হানাফি আলিম ছিলেন। তিনি মক্কায় ছোট আবু হানিফা নামে পরিচিত। তিনি কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী ছিলেন। Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭

২২. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

২৩. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৪. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

২৫. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

২৬. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৭. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৮. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২৯. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩০. মিসবাহুল হক, পলাশীর যুদ্ধত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ই. ফা. বা. ১৯৮২ ইং পৃ. ২৩১ ; ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৪৮ ইং পৃ.১৪৪-১৪৫ ;

৩১. মিসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১; ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ), বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৩২. ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী, ডঃ এ.বি.এ. মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস (৯ম সংস্করন) নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ২০০১ ইং পৃ. ৩৭৮

৩৩. ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২ ইং পৃ. ৮৩

৩৪. গোলাম রসূল মিহ্‌র, মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড), ই. ফা. বা. ১৯৮৯ ইং পৃ. ২২৯

৩৫. মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ; হুমায়ন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, ১৯৮৩ ইং পৃ. ৫৭

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬

৩৭. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩৮. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

৩৯. মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দীন, তায্‌কেরাতুল আওলীয়া (১ম খন্ড), বর্নালী প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯৪ ইং পৃ. ১৭৫

৪০. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৪১. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশে সূফী-সাধক, ই. ফা. বা. ১৯৮৭ ইং পৃ. ১৬৭-১৬৮

৪২. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

৪৫. Board of Researchers, Islam in Bangladesh Through Ages, Islamic Foundation of Bangladesh. 1995.p. 179

৪৬. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫ ; সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (৩য় খন্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং পৃ. ২৪২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮ ডব্লিউ,ডব্লউ, হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, (অনুবাদক আনিসুজ্জামান) খোশরোজ কিতাব মহল ঢাকা, ২০০০ইং পৃ. ১১০-১১১

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৫৪. 'দারুল হারব' বলতে সাধারনত সে দেশকে বুঝায় যে দেশে মুসলমানগণ তাদের জান-মালের নিরাপত্তা পায়না, বাকস্বাধীনতা থাকে না এবং ধর্মীয় বিধীবিধান পলনে বাধার সৃষ্টি হয়।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১ ; মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয় (১ম সংস্করন), ১৯৮১ ইং পৃ. ১২৪-১২৫

৫৬. অধ্যাপক নোমান রাজা, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৮৪ ইং ,পৃ. ১৩৪-১৩৫

৫৭. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১, ২৫২ ; আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১ম ২য় ভাগ) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন ঢাকা, ১৯৯৪ ইং পৃ. ২০৩

৬৭. মোঃ আবদুল জলিল খান, ফরিদপুর গাইড, ১৯৯৮ ইং পৃ. ২১; সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৬৮. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশে সূফী-সাধক, ই. ফা. বা. ১৯৮৭ ইং পৃ. ১৭০

৬৯. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪ ; আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম, ই. ফা. বা. ১৯৯৪ ইং পৃ. ১৫৬

৭০. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫ ; সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৪৫

৭২. Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

৭৯. মোশারফ হোসেন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৮০. বাহাদুরপুর মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত ২০০১ ইং সনের বর্ষপুঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

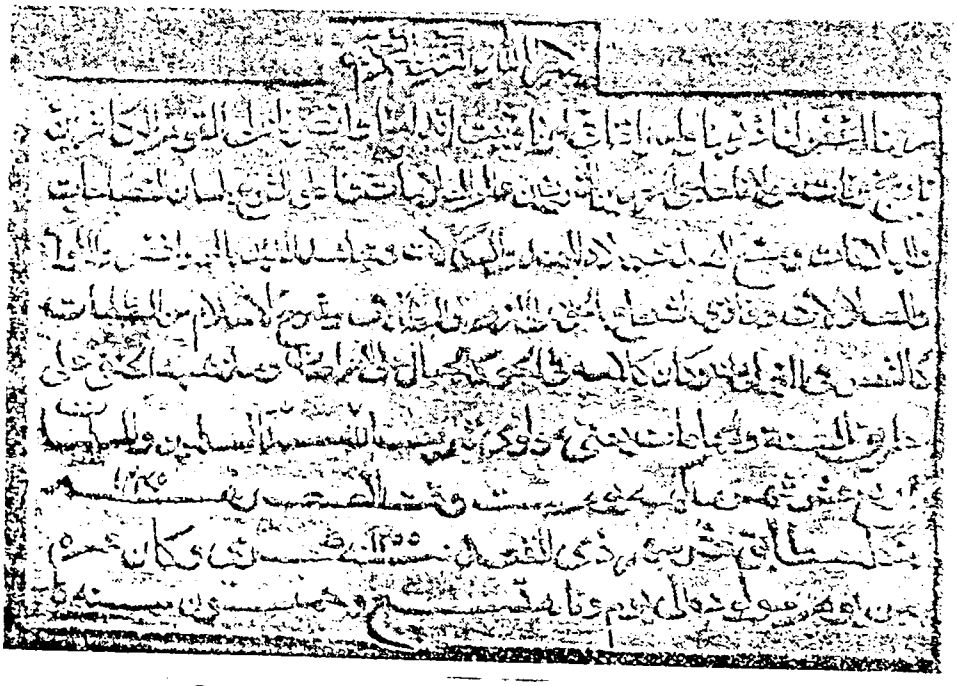

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) এর মাযারের ফলক।

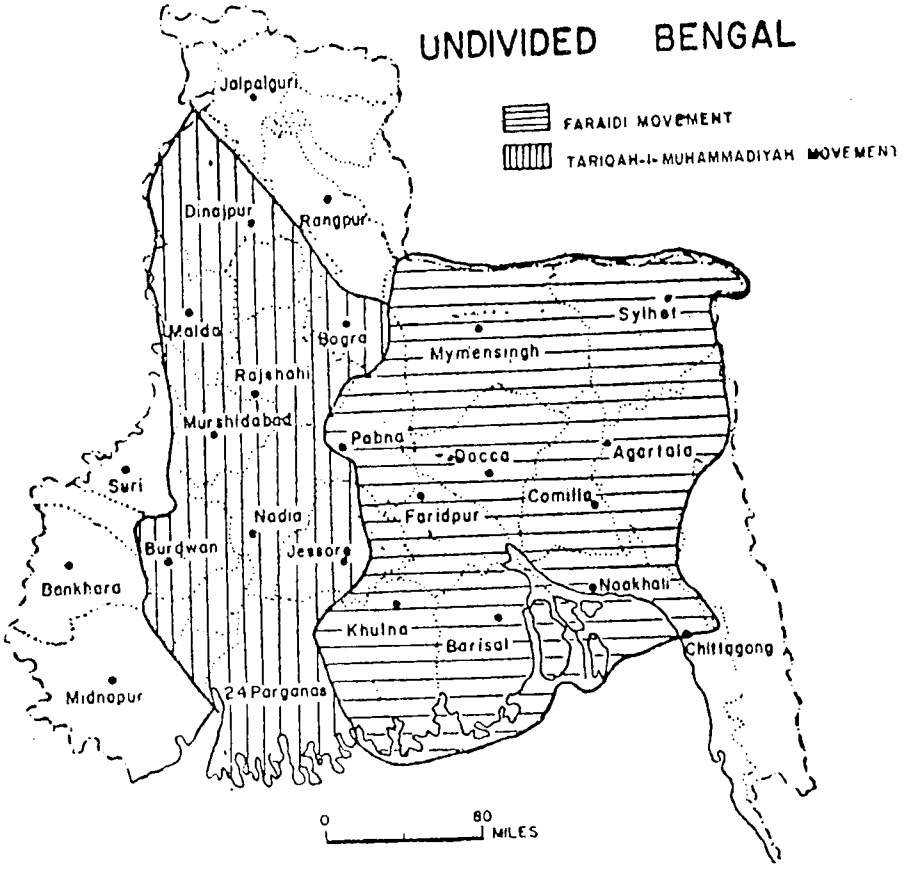

অবিভক্ত বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের মানচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ ওরফে দুদু মিয়া (র)

(১৮১৯-১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ)

রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় মুসলমানদেরকে পূনরুজ্জীবিত করার জন্য বৃহত্তর ফরিদপুরে যে সকল উলামা ও মশাইখের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পিতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) প্রতিষ্ঠিত ফরায়েজী জামাআত পূর্নগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এ প্রতিরোধের ফলে হিন্দু জমিদার, নীলকর মহাজন ও অত্যাচারী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালী কৃষকের ওপর নির্মম নির্যাতন, অত্যাচার ও অবৈধ কর আদায় বন্দ করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ প্রশাসনের পরিবর্তে তিনি গড়ে তোলেন গ্রাম্য আদালত। যার মাধ্যমে সকল মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়। তিনি এই আন্দোলনকে সোচ্চার করার জন্য বারবার কারাবরণ করেও সংগ্রাম হতে বিচ্যুত হননি এবং ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বিরোধী পীর পূজা, কবর পূজা ও বেদায়াতের বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করেন। এদেশে মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা ও বাক স্বাধীনতা না থাকায় তিনি এদেশকে "দারুল হারব" বলে ঘোষণা করেন। ফলে কোন মুসলমানের জন্য ঈদ ও জুমআর নামাজ আদায় করা জায়েজ নয় বলে তিনি ফতোয়া জারি করেন। তাঁর কালজয়ী অবদান ও কর্মময় জীবন আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার মুলফতগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] পিতামাতা আদর করে তাঁর নাম রাখেন মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া। পরবর্তীতে তিনি "পীর দুদু মিয়া" নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর মাতা নেয়ামত বিবি। পিতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) (১৭৮১-১৮৪০ খ্রিঃ) ও দাদা আব্দুল জলিল তালুকদার।[২]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন স্বীয় পিতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর নিকট। দুদু মিয়া (র) ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পিতার তত্ত্বাবধানে আরবী, ফার্সী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।[৩]

উচ্চ শিক্ষা ঃ

অতঃপর হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) পুত্র দুদু মিয়াকে আরবী সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য ১২ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মক্কা শরীফ প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি ছয় বছর যাবৎ আরবী সাহিত্য ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অধ্যয়ন করে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কা নগরীতে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) দেশে ফিরে এসে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মনোযোগী হন। তিনি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পিতার নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহন করেন।[৫] হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) পুত্র দুদু মিয়াকে তাঁর অবর্তমানে ফরায়েজী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের যোগ্য পাত্র হিসেবে গোড়ে তোলেন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তাঁকে পরিপূর্ণতায় পৌছিয়ে দেন।

খিলাফত লাভ ঃ

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর ইন্তিকালের পর ফরায়েজী জামাআতের খিলাফতের আসন শূন্য হয়ে পড়ে।[৬] তখন ফরায়েজী জামাআতের অনুসারীগণ হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর একমাত্র সন্তান মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) কে ফরায়েজী জামাআতের নেতা বা খলিফা নির্বাচিত করেন। কেননা দুদু মিয়াই ছিলেন এ জামাআত পরিচালনার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। তিনি পিতার সাহচার্য থেকে ন্যায়-নীতি, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও ফরায়েজী জামাআতকে সুসংহত করার মত যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর ইন্তিকালের পর ফরায়েজী জামাআতের অনুসারীগণ দুদু মিয়া (র) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে তাঁকে "ওস্তাদ" নামে অখ্যায়িত করেন।[৭]

বিবাহ ও পরিবার ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) একজন সুদর্শন ও লম্বা প্রকৃতির লোক ছিলেন । মইনদ্দিন আহমাদ খান ফরায়েজী মুভমেন্ট গ্রন্থে দুদু মিয়া (র) এর বৈবাহিক অবস্থা উল্ল্যেখ করতে গিয়ে বলেন, দুদু মিয়া (র) বিভিন্ন সময় মোট ১৮টি বিবাহ করেন। তবে একত্রে তাঁর ৪ টির বেশি স্ত্রী ছিল না।[৮] তিনি সর্বশেষ একজন ব্রাহ্মণের মেয়েকে মুসলমান করে বিবাহ করেন। যার বাড়ী দুদু মিয়া (র) বাড়ী হতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তিনি দুদু মিয়া (র) এর ইন্তিকালের দিন পর্যন্ত ঢাকায় তাঁর সাথে অবস্থান করেন।[৯] কিন্তু শতাব্দীর সূর্যশিখা পুস্তকে রাজিয়া মজিদ উল্ল্যেখ করেন, দুদু মিয়া (র) মোট দুটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করেন মায়ের পছন্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামে । এই স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র গিয়াসউদ্দীন হায়দার, আঃ গাফফার (নয়া মিয়া) ও সাঈদউদ্দীন আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন।[১০] এই স্ত্রীকে 'বড় বৌ' বলে ডাকা হত। পরবর্তীতে দুদু মিয়া (র) এর ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে আনুমানিক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে তার অনুরোধে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করেন। তার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। তাকে সবাই ছোট বৌ বলে ডাকত। এছাড়া দুদু মিয়া (র) জীবনে অন্য কোন স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায় না। [১১]

হজ্জ পালন ঃ

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) ১২ বছর বয়সে লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করেন। সেখানে দীর্ঘ ৬ বছর অবস্থানকালে একাধিকবার হজ্জ আদায় করেন। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে পরবর্তীতে কতবার হজ্জ আদায় করেছেন তার সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার ন্যায় তিনি পবিত্র মক্কা ভুমিতে বারবার হজ্জ আদায় করেন।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল ঃ

মোহসেনউদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) ইংরেজ জমিদার ও হিন্দুদের জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ১৮৪১ হতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার কারাবরন করেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ সেপ্টেম্বার, বাংলা ১২৬৮ সনে ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল রোডের নিজ বাসভবনে দুদু মিয়া (র) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ঢাকার বংশাল রোডে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে বংশাল রোডে তাঁর কবরের নির্দশন রয়েছে।[১৩] তবে জেমস ওয়াইজ এবং হেদায়েত হোসেনের মতে মোহসেনউদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রাম বাহাদুরপুরে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইন্তিকালের কিছু দিন পরে দুদু মিয়ার মাজার আড়িঁয়াল খাঁ নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের এ অভিমত গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা দুদু মিয়া (র) মাজার ১৩৭ বংশাল রোডে বলিয়াদি প্রিন্টিং প্রেসের নিকটে বর্তমানে অক্ষত রয়েছে।[১৪]

ধর্মীয় কর্ম ঃ

পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (র) ইসলাম প্রচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তাঁর ৪৩ বছর জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটান। ফলে তিনি ধর্মীয় সংস্কারমুলক কর্মে আশানুরুপ অবদান রাখতে পারেননি। তবুও এ স্বল্প সময়ে ইসলাম প্রচার, কুফর, শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে যে সকল কার্যকর ভুমিকা পালন করেন তা আজও স্বরণীয়। তিনি ঘোষনা করেন যে, "আল আরদু লিল্লাহ" অর্থাৎ জমিন আল্লাহর। এ জমির মালিক কোন ব্যক্তি নয়, তাই জমি থেকে খাজনা আদায় করা কারো অধিকার নেই।[১৫] লাঙ্গল যার জমি তার- এ নীতির ভিত্তিতে যে জমি চাষ করবে সেই এর অধিকারী। এ ঘোষনার মাধ্যমে তিনি ইংরেজদের অবৈধ খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে আমূল ধর্মীয় পরিবর্তন আনেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফরায়েজী খুদে দলসমূহকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংগঠনিক নির্দেশ দেন এবং প্রত্যেক মুসলমানকে কোরআন ও নামাজ শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পীর পূজা, কবর পূজা ও বেদায়াতী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কঠোর ভুমিকা পালন করে সকল মুসলমানদের নিকট ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন। দুদু মিয়ার (র) নামে নামকরণ করে বিভিন্ন এলাকায় তাঁর শিষ্যরা মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও ঈদগাহ গড়ে তোলেন। দুদু মিয়ার এক শিষ্য 'পাহলোয়ান গাজী' চাঁদপুরে নিজ এলাকায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়ার (র) নামে "মোহসেনীয়া" মাদ্‌রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬] চাঁদপুর জেলার হাজিগঞ্জের মেনাপুর গ্রামে দুদু মিয়ার নামে একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নাম করণ করা হয় 'পীর দুদু মিয়া ঈদগাহ ময়দান'।[১৭]

এভাবে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মুসলমানদের উৎসাহিত করেন। তৎকালীন সমাজে মুসলমানদের জান মালের নিরাপত্তা ও বাক স্বাধীনতা না থাকায় এদেশকে তিনি "দারুল হারব" বলে ঘোষনা করেন এবং মুসলমানদের জন্য জুময়ার নামাজ এবং ঈদের নামাজ আদায় করা জায়েজ নয় বলে ঘোষনা করেন।[১৮] এ ঘোষনার ফলে জৌনপুরের পীর মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) এর সাথে তাঁর মত পার্থক্য দেখা দেয়। দুদু মিয়া (র) বলেন, পাক-ভারত উপমহাদের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র), মাওলানা শামছুল হিন্দ, শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবী (র), মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) এর দাদা পীর এবং সৈয়দ আহমাদ বেরলোভী সহ বিখ্যাত আলিমগণ বৃটিশ শাসিত ভারত উপমহাদেশকে "দারুল হারব" বলে ঘোষনা দেন।[১৯] কিন্তু মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) ভারতীয় উপমহাদেশকে "দারুল হারব ও দারুল ইসলাম" না বলে দারুল আমান বলে ঘোষনা করেন। আর "দারুল আমানে" সকল মুসলমানের জন্য জুমআর নামাজ ও

Dhaka University Institutional Repository

ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ চলে। বর্তমান সময়ে ও ফরায়েজী জামাআতের মতে গ্রামে জুমআর নামাজ পড়া বৈধ নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধর্মীয় মতভেদ থাকার কারণে তৎকালীন সময়ে এ নিয়ে বহুবার বিতর্ক হয়েছে কিন্তু কোন সমাধান হয়নি।[২০]

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) আদর্শ শিক্ষা পেয়েছিলেন পিতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর নিকট থেকে। তাই তিনি বাল্যকাল হতেই রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। তিনি যখন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লেখাপড়ার জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন তখন তিতুমীরের সাথে সাক্ষাত করে দোয়া প্রার্থনা করেন। তখন তিতুমীরের সংগ্রামী জীবন দেখে তিনি অনুপ্রানীত হন।[২১] দুদু মিয়ার বিদায় কালে তিতুমীর তাঁর নিজের তসবীহ তাঁকে উপহার দেন। যা আজও ফরায়েজী বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া (র) মক্কা শরীফ হতে দেশে ফিরে এসে পিতার সাথে ফরায়েজী আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পিতার ইন্তিকালের পর মোহসেনউদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) সাম্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন।

অতঃপর হিন্দু জমিদার, মহাজন ও নীলকুঠিয়ালদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুঃশাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুদু মিয়া (র) জমিদার মহাজন ও নীলকর এবং ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে শোষণহীন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক মহাপরিকল্পনা গ্রহনণ করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবীতে সকল মানুষ সমান। জমির ওপর ইচ্ছাকৃত কর ধার্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই তিনি জমির উপর ইচ্ছাকৃত কর ধার্য করার ক্ষমতাকে হারাম বলে ঘোষনা করেন'। তৎকালীন হিন্দু জমিদারগণ শুধু কর ধার্য করে ক্ষান্ত হননি, তারা মুসলমান কৃষক চাষিদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের বিবাহ, জমিদার কাচারিতে আগমন, জমিদার পরিবারের শ্রাদ্ধ, পুত্রের পৈতা গ্রহন, দুর্গাপূজা ও কালিপূজা ইত্যাদি উপলক্ষে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত।[২২] দুদু মিয়া (র) মুসলমান কৃষকদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর ব্যতীত সকল প্রকার অবৈধ কর বা খাজনা দিতে নিষেধ করেন এবং ঘোষনা দেন "লাঙ্গল যার জমি তার"।[২৩] এ ঘোষনার ফলে তিনি কৃষকদের পক্ষ হতে বিপুল সাড়া পান। এ ঘোষনার ফলে হিন্দু মহাজন জমিদারদের মধ্যেও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠে। যখন দুদু মিয়া (র) এর এ মতবাদ ও উদ্দেশ্যের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন কৃষক, শ্রমিক, জনসাধারণ অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, নীলকর ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সকলে অসীম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদার মহাজনের পক্ষ হতে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে দুদু মিয়াকে বন্দি করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন সঠিক সাক্ষ্য প্রমান না থাকায় কিছুদিন পর তিনি উক্ত মামলা হতে মুক্তি পান।[২৪]

মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) মহাজন, হিন্দু জমিদার, নীলকুঠির সাহেবের অত্যাচার হতে কৃষকদের রক্ষার জন্য বাংলার বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলেন লাঠিয়াল বাহিনী। এ বাহিনীতে হিন্দু, খ্রিস্টান কৃষকরাও যোগ দেয়।[২৫] মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) এ সংগঠন গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলেন, কারণ ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থা গ্রাম এলাকায় জমিদারদের উপর ন্যাস্ত করেণ, যার কারণে জমিদাররা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করত। যদি জমিদারদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হত তখন ইংরেজ প্রশাসন জমিদারদের পক্ষেই সর্মথন দিতেন।[২৬] দুদু মিয়া (র) এর লাঠিয়াল বাহিনীর কার্যক্রম কুমিল্লা, নোয়াখালী, তদানীন্তন আসাম, সিলেট, নোয়াপাড়া, লক্ষীপুর, কামরুপ, আগরতলা ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে জমিদাররা কড়া নির্দেশ জারি করেন। যাতে প্রজারা জমিদারদের নির্দেশ অমান্য করে ফরায়েজী আন্দোলনে যোগ না দেয়। যে যোগ দান করত তাকে দৈহিক নির্যাতন করা হত। এমন নির্যাতন করা হত যার কোন চিহ্ন শরীরে থাকত না। তারা দুইজন রায়তের দাঁড়ি একত্রে বেধে নাকে লাল মরিচের গুড়া দিত। কখনো কখনো উলঙ্গ করে সমস্ত শরীরে পিঁপড়া ছেড়ে দিত। কখনো আবর্জনা ভর্তি কুপে বুক পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখত। দাঁড়িওয়ালা প্রজাদের উপর আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করা হয়।[২৮] কিন্তু এসকল নির্যতনের পরেও প্রজারা ফরায়েজী আন্দোলন হতে পিছপা হয়নি। দুদু মিয়ার (র) এ আন্দোলনকে স্তব্দ করার জন্য কানাইপুরের শিকদার ও ফরিদপুরের জমিদাররা একত্রিত হয়ে প্রজাদের মধ্যে হতে যারা গরু জবেহ করত ও অবৈধ কর দিতে অস্বীকার করত তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তাদের এ দমন নীতি অল্প দিনে ব্যর্থ হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে শিবচর থানার পাঁচ্চর গ্রামের নীলকুঠিয়ালের মালিক "এন্ডারসন ডানলপ" নামের একজন নীলকর দুদু মিয়ার নামে লুঠতরাজের অভিযোগ এনে মামলা করে ও তাঁকে বন্দি করে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ প্রমানিত নাহওয়ায় তিনি মুক্তি পান।[২৯] পরবর্তীতে ১৮৪১ খ্রিস্টব্দে জুলাই মাসে ডানলপের চক্রান্তে "চুচমা" নামের এক লোককে হত্যার অভিযোগে দুদু মিয়া (র) ও তাঁর ২২ জন শিষ্যকে অভিযুক্ত করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ঢাকার দায়রা জজ দুদু মিয়া (র) নির্দোষ প্রমানিত হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেন। আর বাকি ২২জন শিষ্যকে দোষী করে ৭ বছর করে কারাদন্ডে দন্ডিত করে।[৩০] দুদু মিয়া (র) জমিদারদের সাথে নির্যাতন, অত্যাচারের ক্ষেত্রে আপোষ করতে চান। কিন্তু দুদু মিয়া (র) আলোচনা করতে চাইলে তাদের সাথে আরো তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে দুদু মিয়া (র) উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেন। অবশেষে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে এক রাত্রে দুদু মিয়া (র) তাঁর সহকারি জালাল উদ্দীন মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকশত লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে কানাইপুরের জমিদার বাড়ি আক্রমণ করে শিকদারকে ধরে নিয়ে আসেন এবং বলেন যদি তাঁর সাথে আপোষ করা না হয় ও প্রজাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা না হয়, তবে জমিদার বাড়ির সকল ইট খুলে নেওয়া হবে। তখন শিকদার সাহেব অন্য কোন উপায় না দেখে আপোষ করতে বাধ্য হন এবং মুসলমান প্রজাদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ করেন।[৩১]

অতঃপর ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের অত্যাচারী জয় নারায়নের বাড়ি আক্রমন করেন এবং তার বাড়ির সকল মালামাল ধ্বংস করে জমিদারের ভাই মদন নারায়ণকে ধরে এনে হত্যা করে পদ্মা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে কৃষকের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন।[৩২] জয় নারায়ণ দুদু মিয়া (র) সহ ৮০০ জন ফরায়েজী প্রজার বিরুদ্ধে লুট পাটের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখলেন এখানে কোন লুটপাট হয়নি। বরং প্রজাদের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবে একাজ হয়েছে। পুলিশ দুদু মিয়া (র) সহ ১২৭ জনকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু দায়রা জজ ১০৫ জনের বিচার করে তাঁর মধ্যে হতে ২২ জনকে ৭ বছরের কারাদন্ড দেন। আর বাকি সবাইকে খালাস দেন।[৩৩] দুদু মিয়ার (র) এ বিজয় বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শিষ্য সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৮০ হাজারে। জমিদার, নীলকর ও হিন্দু জমিদারদের নির্যাতনের মাত্রা ও কমে আসে।[৩৪] এদিকে শিবচরের পাঁচ্চারের নীল কুঠির ম্যানেজার ডানলপ অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছলে দুদু মিয়া (র) সরকারের নিকট এ নির্যাতনের বিচার চান কিন্তু বিচার চেয়েও কোন ফল পাননি। কারণ প্রশাসন সকল সময় ডানলপের পক্ষে কাজ করেন। ফলে বিচার প্রার্থীকে শুধু দুঃখ বেদনা নিয়ে ফিরে আসতে হয়। ডানলপের গোমস্তা ছিল কাঞ্জিলাল। সে সরকারি সহযোগিতায় কিছু দিনের মধ্যে বিরাট জমিদারের মালিক হয়ে উঠে। সে ফরায়েজী প্রজাদের ধান চাষের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত নতুবা নির্যাতন চালাত। ফরায়েজী প্রজারা নীল চাষ করতে অস্বীকৃতি জানালে দুদু মিয়া (র) কে এসকল কর্মকান্ডের মুলহোতা মনে করে তাঁকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু উপযুক্ত কোন প্রমানের অভাবে এবারও তিনি মুক্তিপান।

Dhaka University Institutional Repository

কোন প্রকারেই দুদু মিয়া (র) কে জব্দ করতে না পেরে জমিদার ও নীলকুঠিয়ালরা ষড়যন্ত্র করে দুদু মিয়া (র) এর অনুপস্থিতে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১২৫৩ সনের ৩০ ভাদ্র সকালে ডানলপ তার গোমস্তা কালি প্রসাদ, কালি চক্রবর্তী ও গঙ্গাপ্রাসাদসহ বিভিন্ন এলাকার ৭০০/৮০০ লোক নিয়ে মোহসীন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) এর বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ির প্রধান দরজা ভেঙ্গে চারজন প্রহরীকে হত্যা করে বাড়ির প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।[৩৫] বাড়ির মসজিদে প্রবেশ করে কোরআন শরীফ, বই-পুস্তক, আসবাবপত্রে আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং নিহত প্রহরীর লাশ নিয়ে যায়। মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) এ ঘটনা শুনে বাড়িতে আসার পথে হিন্দু জমিদাররা তাঁকে অপহরণ করে পাঁচ্চর নিয়ে এক রাত দুই দিন বন্দি করে রাখে, যেন যথাসময়ে দুদু মিয়া (র) তাঁর বাড়িতে আক্রমণের অভিযোগ প্রশাসনকে অবহিত করতে না পারেন। এদিকে হিন্দু দারোগা মৃত্যুঞ্জয় তদন্ত রিপোর্ট করতে এসে দুদু মিয়া (র) অনুপস্থিত বলে রিপোর্টে উল্ল্যেখ করেন। দুদু মিয়া (র) ছাড়া পেয়ে ফরিদপুর গিয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাড়ি আক্রমণ ও লুণ্ঠনের অভিযোগের দরখাস্ত পেশ করলে ইংরেজ মজিস্ট্রেট দরখাস্ত গ্রহনের পরিবর্তে ডানলপের সাথে আপোষ করতে বলেন এবং আপোষনামা পেশ করে তাতে স্বাক্ষর করতে বলেন।[৩৬] দুদু মিয়া (র) আপোষের পরিবর্তে বারবার তদন্ত করার অনুরোধ জানান। দুদু মিয়ার (র) অনুরোধে অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেট বিরক্ত হয়ে তদন্ত করতে রাজী হন। ম্যাজিস্ট্রেট ১৬ অগ্রহায়ন তদন্তে যাওয়ার তারিখ করলেন। মোহসেন উদ্দীন আহমাদ মিয়া (র) অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট শিবচর না গিয়ে গ্রামে মহিষ শিকারে গেলেন। মহিষ শিকার করে ঢাকায় চলে আসেন। দুদু মিয়া (র) ২১ অগ্রহায়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করে ২২ অগ্রহায়ন ঢাকায় চলে আসেন। দুদু মিয়া (র) কে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট রাগান্বিত হলেন। তখন দুদু মিয়া (র) বুঝতে পারলেন এদের কাছে বিচার চেয়ে কোন ফল হবে না। বরং উপযুক্ত বিচার নিজ হতে গ্রহণ করতে হবে।[৩৭]

মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) এর একজন সহযোগী ছিলেন কোলা নিবাসী (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার) কাদির বক্স জং। তিনি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর ৫০০ শত লোক নিয়ে দুদু মিয়া (র) বাড়ি আক্রমণের ৮০ দিন পর পাঁচ্চরের নীলকুঠি আক্রমণ করে কুঠিতে আগুন ধরিয়ে দেন।[৩৮] শীমুলিয়া গ্রামে কালি প্রসাদের বাড়িতেও আক্রমণ করে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে আসেন। এরপর সবচেয়ে অত্যাচারী ও ঘৃনিত ব্যক্তি কাঞ্জি লালাকেও বন্দী করে নিয়ে আসেন। ফিরে আসার পথে পাঁচ্চরের শিবচন্দ্র, গোপী মহল, ব্রজমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও জগৎ চন্দ্র বাবুর গৃহে অগ্নি সংযোগ করে দুদু মিয়ার (র) বাড়ি হামলার প্রতিশোধ নেন। পরে কাঞ্জিলালকে বরিশালে নিয়ে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেন।[৩৯] কিন্তু ঐ ঘটনার দিন দুদু মিয়া (র) ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মহিষ শিকারে ছিলেন। তথাপিও দুদু মিয়া (র) সহ ৬৩ জনকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন, প্রতিমা ধ্বংস ও দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনা সংগঠিত হলে ম্যাজিস্ট্রেট তড়িঘরি করে ডানলপের পক্ষে রিপোর্ট করার জন্য পাঁচ্চর চলে এসে দুদু মিয়া (র) কে দায়ী করে তিনিসহ ৬৩ জনকে সেশন কোর্টে চালান করেন।[৪০] মামলায় উকিল ব্যতিত সাক্ষ্য গ্রহণ করে ঢাকার সেশন জজ হেনরী সুয়েটেন হাম দুদু মিয়া (র) সহ ৬৩ জন অনুসারিকে অভিযুক্ত করে সকলকে কারাদন্ড দেন। নিম্ন আদালতের এ রায়ের প্রতি সকলের ঘৃনাজন্মে এবং বৃটিশ কোর্টের জজের বিচারের উপর সকলে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এসকল দুর্নীতি ও বিশৃংখলার ফলে এলাকার লোকজন ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন।[৪১] এদিকে মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) তাঁর দশজন অনুসারীসহ কলিকাতাস্থ সদর নিজামত আদালতে হাজীর হয়ে সঠিক তদন্ত ও বিচারের আবেদন করেন। নিজামত আদালতের বিচারক আলবার্ট ডিউক মামলার সাক্ষ্য প্রমান গ্রহণ করে বলেন ঃ- "লক্ষণীয় যে বর্তমান মামলার বিপক্ষ দল যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান পেশ করেছেন তা ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়া (র) এর বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগের সম্পূর্ণ অনুরূপ। যার কারণে উক্ত মামলা সাজানো ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই এ মামলার আসামী নির্দোষ তাদেরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হোক"।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

এ রায়ের ফলে দুদু মিয়া (র) তাঁর ৬৩ জন অনুসারীসহ মুক্তি পান।[৪৩] কিন্তু দুদু মিয়া (র) তাঁর বাড়ি লুণ্ঠনের অভিযোগে যে মামলা করেছিলেন ডানলপের রিপোর্টের ফলে তার কোন সুবিচার পাননি।[৪৪] মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়ার (র) কারাবরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে গ্রাম বাংলার কৃষক, প্রজা, জেলে, তাঁতী, অত্যাচারীত ও উৎপীড়িত সকল মানুষ শান্তির নিঃশাষ ফেললেন। তখন পাঁচ্চরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াজীর আলী তাঁর মোসলেম রত্নহার নামক পুস্তকে লিখেন ঃ -

"ফরিদপুর জেলাধীন পাঁচ্চর পর,
বাঙ্গলার নীলকুঠী ছিল তথা পর।
কালী কাঞ্জিলাল ছিল কর্মচারী বড়,
উৎপীড়ন করত বড় মুসলমান পর
একদিন দুদু মিয়ার শিষ্য কাদের বক্স জঙ্গ
দুদু মিয়ার ইশারায় নিয়া সুবিধান
বেঈমানদের তাঁরা সবে মারিয়া ফেলিল"।[৪৫]

মোহসেনউদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করলে সমস্ত এলাকায় একটি শান্তির বার্তা শুরু হলে দুদু মিয়ার সহচর মঙ্গল বয়াতি কবিতার ছন্দে লেখেন ঃ -

"ওস্তাদের হাতে আঘাত পড়িল দুশমনের শিরে
জয়ের বার্তা তাঁর পৌছে ঘরে ঘরে ।
পরাজয় শত্রুদের মুখ হইয়া গেল চুন,
লোক করে ছি,ছি মুখে পড়িল কালি চুন।
সাপের গর্তে ঢুকিল শত্রুর নিজেকে ঢাকিতে,
বিশ্বাস না করিয়ো ভাই, শত্রুর খলামিতে,
সুযোগ পাইলে ভাই, করিবে দংশন,
এই মতে মঙ্গল বয়াতি রাখিল বয়ান"।[৪৬]

এরপর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) কে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোন প্রকার সংঘাতে যেতে হয়নি। এ সময়ে তিনি ফরায়েজী আনন্দোলনের কার্যক্রম চালাতে থাকেন। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে লোকদের ফরায়েজী জামাআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অবগত করান। ফলে দশ বছরের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ফরায়েজী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ হাজার।[৪৭] অতঃপর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন সমস্ত ভারত উপমহাদেশ জুড়ে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় তখন ফরায়েজী সংগঠনের মধ্যেও এ আন্দোলনের উত্তেজনা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অনেকে মনে করেন এখনই ইংরেজদের শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। এ সংগঠনের আক্রমণের পূর্বে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দুদু মিয়াকে ইংরেজ প্রসাশন গ্রেফতার করে কলকাতার আলীপুর সেন্ট্রাল কারাগারে প্রেরণ করেন।[৪৮] দুদু মিয়াকে গ্রেফতারের কারণ উল্ল্যেখ করতে গিয়ে জেমস্ ওয়েজ বলেন-"দুদু মিয়া গ্রেফতার হতেন না, যদি তিনি গর্ব করে কোর্টের সামনে না বলতেন আমি আহবান করার সাথে সাথে ৮০ হাজার লোক এসে হাজির হবে এবং তাদের যা করতে বলব তারা তাই করবে।[৪৯] এছাড়া গোলাম আহমাদ মোর্তাজা রচিত চেপে রাখা ইতিহাস গ্রন্থে উল্ল্যেখ করেন যে, পুলিশী রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময় দুদু মিয়ার কথামত ৮০ হাজার লোক প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।[৫০] প্রকৃত পক্ষে দুদু মিয়া (র) কে গ্রেফতারের কারণ হলো তিনি তাঁর পিতার ন্যায় স্বাধীনতায় উদ্ধুদ্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের হারানো ধর্মীয় ঐতিহ্য ফিরে পাবে। এদেশের মানুষ ঈদ ও জুমআর নামাজ আদায় করার অধিকার পাবে। সাধারন কৃষক নীলকর হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হবে।[৫১] ইংরেজরা তাঁকে শাসালে তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেন, আমি আঙ্গুলের ইশারা করে ৮০ হাজার লোক সমবেত করতে পারি এবং তাদেরকে যা করতে বলব তারা তাই করবে। মূলত একারণেই তাকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্দি করে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তাতেও তিনি মনোবল হারান নি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পেয়ে কলকাতা হতে ফরিদপুর আসার পথে একজন দারোগা ও পাঁচজন কনস্টেবল ছদ্মবেশে দুদু মিয়া (র) কে বলেন আমরা ফরায়েজী জামাআতে ভর্তি হতে চাই। দুদু মিয়া কোন প্রকার সন্দেহ না করে তাদেরকে ফরায়েজী জামআতের গোপন আস্তানায় নিয়ে যান।[৫২] দারোগা তখনই তাকে পূনরায় গ্রেফতার করে ফরিদপুর কারাগারে প্রেরণ করেন। এখানে তাকে বিনা কারণে একবছর কারাবরণ করতে হয়। অতঃপর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জেল থেকে মুক্তি পান। অতঃপর দুদু মিয়া (র) আর শিবচর অবস্থান না করে ঢাকায় চলে এসে ১৩৭ বংশাল রোডে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করার সাথে সাথে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫৩]

সামাজিক কর্ম ঃ

দুদু মিয়া (র)-এর সময় ফরায়েজী জামায়াতের প্রশাসনিক কাঠামো ঃ

ফরায়েজী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন কৃষক প্রজাদের নিয়ে এ সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁরই পুত্র দুদু মিয়া (র) ফরায়েজী জামায়াতের নেতা হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যান। দুদু মিয়া (র) ফরায়েজী জামায়াতের প্রশাসনিক কাঠামোকে যেভাবে পরিচালনা করতেন তা হলো ঃ-

১। ফরায়েজী জামায়াতের সর্বোচ্চ স্তরে যিনি থাকতেন তাকে বলা হত "ওস্তাদজী"। তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দুইজন খলিফা থাকতেন তাদেরকে উপরাষ্ট্র খলিফা বলা হত। উপরাষ্ট্র খলিফার পরে থাকতেন সুপারেনটেন্ডেন্ট খলিফা ও ইউনিট খলিফা। সুপারেনটেন্ডেন্ট খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকত। তারা নিম্ন স্তর হতে উচ্চ স্তরে খবরা-খবর আনা-নেওয়া করত।[৫৪]

২। ফরাজীরা আদালত বা পঞ্চায়ত গঠন করেন। সকল এলাকার বিচার নিজেরাই করত। সরকারি কোন আদালতে যেতে হত না। যে ক্ষেত্রে মিমাংসা করা সম্ভব হত না সে ক্ষেত্রে দুদু-মিয়া (র) নিজে উহার মীমাংসা করতেন। যার ফলে ইংরেজদের কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।[৫৫]

৩। তাদের মতে পৃথিবীতে জায়গা জমি যা আছে তার মালিক স্বংয় আল্লাহ। এতে কারো অধিকার নেই। সরকার তার ইচ্ছামত কর নেওয়ার কোন অধিকার নেই। সকল মানুষ সমান আমাদের কারো ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার তাদের নেই।[৫৬]

৪। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফরায়েজী ক্ষুদে দলসমূহের বিশেষ দায়িত্ব পালন করার সাংগাঠনিক নির্দেশ ছিল। প্রত্যেক মুসলমানকে কোরআন ও নামাজ শিক্ষা দেওয়া এবং ফরায়েজী নীতিসমূহ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ ছিল।[৫৭]

৫। ফরায়েজী নীতি ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে ব্যাক্তির স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সামাজিক ও দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ পালনের নির্দেশ দেওয়া হত। ফলে একটি অভিন্ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আওতায় ফরায়েজীগণ সংগঠিত হয়।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে বলা যায় যে, মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র) ছিলেন এক আপোষহীন সংগ্রামী এবং ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ৪৩ বছর জীবনে নীলকর হিন্দু জমিদার, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা তাকে বিদ্রোহী ও আইন অমান্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বারবার কারাগারে প্রেরণ করে ও বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেন। মামলার খরচ চালাতে চালাতে তিনি ও তাঁর পরিবার এক সময় দরিদ্র হয়ে পড়েন। তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তাঁর সন্তানরা জমিদার ও নীলকর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন নি। তবে সত্য ও ন্যায়ের পথে অসম সাহসের নেতৃত্বদানের জন্য আজও বাংলার মানুষ দুদু মিয়া (র) এর নাম গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. Nurul Islam khan. Bangladesh District Geagetteers Faridpur. Bagladesh Government press, Dhaka ১৯৭৭ ইং p, ৪১
২. পীরজাদা মুহীবউদ্দীন আহমাদ-আপোষহীন এক সংগ্রামী পীর দুদু মিয়া (র), শরীয়তিয়া প্রকাশনী। বাহাদুরপুর মঞ্জিল ঢাকা, আগস্ট ১৯৯২ ইং, পৃ, ৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০
৫. Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, History of the faraid Movmant, Islamic foundation Bagladesh ১৯৮৪. p-১৭২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৩
৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪২
৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০২
১০. রাজিয়া মজিদ, শতাব্দীর সূর্যশিখা (২য় খন্ড) ই,ফা, বা, জুন ১৯৯৪ ইং, পৃ, ১৩৮
১১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২১৩
১২. প্রফেসর ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, (১২০০-১৮৫৭) বড়াল প্রকাশনি ১৯৯৯ ইং,পৃ, ৩০২
১৩. Nurul islam khan. Bangladesh District gazatteers, p-44.
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১ ; সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং, পৃ, ৫৭৫
১৫. গোলাম রসূল মিহ্‌র, মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ই, ফা, বা, ১৯৮৯ ইং, পৃ, ২৩০
১৬. রাজিয়া মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ২২১
১৭. চাঁদপুর হাজীগঞ্জ শাহরাস্তি নিবাসী, জনাব মকবুল আহমদের জীবন ও কর্মের উপর আলোচিত ম্যাগাজিন, পৃ, ৭
১৮. পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪১
১৯. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১ম ২য় ভাগ) ইসলামিক সেন্টার কাটাবন, ঢাকা। জুন ১৯৯৪ ইং, পৃ, ২০২
২০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৩-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

২১. পীরজাদা মুহিবউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৭
২২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪
২৪. ইসলামী বিশ্বকোষ,ই,ফা,বা, (১৩ খন্ড) ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং, পৃ, ৪৫৭
২৫. নূরুন্নাহার বেগম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৮৮ ইং পৃ, ১৫২ ; সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), পৃ, ২১২
২৬. W.W. Hunter The Indian Musalman- p. 45
২৭. James wise Eastern Banal, p. 24
২৮. Dr. Muin-uddin Ahmad khan, History of the Faraidi Movemant. p. 174
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৫
৩০. Calculta Rfeviewi Vol-10, 1844. p-215-216.
৩১. মোঃ আব্দুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ই,ফা, বা, ঢাকা, মে ১৯৯৩ ইং পৃ, ১৪৭
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭
৩৩. মেসবাহুল হক-পলশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ই,ফা,বা, ডিসেম্বর-১৯৮২ ইং, পৃ, ২৬৭
৩৫. Trail of Dudu Miah- p-47-48,
৩৬. Dr Muin-ud-din Ahamad khan. History of the Faraidi Movement-p-104
৩৭. প্রফেসর ড. আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০২- ৩০৩
৩৮. পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫
৩৯. গোলাম মোর্তাজা, চেপে রাখা ইতিহাস, পৃ, ৩২৬-৩২৭
৪০. মেসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭৭
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭৮,
৪২. James wise, Eastern Banal, p. 25
৪৩. মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, (১ম সংস্কার) ১৯৮১ ইং, পৃ, ১২৫
৪৪. মোহাম্মদ ছিদ্দিক খাঁন, পীর দুদু মিয়া, পৃ, ৩৮
৪৫. Dr Muin-ud-din Ahamad khan, Histiry of the Faraidi Movement. p, 188
৪৬. রাজিয়া মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৩
৪৭. পীরজাদা মুহিবউদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০
৪৯. মিসবাহুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৪০-২৬০
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬০-২৭০
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭১-২৭৯
৫২. গোলাম মোর্তাজা, চেপে রাখ ইতিহাস, পৃ, ৩২৭
৫৩. প্রফেসর আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭) পৃ, ৩০৩-৩০৪
৫৪. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৯
৫৬. পীর মুহিবউদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫-৩৬
৫৭. মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

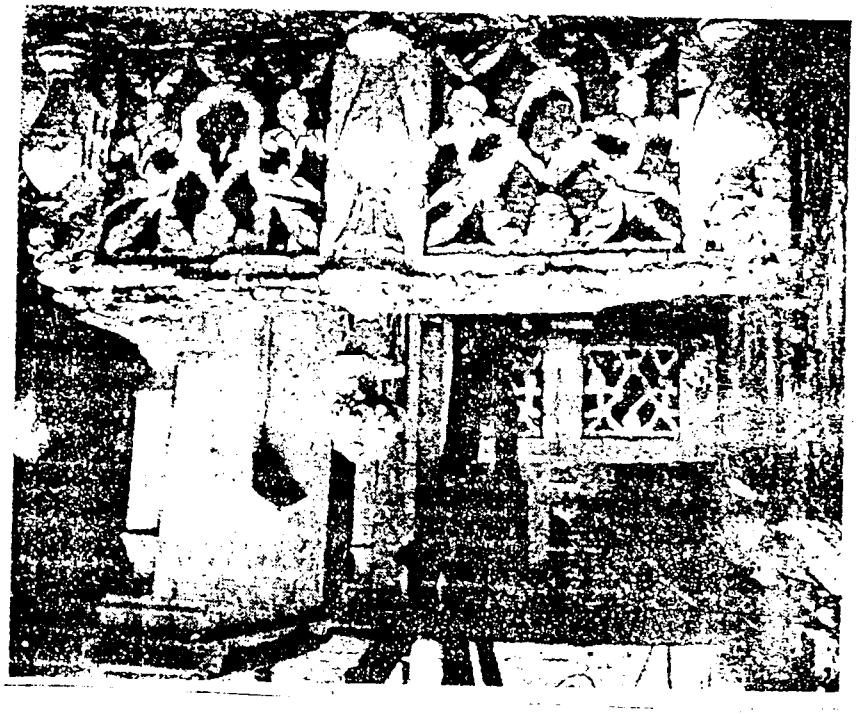

মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) এর মাযার।

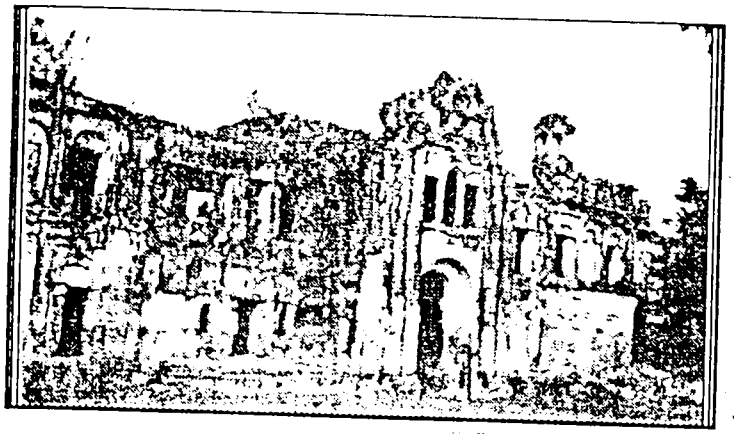

কানাইপুর শিকদার বাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) এর মাযারের গেইট।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম (১৮৫১-১৯০০ খ্রিঃ)

Dhaka University Institutional Repository

আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র)

(১৮৮৪-১৯৫৯ খ্রিঃ)

আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) বৃহত্তর ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার, সমাজ সংস্কার, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠির জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি গরীব কৃষক-শ্রমিকদের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কয়েকবদফা কারাবরন করেন। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলাদেশের সকল এলাকায় ওয়াজ মাহফিল করে লোকদের আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি সামাজিক কুসংস্কার, বেদআত, শিরক্, কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে জীবনের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন। পার্থিব সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, যশ-খ্যাতি, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ইত্যাদির প্রতি তাঁর কোন মোহ্ ছিলনা। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষ হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র), মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়ার ন্যায় ইসলাম প্রচার করাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। তাঁর এ সকল কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর জন্য আজও বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শিবচর থানার অর্ন্তগত শামাইল গ্রামে ১০ জৈষ্ঠ্য ১২৯১ মোতাবেক ২২ মে ১৮৮৪ খ্রিঃ রোজ বৃহস্পতিবার সোবহে সাদিকের সময় জম্ম গ্রহন করেন।[১] তাঁর পিতার নাম সাঈদউদ্দীন (র) (১৮৫৫-১৯০৬ খ্রিঃ)[২] পিতামহের নাম মোহসেনউদ্দীন আহমাদ ওরফে দুদু মিযা (র) (১৮৮৪-১৯৫৯ খ্রিঃ)[৩] ও প্রপিতামহের নাম হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) (১৭৮১-১৮৪০ খ্রিঃ)[৪]। আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ বাদশা মিয়া (র) পিতা মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) এর দায়িত্বকে উজ্জিবীত করার জন্য ইসলাম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেন। মাওলানা সাঈদ উদ্দিন জ্ঞান, বিচক্ষনতা ও বুদ্ধির দ্বারা ইসলাম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করেণ। পিতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে সমাজ সংস্কারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরবর্তীতে মাত্র ৫১ বছর বয়সে ১৯০৬ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন।[৫] আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়ার মায়ের নাম মোসাম্মৎ হাশমাতুন্নেছা। তাঁর নানার নাম চৌধুরী গোলাম কুদ্দুছ ওরফে দাদন মিয়া। আবা খালেদ রশীদউদ্দী আহমাদ সকলের নিকট বাদশা মিয়া নামে পরিচিত।[৬]

শিক্ষালাভ ঃ

মাওলানা আবা খালেদ রশীদউদ্দিন ওরফে বাদশা মিয়া (র) পিতৃ গৃহে লালিত পালিত হন এবং কথা বলার মত যোগ্যতা অর্জন করলে স্বীয় মাতা মোসাম্মৎ হাশমাতুন্নেছার নিকট সর্বপ্রথম কালিমা তায়্যিবার সবক গ্রহন করেন। অতঃপর স্বীয় পিতা সাঈদউদ্দীন (র) এর নিকট ১৮৮৭ খ্রিঃ সর্বপ্রথম আরবী বর্ণমালা শিক্ষা গ্রহন করে পরে মাত্র ৬ মাসে ক্বারী সৈয়দ আহাম্মদ সাহেবের নিকট কায়দায় বাগদাদি পড়া সমাপ্ত করেন। কায়দায় বাগদাদি শেষ করার পর ক্বারী মোহাম্মদ সাহেবের নিকট কোরআন পাঠ শুরু করেন। কিন্তু ক্বারী সাহেবের হঠাৎ অসুস্থতার কারনে তাঁর স্থানে হাফেজ রমজান সাহেবকে নিয়োগ দেওয়া হয়। হাফেজ রমজান সাহেবের নিকট মাত্র দেড় বৎসরে সমস্ত কোরআন পাঠ বিশুদ্ধ করে পড়া আয়ত্ব করেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিঃ থেকে নিয়মিত কোরআন শরীফ তিলায়াতে অভ্যস্থ হন।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

বাদশা মিয়ার কোরআন শিক্ষা সমাপ্ত হলে তাঁর পিতা সাঈদউদ্দীন (র) তাকে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস পোদ্দার মহাশয়কে নিযুক্ত করেন। তিনি পন্ডিত মহাশয়ের নিকট জুনিয়র ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। মাতৃভাষা শিক্ষার সাথে সাথে স্বীয় পিতা তাঁর ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তখন আলিম সমাজ ইংরেজী শিক্ষা নাযায়েজ বলে ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেন। কেননা বিজাতীয় সভ্যতা গ্রহন করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করে। অথচ হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহন না করায় অনেক পিছনে পরেন। মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) পুত্রের জীবনের মুল্যবান সময় অযথা নষ্ঠ না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাই বাদশা মিয়া (র) কে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেন।[৮] কিছু দিনের মধ্যে তিনি ইংরেজীতে কথা বলা ও লেখার মত দক্ষতা অর্জন করেন।[৯] পরবর্তীতে পিতা মাতা তাকে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাহাদুরপুরে কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান না থাকায় ১৩০৪ বাংলা মোতাবেক ১৮৯৭ খ্রিঃ ঢাকা মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করান। মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসার সুপারিন্টেনডেন্ট মাওলানা আবুল খায়ের বাদশা মিয়ার লেখা পড়ার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তাঁর অধীনে থেকে বাদশা মিয়া এক বছরে দুই জামায়াতের পাঠ্য বই সমাপ্ত করেন। ১৮৯৮ খ্রিঃ জামায়েতে হাশতমে অধ্যয়ন কালে তাঁর সাথে স্বীয়ভ্রাতা রাজীউদ্দিনও ভর্তি হন। দুই ভাই একত্রে লেখা পড়া করেন। এই মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে তাদের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেবকে নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে আরমানীটোলার মাওলানা আগা মোহাম্মদ আলী সাহেবকে ও প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। বাদশা মিয়া মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে পিতা সাঈদউদ্দিন (র) কঠিন অর্জীন রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি পিতাকে নিয়ে ভারতের দুমখা জেলার মধুপুরে চিকিৎসার জন্য যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর ১৩১২ বাংলা সনে ২১ চৈত্র বুধবার তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার সমাপ্তি ঘটে।[১০]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রত্যেক উলামা ও মাশাইখের জীবনের একটি স্তর মাত্র। মাওলানা আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) এর ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। তিনি ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে স্বীয় পিতা মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) এর নিকট ইলমে মারেফত তথা তাসাউউফের সবক গ্রহন করেন। তিনি মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে অজিফা, যিকির, তাহাজ্জুতের সালাত আদায় করতেন।[১১]

খিলাফত লাভ ঃ

আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়ার (র) পিতা মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) ১৯০৫ খ্রিঃ মোতাবেক ১৩১২ বাংলা সনে ইন্তিকালের পরে ফরায়েজী জামাতের খিলাফতের আসন শূন্য হয়ে পরে এবং কে এ আসনের অধিকারী হবে তা মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) নির্বাচিত করে যাননি। তাই তাঁর স্থলাভিসিক্ত নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদিকে মরহুম মাওলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলভী আবদুল কুদ্দুস ওরফে দরবেশ মিয়া নিয়ম অনুযায়ী খিলাফতের অধিকারী। কিন্তু তার অভিমত চাওয়া হলে তিনি উপস্থিত সকল মুরিদ, আত্বীয়-স্বজন ও এলাকার লোকদের সামনে বলেন এ মহান দায়িত্বে অধিকারী আমার স্নেহস্পদ ছোট ভাই বাদশা মিয়া। তাকে এ মহান দায়িত্বের জন্য আব্বা ইন্তিকালের পূর্বে খিলাফতের ইঙ্গিত দিয়ে যান।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বাদশা মিয়া তাঁর পিতাকে চিকিৎসার জন্য যখন ভারতের মধুপুরে নিয়ে যান তখন তাঁর পিতা বাদশা মিয়াকে বলেন, আমার মনে হয় আমি আর বেশী দিন বেঁচে থাকব না। আমার মৃত্যু যদি এখানে হয় তবে আমার মৃতদেহ মাতৃভুমিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তখন পিতার মুখে এ কথা শ্রবন করে বাদশা মিয়া কেঁদে বলেন শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আপনার অবর্তমানে আমরা কার আশ্রয়ে থাকব কেই বা ফরায়েজী জামাতের পরিচালক হবেন।[১৩] তখন মাওলানা সাঈদউদ্দীন (র) বললেন, "প্রিয় সন্তান আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হবেন এবং তিনিই রক্ষা করবেন। সর্বদা আল্লাহ্র ভয় রাখিবে, সৎপথে চলিবে অত্যাচার করিবেনা, যথাসাধ্য ইবাদত বন্দেগী করিবে, হিংসা, বিদ্ধেষ, পরনিন্দা, জুলুম, অন্যায় করিবে না। আল্লাহ্ ও তার রসূলের তরিকা অনুযায়ী চলিবে। ছবর ও শুকুর করিবে পূর্ব পূরুষের ন্যায় দ্বীনের তাবলীগ, দেশ ও জাতির খেদমত করিবে। মুরিদ ও মোতাল্লেকিনদের সহিত সদ্বব্যবহার করিবে। তোমাদের ব্যবহারে কেউ যেন মনে কষ্ট না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তোমার আম্মাকে শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন করিবে তার পরামর্শ অনুযায়ী চলিবে বাদশা মিয়াকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলিলেন, প্রিয় পুত্র আল্লাহর করুনায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) এর প্রতিষ্ঠিত ফরায়েজী আন্দোলনের ভার এবং সংসারের গুরু দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পিত হবে। সেই মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি পালন করিবে। আল্লাহর খাস দপ্তরে তোমার নাম যেন থাকে এজন্য খাস ভাবে দোয়া করি। অতঃপর বাদশা মিয়াকে স্বীয় বুকের সাথে কিছুক্ষন জড়িয়ে ধরেন।এ ঘটনার দ্বারাও মাওলানা বাদশা মিয়াকে খিলাফতের উপযুক্ত অধীকারী বলে গন্য হয়।[১৪]

অতঃপর ১৯০৬ খ্রিঃ মোতাবেক ১৩১৩ সনের ১ বৈশাখ সকলে মাওলানা বাদশা মিয়াকে ফরায়েজী আস্তানার চতুর্থ গদ্দিনশীন পদে মনোনীত করেন এবং সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহন করেন। বায়আত শেষে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে ভ্রাতামন্ডলী ! আপনারা আমাকে যে মহান দায়িত্ব দিয়েছেন তার জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমার উপর যে মাহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি তার জন্য আপনাদের আন্তরিক দোয়া, সাহায্য ও সহাযোগীতা কামনা করছি। আমি যদি ভুল পথে অগ্রসর হই তবে আমাকে সংশোধন ও সাবধান করে দিবেন। ইসলাম ও জাতির কাছে আমার এটাই আবেদন। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি খিলাফতের মহান দায়িত্ব গ্রহন করেন ।[১৫]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা বাদশা মিয়া (র) স্বীয় পিতা সাঈদউদ্দীন আহমাদ (র) এর ইন্তিকালের পর ১৯০৭ খ্রিঃ মোতাবেক ১৩১৪ সনের ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার স্বীয় মাতার পছন্দ অনুযায়ী হাজী তমিজ উদ্দীনের মধ্যস্থতায় ঢাকার নবাব পরিবারে খাজা রাসূল শেখের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ ছালেহা বেগমকে বিবাহ করেণ। তিনি পরবর্তীতে দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি। মাওলানা বাদশা মিয়া (র) এর ঔরসে দুই পুত্র মাওলানা মোহসেনউদ্দীন আহমাদ ওরফে দুদু মিয়া, মাওলানা মহিউদ্দীন আহমাদ ওরফে দাদন মিয়া ও চার কন্যা জন্ম গ্রহন করেন।[১৬]

ইবাদত বন্দেগী ঃ

মাওলানা বাদশা মিয়া (র) ইসলাম প্রচার, ওয়াজ নছিহত, সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় সংস্কার পরিবারের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত যথারীতি পালন করতেন। নামাযের ওয়াক্তের পূর্বেই নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করতেন। নামায আদায়কালে সকল প্রকার আরকান আহ্কাম একাগ্রতার সাথে আদায় করতেন। তাঁর নামাযের ধরন দেখলে মনে হত তিনি যেন প্রভু প্রেমে মত্ত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

একদা ফুরফুরা পীর সাহেবের বিশিষ্ঠ খাদেম মাওলানা মোঃ আবুল কাশেম বলেন, "মাওলানা বাদশা মিয়া (র) এর নামাযের ন্যায় নামায আদায় করার নজির বিরল, তিনি নামাযকে অতিসুন্দরভাবে আদায় করতেন।"[১৭] আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) এশরাক, চাশ্‌ত, ছালাতুত্‌তাছবিহ্‌ ও তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করার অভ্যাস ছিল। তিনি মাগরিবের নামাজান্তে নফল নামায পড়িতেন। তিনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক মাহফিলের সময় মাগরিবের নামায জামায়াতের সহিত আদায় শেষে অনত্র গিয়ে নফল নামায শেষ করে পূনরায় সভায় ফিরে আসতেন। তিনি তাহাজ্জুতের সালাত আদায় শেষে জিকিরে মশগুল হতেন এবং জিকির অবস্থায় ফজর পর্যন্ত অতিবাহিত করতেন। ফজরের নামাযান্তে কোরআন তিলোয়াত করে ইশরাক নামায আদায় করে অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতেন। তার ইবাদত বন্দেগী ছিল ইখলাছে পরিপূর্ণ। তিনি কখনো লোক দেখানো ইবাদত করতেন না।[১৮]

হজ্জ পালন ঃ

বাদশা মিয়া (র) জীবনে দুবার পবিত্র মক্কা নগরীতে হজ্জ পালন করেন। সর্বপ্রথম হজ্জ পালন করেন ১৯২৪ খ্রিঃ মোতাবেক ১৩৩১ সনে ২ জৈষ্ঠ্য এ হজ্জে তাঁর সাথে ১২০০ হজ্জ যাত্রী হজ্জের সঙ্গী হন।[১৯] তাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর মুরিদ। তিনি মুরিদদের নিয়ে কলকাতা হয়ে জাহাজ যোগে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।[২০] পথে হজ্জ যাত্রীদের হজ্জের আহকাম ও দ্বীনি মাসআলা শিক্ষা দেন। জাহাজ জিদ্দাহ্‌ বন্দরে পৌঁছার পর তিনি সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (আ) কবর জিয়ারত করেন।[২১] অতঃপর সৌদি বাদশার আমন্ত্রনে বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে মাগরিবের নামায আদায় করেন। রাত্রে এশার নামায বায়তুল্লায় আদায় করেন। ১৯২৪ খ্রিঃ ৯ জুলাই বাদশার আমন্ত্রনে এক নৈশ ভোজে হাজির হন। ঐ ভোজে বিশ্বের অনেক সম্মানীত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সৌদী বাদশা সকলের জন্য শাহী খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং সকলের জন্য একসেট স্বর্নের চামচ ও স্বর্ণের চাকুর ব্যবস্থা করেন। বাদশা মিয়া উহা ইসলাম পরিপন্থি বলে ব্যবহার করেন নি।[২২] ভোজ অনুষ্ঠান শেষে বাদশা বঙ্গদেশের মুসলমানদের তাহজিব তামাদ্দুন সমন্ধে জানতে চাইলে তিনি বাদশাহের নিকট এদেশের মুসলমানদের কৃষ্টি সভ্যতা তাহজিব ও তামাদ্দুন বর্ণনা করেন।[২৩] ১৩৩১ খ্রিঃ ২৭ আষাঢ় মোতাবেক ১৯২৪ খ্রিঃ ১১ জুলাই শুক্রবার হজ্জ শুরু করে একের পর এক হজ্জের কার্যাবলী ধারাবাহিকভাবে শেষ করেন। মাওলানা বাদশা মিয়া (র) দ্বিতীয়বার ১৯৫৫ খ্রিঃ হজ্জ আদায় করেন।[২৪]

ইন্তিকাল ঃ

১৯৪০ খ্রিঃ মাওলানা বাদশা মিয়া (র) কঠিন অজীর্ন রোগে আক্রান্ত হন। দেশের চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়ায় কলকাতায় ডাক্তার কুমুদ শঙ্কর রায়ের নিকট চিকিৎসাধীন থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।[২৫] এর কিছুদিন পরে তিনি পূণরায় ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৫৯ খ্রিঃ বেশী দুর্বল হয়ে পড়েন। যার কারনে বাহিরে চলাচল করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তখন মাওলানা বাদশা মিয়া ঢাকা ছেড়ে নিজ বাড়ি বাহাদুরপুর অবস্থান করেন। ২৭ অগ্রহায়ন রোজ রবিবার ১টা ১৫ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে বাহাদুরপুর নিজ পারিবারিক গোরস্তানে তাঁর পিতার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজিক কর্ম ঃ

পৃথিবীতে যে সকল নবী রাসূল, উলামা ও মাশাইখের আগমন ঘটেছে তাদের কর্মময় জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তারা ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্দের সংগ্রাম করেছেন। বাদশা মিয়া (র) ছিলেন অনুরুপ একজন সমাজ সংস্কারক। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান স্মরণীয়। তিনি দীঘ ৭৫ বছরে বহু সমাজ সংস্কারক মূলক কাজ করেছেন। তিনি যে সকল সমাজ সংস্কারকমুলক কাজ করেছেন তার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১. তৎকালীন সমাজে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে সাথে লক্ষীপূজা করিত। বাদশা মিয়া (র) এই লক্ষীপূজাকে কবিরাগুনা বলে ঘোষনা করেন এবং সমাজ থেকে এই লক্ষীপূজা বন্দের কঠোর নির্দেশ দেন।[২৭]

২. কবরপূজা,কবরে সিজদাকরা,কবরস্থানে বাতি জ্বালানো ও কবরের উপর ইমারত তৈরী করা,সেখানে একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠান করা এসকল কবরপূজা,পীরপূজা বেদয়াতী কাজ। তিনি এ সকল বেদয়াতী কাজের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালান এবং এসকল বেদয়াতী কাজ বন্দের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহন করেন।[২৮]

৩. মদ, গাজা, প্রভৃতি নেশার দ্রব্য পান করার বিরুদ্ধে তিনি মুসলমানদের সতর্ক করেন। তার প্রচেষ্টায় অনেকে এসকল গর্হিত কাজ বর্জন করেন।[২৯]

৪. বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে একটি কুপ্রথা ছিল আশ্বিনে রান্না করে কার্তিক মাসে খাওয়া বাদশা মিয়া (র) এসকল বেদয়াতী কাজকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করেন।[৩০]

৫. শিয়াদের ন্যায় মুহরাম মাসের ১০ তারিখে আশুরার সময় তাজিয়া তৈরী করে হায় হোসেন, হায় হোসেন করে নিজের শরীরে চাবুক মারার ন্যায় বেদয়াতী কাজ করার বিরুদ্ধে তিনি সুন্নী মুসলমানদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

৬. তিনি মৃত্যু ব্যক্তির নামে চল্লিশা খাওয়ানো হতে মুসলমানদের বিরত থাকার জন্য জোর প্রচার চালান।[৩১]

৭. তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে মহিলাদের হায়লা গান করা ও নর-নারীর একত্রে আমোদ প্রমোদ করা হিন্দুদের ন্যায় রং ছিটানো এসকল কুসংস্কার কার্যাবলী হতে মুসলমানদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং বন্ধ করার বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৩২]

৮. বিভিন্ন পীর, ফকির ও দরগাহের নামে মান্নত করাকে বাদশা মিয়া (র) বেদায়াতী বলে ঘোষনা করেন। তিনি বলেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা শিরক।[৩৩]

৯. তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পূজা, মেলা ও তেহার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে নিষেধ করেন।

১০.তৎকালিন সময় মৎস্য শিকার করা ও বিক্রয় করা মুসলিম সমাজে নিন্দার কাজ বলে মনে করা হত। বাদশা মিয়া (র) মৎস্য শিকার করা ও বিক্রয় করা ইসলাম বিরোধী কাজ নয় বলে ফতোয়া জারি করেন। ফলে অনেক মুসলমান ব্যক্তি মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১.ক্ষৌরাকারের কাজকে বিজাতীয় কাজ বলে কেউ উহা করিত না। বাদশা মিয়া (র) উক্ত কাজ করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহ দেন। ফলে অনেকে এ কাজকে আনন্দের সাথে গ্রহন করে জীবিকা নির্বাহ করেন।[৩৪]

১২.লোহা দ্বারা দা, কাঁস্তে, কোদাল ও কুঠার তৈরী করা মুসলমানদের জন্য নিন্দার কাজ বলে মনে করা হত। বাদশা মিয়া (র) তাঁর মুরীদদের মধ্যে হতে অনেককে এ বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে এ কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের জন্য উৎসাহিত করেছিলে ।[৩৫]

১৩.তিনি বেদায়াতের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। বেদায়াতী ও শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীকে কঠোর হস্তে দমন করেছেনে।

১৪.১৯৫৫ খ্রিঃ পাকিস্তানের রাজধানী করাচী হতে স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলামে ফরিদ আহমাদ জাফরী একটি প্রবন্ধে কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে কটাক্ষ করে আক্রমনাত্তক উক্তি করলে বাদশা মিয়া (র) ১৯৫৫ খ্রিঃ ৩ এপ্রিল পল্টন ময়দানে এক জনসভায় এর কঠোর প্রতিবাদ করেন।[৩৬]

আঞ্জুমানে রশিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা ঃ

আবা খালেদ রশীদউদ্দিন আহমদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) শুধু ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন না। তিনি সমাজ সংস্কারক ও জনহিতকর কার্যাবলীর সাথে জড়িত ছিলেন। ১৩৩৩ সনে ৭ বৈশাখ ১৯২৬ খ্রিঃ ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার বাদশা মিয়া (র) মুসলমান সমাজে ইসলামী জীবন ব্যাবস্থা কায়েম, ধর্মীয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও শিল্প বিদ্যার উন্নতির জন্য এলাকার বহু লোক নিয়ে আঞ্জুমানে রশিদুল ইসলাম নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর কার্যক্রম সর্ব প্রথম পাচ্চার এলাকায় শুরু করেন।[৩৭] এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে গরীব মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ দেওয়া হত। দুঃস্থ মানবতার সেবা ছিল এর প্রধান কাজ। কয়েক বছরের মধ্যে ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় এ সংস্থার প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সংকটের কারনে আস্তে আস্তে এ সংগঠন বন্ধ হয়ে যায়।[৩৮]

ধর্মীয় কর্ম ঃ

মাওলানা বাদশামিয়া (র) ইসলাম প্রচারে সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সাথে ধর্মীয় কর্ম কান্ডের ক্ষেত্রে মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্যাবলীর সাথে সাথে ধর্মীয় কার্যাবলীর ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তা-রের উদ্দেশ্যে অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজদের শাসন আমলে ১৩৩৭ সনে ১ ভাদ্র বাহাদুরপুর মঞ্জিলের নিকটে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহর নামে নাম করন করে বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৯] ১৯৪৫ খ্রিঃ মোতাবেক ১৩৫১ সনে মাদ্‌রাসার পাঠ্য অনুযায়ী পাঠ দান শুরু করেন। এলাকার ইসলামী অনুসারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করেন।[৪০] ফলে ১৯৪৬ খ্রিঃ আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা দেওয়ার বোর্ড কতৃক অনুমতি পান। বাদশা মিয়া (র) মাদ্‌রাসাকে দালান করার সিদ্ধান্ত নিলে ফরিদপুর জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার স্কিম নিয়ে ১৫২ হাত দৈর্ঘ্য ২০ হাত প্রস্থ দ্বিতলের পরিকল্পনা গ্রহন করে ১৯৪৬ খ্রিঃ এগার হাজার টাকার কয়লা ক্রয় করে

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসার দালান তৈরীর জন্য ইট পোড়ান। বাদশা মিয়া (র) দেশের ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের নিয়ে মাদ্‌রাসার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। সরকারী সাহায্য না পেয়ে বাদশা মিয়া (র) জনগনের সাহায্য নিয়ে মাদ্‌রাসার নির্মান কাজ শুরু করেন।[৪১] বাদশা মিয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল মাদ্‌রাসার দালানের কাজ সম্পন্ন করা ও মাদ্‌রাসা কামিল শ্রেনী পর্যন্ত উন্নতি করা । কিন্তু তিনি সে সুযোগ পাননি এর পূর্বেই তিনি ইন্তি-কাল করেন।[৪২] কিন্তু অন্তিমকালে তার মুরিদ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একাজ সম্পন্ন করার জন্য অসিছয়ত করে যান। ১৯৬০ খ্রিঃ ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ শামসুদ্দীন আহমাদ চৌধুরীর সহযোগিতায় দালানের একতলা কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৬১ খ্রিঃ বাদশা মিয়া (র) এর পুত্র মোহসেনউদ্দীন আহমাদ ওরফে দুদু মিয়ার প্রচেষ্টায় শরীয়তিয়া মাদ্‌রাসাটি কামিল শ্রেনী খোলার অনুমতি লাভ করে ও সরকারী অনুদান ভুক্ত হয়।[৪৩] কামিল জামাত খোলার জন্য ১৩ হাজার টাকার কিতাব ৫ হাজার টাকার রিজার্ভফান্ড ছাত্রদের ছাত্রাবাসের জন্য মোট ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। বাহাদুরপুর, শিবচর, মাদারীপুর, কালকিনি, পালং, ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট এলাকার মাওলানা বাদশা মিয়া (র) এর মুরিদ ও ঢাকার দানশীল ব্যক্তিবর্গের দানে এ দালানের কাজ সমাপ্ত হয়। ১৯৬৩ খ্রিঃ থেকে কামিল পরীক্ষায় ছাত্ররা অংশ নিতে শুরু করে। ১৯৬৫ খ্রিঃ শরীয়তিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় এক ছাত্র মাদ্‌রাসা বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় দ্বিতল বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং ও একতলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং রয়েছে। বিল্ডিং দুটি উত্তর দক্ষিনে লম্বা ও পূর্বমুখী নির্মান করা হয়েছে।[৪৪]

লিল্লাহ্ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা বাদশা মিয়া (র) শরীয়তিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের থাকার জণ্য প্রাথমিক অবস্থায় বাদশা মিয়ার বৈঠকখানায় ও মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মিয়ার হাটের সূতা ব্যবসায়ীদের কয়েকটি ব্যবসায়ী ঘর ছাত্রদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পরে মাদারীপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সৈয়দ মুহিউদ্দীন মুজতবা (বর্দ্ধমাণী) সাহেব ছাত্রদের বাস গৃহের জন্য রিলিফ ফান্ড হতে ২০ বান টিন দান করেন।[৪৫] বাদশা মিয়া (র) নিজ তহবিল হতে ৪,০০০/- টাকা খরচ করে উক্ত টিন দ্বারা একটি টিনের ঘর নির্মান করেন। কিছুদিন পরে নারায়নগঞ্জ শহরের নিবাসী বাদশা মিয়ার মুরীদ মৌঃ হেদন আলী মিয়া বোর্ডিং এর জন্য দুইটি ঘর নির্মান করে দেন। আর ঐ গৃহের নাম রাখা হয় হেদন বোর্ডিং।[৪৬] এছাড়া বিভিন্ন ধর্ম পরায়ন ব্যক্তিরা ধানের মৌসুমে ধান ও অন্যান্য মৌসুমে বিভিন্ন ফসল লিল্লাহ্ বোর্ডিংর জন্য দান করেন। আর উহা দ্বারা ছাত্রদের ফ্রি খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় অসগনিত ছাত্র দ্বীনি ইলম শিক্ষা করছে ও কামিল হাদিস বিভাগ হতে প্রতিবছর অগনিত ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের কাজে নিয়োজিত আছে। লিল্লাহ্ বোর্ডিংয়ে ছাত্রদের থাকা খাওয়া ও লেখা পড়া সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ধারাবাহিকতা আজও বৃদ্ধমান রয়েছে।[৪৭]

হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা বাদশা মিয়া (র) ১৯৩১ খ্রিঃ শরীয়তিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ৫/৬ বছর পূর্বে বাদশা মিয়া (র) এর বাস ভবনের নিকটে একটি হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ খ্রিঃ শরীয়তিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে উক্ত হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা পুনরায় চালু করেন। একজন হাফেজ ও একজন ক্বারী দ্বারা এ মাদ্‌রাসা পরিচালনা করেন।[৪৮] প্রতিবছর যে সকল ছাত্র হেফজ শেষ করেন তাদেরকে বার্ষিক মাহফিলের সময় মাওলানা বাদশা মিয়া (র) দস্তার বন্দী ও ছনদ প্রদান করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রত্যেক এলাকায় ফোরকানীয়া ও হাফেজীয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি মাদ্‌রাসার গরীব ছাত্রদের বিভিন্ন সময় কিতাব ও জামা কাপড় দিয়ে সাহায্য করতেন । তিনি মাদ্‌রাসার সকল ছাত্রের সুন্নতি পোষাক ও আমল আখলাকের ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দিতেন।[৪৯]

বার্ষিক মাহ্‌ফিল ঃ

বাদশা মিয়া (র) ১৯৪৭ খ্রিঃ থেকে প্রতি বৎসর মাদ্‌রাসায় বার্ষিক মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন।[৫০] তবে মাহফিলের নির্ধারিত কোন তারিখ ছিল না। বাৎসরিক মৌসুম অনুযায়ী এ মাহফিলের ব্যবস্থা করতেন। এ মাহ্‌ফিলে বাংলাদেশের ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, পাবনা, যশোর, খুলনা ইত্যাদি এলাকা হতে বহু লোক দ্বীনি আলোচনা শোনার জন্য আসতেন।[৫১] যারা বিভিন্ন এলাকা হতে আসতেন তাদেরকে দু বেলা খাবারের ব্যাবস্থা করা হত। এলাকার ধর্মপ্রান লোকজন খাবারের জন্য ডাল, চাল, মুরগী, খাশী ও তরিতরকারী দান করতেন। বার্ষিক মাহ্‌ফিলের ক্রমধার বর্তমানেও চলছে। পূর্বে বাৎসরিক মাহ্‌ফিল একদিন হত। বর্তমানে একাধারে তিনদিন মাহ্‌ফিল হয়ে থাকে।[৫২]

নছিহত ঃ

আবা খালেদ রশীদউদ্দীন আহমাদ ওরফে বাদশা মিয়া (র) ০২-০৮-১৩৬৬ বঙ্গাব্দে মুরীদ, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে কিছু নছিহত করেন। তিনি যে সকল বিষয় নছিহত করেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ-

১. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। ভাল, মন্দ, সুখ ও দুঃখ সবই আল্লাহর তরফ হতে হয়। সুখ দুঃখ, বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে সম্পুর্নরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করিবে।

২. সর্বদা পাক সাফ থাকিবে ও আল্লাহর যিকির দ্বারা জবানকে তাজা রাখিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত আদায় করিবে।

৩. প্রত্যেক কাজে নিয়ত খালেস রাখিবে। যা কিছু করিবে আল্লাহ তায়ালার জন্য করিবে।

৪. লোভ লালসা দমায়ে রাখিবে। যে অবস্থায় থাকুননা কেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে।

৫. দ্বীন দুনিয়ার কাজ ও আমল, ইবাদত শুদ্ধরূপে করার মত ইলম শিখবে ও অপরকে শিখাবে।

৬. নারী জাতী আপনার অধীন, তাদেরকে পর্দা, শিক্ষা ও সৎ উপদেশ দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করিবে।

৭. প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখিবে, সৎ ব্যাবহার করিবে ও সুখ দুঃখের ভাগী হবে।

৮. এতিম গরীব, দুঃখী ও বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করিবে।

৯. জান মাল ইজ্জতের হিফাজত করিবে।

১০.ঈমান ও আমলের প্রতি অটল থাকিবে।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মকান্ড ঃ

ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন ব্যাবস্থা। ঈমান, আকিদা, ইবাদত, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সমষ্টির নাম ইসলাম। রাজনীতি ইসলাম বহির্ভূত নয়। বিশ্ব নবী (সঃ) বলেছেন, ধর্ম ও রাজত্ব জমজ সন্তানের ন্যায়।[৫৪] হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একদিকে ধর্ম প্রচার অপরদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাদশা মিয়া (র) ছিলেন রাসূলের অনুসারী। তাই তিনি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯০৬ খ্রিঃ অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশান কনফারেন্স ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে নবাব সলিমুল্লাহর সাথে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক সম্রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিত্র ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য কামনা করেন। যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হলে বৃটিশ উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন মুসলিম নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। এতে বাংলাদেশ পাক ভারত উপমহাদেশের আলিম উলামা ও সাধারন মানুষ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। বাদশা মিয়া (র) ও এই আন্দোলনে যোগদান করেন।[৫৫] ১৮৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়র পরে ইংরেজরা বুঝতে পারল যে, মুসলমানরা সুযোগ পাইলে তাদের সাম্রাজ্য পুণরায় দখল করার জন্য জান মাল বিসর্জন দিতে কুন্ঠাবোধ করবে না।[৫৬] তাই তারা হিন্দুদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আনুগত্য করেন। মুসলমানরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা না করায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। এমনকি সকল মাদ্‌রাসা, মক্তব, মসজিদের সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেন। হিন্দুদের মুক্ত হস্তে দান করতে লাগলেন। মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের কারনে অনেকে মনোক্ষুন্ন হন। এই বৈষম্য মুলক আচরনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমাদ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৫৭]

১৩১৩ সনে ১১ পৌষ মোতাবেক ১৯০৬ খ্রিঃ ২৬ ডিসেম্বর বুধবার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে বগুড়া জিলার নওয়াব আলী বাহাদুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেষ্টা ও উদ্দিপনায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরীর শাহবাগে অল ইন্ডিয়া এডুকেশান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। বাদশা মিয়া (র) ফরায়েযী জামাতের প্রধান হিসাবে এ কনফারেন্সে যোগদান করেন। এ কনফারেন্সে আগত মেহমানদের জন্য যে অভ্যর্থনা আবাসের ব্যাবস্থা করা হয় উহা মেহমানদের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাই তারা অসুবিধা ভোগ করেন। বাদশা মিয়া (র) ইহা উপলব্দি করে অতিথীদের স্থান পরিবর্তন করার জন্য স্যার সলিমুল্লাহর নিকট অনুরোধ করেন। তার অনুরোধ অতিথীদের এডওয়ার্ড হাউজে থাকার ব্যাবস্থা করা হয়। এ কাজ করার জন্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাদশা মিয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন আপনি প্রশংসার যোগ্য কাজ করেছেন।[৫৮] এ কনফারেন্সে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপস্থিত নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে বাদশা মিয়া (র) চাঁদা গ্রহন করেন এবং নিজেও ১২০ টাকা চাঁদা দেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে শিক্ষার আলো প্রসারিত হয়।[৫৯] ইংরেজদের শাসন শোষন ও নির্যাতনের শিকার ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত ঐক্যের ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের কর্তৃত্ব থেকে ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য এ কংগ্রেসের জন্ম। কংগ্রেসে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশী ছিল। হিন্দুরা কৌশলে চুপে চুপে ইংরেজদের সাথে আতাত করে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের মনোভাব বুঝতে পেরে স্থির করল তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে হলে হিন্দুদের ব্যতীত মুসলমানদের নিয়ে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন করতে হবে। তখন স্যার নবাব সলিমুল্লাহর প্রচেষ্ঠায় ১৯০৬ খ্রিঃ মুসলিম লীগ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬০] মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক খরচ ও প্রতিষ্ঠার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হয়। স্যার নবাব সলিমুল্লাহ চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব বাদশা মিয়ার উপর ন্যাস্ত করেন। তিনি বহু এলাকা ঘুরে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা করেন। ১৯০৭ খ্রিঃ ঢাকার রেকাবী বাজার বন্দরে বাদশা মিয়ার মুরীদদের উদ্যোগে একটি কনফারেন্স হয়। কনফারেন্সে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ সভাপতি হয়ে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক শহর বন্দর গ্রাম গঞ্জে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে দেন। মুসলীম লীগের সুবাদে ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত পাকিস্তান জন্ম হয়। এর কিছু দিনের পর মুসলীমলীগের স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিদের ইন্তিকালের ফলে কিছু সংখ্যক স্বার্থলোভী লোকের প্রবেশে মুসলীমলীগের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। ফলে বাদশা মিয়া (র) মুসলীম লীগ হতে বেরিয়ে আসেন।[৬১] ১৯২৬ খ্রিঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অশিক্ষিত কিছু সংখ্যক মুসলমানদের নানা প্রলোভন ও হত্যার ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা চললে বাদশা মিয়া (র) এর প্রতিবাদ জানান।[৬২] ঐ সময় লাহোরের রাজ পাল নামক এক হিন্দু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে কুৎসা পূর্ন "রঙ্গীলা রাসূল" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বাদশা মিয়া (র) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য জোড় প্রতিবাদ জানান ও "রঙ্গীলা রাসূল" পুস্তকের তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৬৩] ১৩৩৬ সনের ১৭ আশ্বিন মোতাবেক ১৯২৯ খ্রিঃ ২৩ সেপ্টেম্বর সিমলা বড়লাটের সভায় ইসলাম বিরোধী সারদা আইন পাশ করা হয়।[৬৪] উক্ত বিলে সারদা আইন অমান্যকারীদের একমাস জেল ও একহাজার টাকা জরিমানা নির্ধারন করা হয়। বাদশা মিয়া (র) প্রদেশিক মুসলীম সমিতিতে যোগদান করে এ আইন ইসলাম পরিপন্থী বলে এ আইনকে ভঙ্গ করে তার মেঝ কন্যাকে ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়ার নিকট বিবাহ দেন।[৬৫]

১৯৩৬ খ্রিঃ অবিভক্ত বাংলার কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক কৃষক প্রজাপার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশা মিয়া (র) উক্ত কৃষক প্রজাপার্টির পৃষ্টপোষক মনোনীত হন। তাঁর উদ্যোগে জমিদারী উচ্ছেদ বিলটি কৃষক প্রজাপাটির কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত হয়। এর ফলে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হয়ে অগনিত কৃষক মুক্তি পেয়ে জমিদার ও তালুকদারদের অবৈধ কর, জুলুম ও অত্যাচার হতে মুক্তি পায়। উক্ত আইনের ফলে অসংখ্য কৃষক মহাজনের কবল হতে মরগেজ, ভূমি ফেরৎ পেয়েছিল।[৬৬] ১৩৪৫ সনের ২২ শ্রাবন মোতাবেক ১৯৩৮ খ্রিঃ ৭ আগস্ট রবিবার বাদশা মিয়ার (র) নেতৃত্বে কলকাতা নগরীর ১৩৭ নং ঝাউতলায় সাবেক পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ফরিদপুরের আবদুল্লাহ্ জহিরউদ্দীন ওরফে লাল মিয়া সাহেবের মধ্যস্থতায় কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলীম লীগের মধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিঃ কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক সকল দ্বন্দ পরিত্যাগ করে মুসলমানদেরকে মুসলীম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার আহবান জানান। বাদশা মিয়া (র) তখন ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলীম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলীম লীগ মনোণীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচনী প্রচারনা চালান এবং পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সকল মুসলমানদের রাজনৈতিক কোন্দল ভুলে মুসলীম লীগকে শক্তিশালী করার আহবান জানান।[৬৭] ১৯৪৭ খ্রিঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কোরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার তা গ্রহন করেননি। ১৯৫১ খ্রিঃ পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী জানালে মুসলীম লীগ সরকারের পুলিশ বাহিনী গুলি করে কতিপয় ছাত্রকে হত্যা করলে বাদশা মিয়া (র) প্রকাশ্যে হত্যাকরীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবী জানান।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ খ্রিঃ অবিভক্ত বাংলার ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মন্ত্রী আওয়ামী মুসলীম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দী চাঁদপুর সভা করতে গেলে বাদশা মিয়া (র) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে মুসলিম লীগের বিপরীতে সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি ঐক্যজোট গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নিজামে ইসলাম ও কৃষক শ্রমিক পাটির সমন্বয়ে বাদশা মিয়া (র) নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[৬৯] নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাথে মুসলিমলীগের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বাদশা মিয়া (র) যুক্তফ্রন্টের মনোণীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় সভা করে নির্বাচনী প্রচারনা চালান। এ নির্বাচনে মুসলিমলীগ পরাজিত হয়।[৭০] কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অঙ্গ দলগুলোর অনৈক্য বিশৃঙ্খলার কারনে কিছু দিন পরে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। যার ফলে আইয়ুব খান পাস্তিানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জাকে জোরপূর্বক পদচুত্য করে ক্ষমতা দখল করেন। তখন বাদশা মিয়া (র) বার্ধক্য জনিত কারনে অসুস্থ হয়ে পড়লে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জনগনের প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকার গঠনের আবেদন জানান।[৭১] তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা সত্বেও তিনি প্রার্থী হননি। বহু সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বে ও ইংরেজ সরকারের কোন পদ বা স্বার্থ গ্রহন করেননি। তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের রাজনীতিকে পছন্দ করতেন না। বাদশা মিয়া (র) যখন দেশের জনগনকে সাথে নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তখন ইংরেজ সরকার তাকে বশীভূত করার জন্য নানা রকম স্বার্থের প্রলোভন দেখায়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯২১ খ্রিঃ ১৩২৮ সনের ২ শ্রাবণ ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশক্রমে তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার প্রধান ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক আবু আলী চৌধুরী বাদশা মিয়া (র) কে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোল হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন।[৭২] বাদশা মিয়া (র) তখন তাঁর অনুরোধের উত্তরে বলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করা দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার ও কর্তব্য। তখন বাদশা মিয়া (র) কে বশে আনার জন্য আট বিঘা লাখেরাজ ও কয়েকজন মেজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়ার কথা ব্যক্ত করেন। বাদশা মিয়া (র) কে আরো প্রলোভন দেওয়া হয় যে তাঁর বাড়ীর সামনে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের কোর্ট বসানো হবে এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ উপাধীতে ভূষিত করা হবে। তিনি তার উত্তরে বলেন, ধন সম্পদ ও পার্থিব জগতের সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধ্বংসকারী জালেম ইংরেজ সরকারের প্রভুত্ব করার সুযোগদান করা কাপুরুষের কাজ। তিনি আরো বলিলেন, "আমি কাপুরুষ নহি কাপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহন করিনি। আমার পূর্ব পুরুষগন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম করে ইংরেজদের কঠিন শাস্তি ভোগ করেছেন। আমি সেই জালেম শাহী তখন খতম করার জন্য জানমাল বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য নই"।[৭৩] ইংরেজ সরকারের প্রলোভন উপেক্ষা করে বাদশা মিয়া (র) ইংরেজদের বিরুদ্ধে তৎকালীন শহর, বন্দর ও পল্লী অঞ্চলে আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলেন। ১৩২৮ সনের ১২ ভাদ্র মোতাবেক ১৯২১ খ্রিঃ ২৮ আগস্ট রবিবার মাদারীপুর শহরের কালী বাড়ী মাঠে জনসভায় বাদশা মিয়া (র) বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা কালে মাদারীপুরের এস,ডি,ও পুলিশ বাহিনী দ্বারা উক্ত সভা ভঙ্গ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[৭৪] ২৮ আগস্ট মাদারীপুর জনসভা করার পরে ২ সেপ্টেম্বের ১৯২১ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার খেলাফত কমিটি কংগ্রেস সদস্য বৃন্দের প্রচেষ্টায় বরিশাল শহরের বি,এম, হাইস্কুল প্রাঙ্গনে স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। খেলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠার নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আজাদ ছোবাহানী, কংগ্রেস নেতা মহাত্বা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তি ঢাকা হতে বরিশালের জনসভায় যোগদান করেন। কমিটির অনুরোধে বাদশা মিয়া (র) সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

বক্তাগন ইংরেজদের শোষননীতি, নাগরিকদের চরিত্রহীন করার জন্য ষরযন্ত্রের নীতিসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাদশা মিয়া (র) বিদেশী বিলাতী পোষাক দ্রব্য ব্যবহার বর্জন করার কথা ঘোষনা করেন। আর এখান থেকেই বিলাতী পোষাক দ্রব্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাদশা মিয়া (র) সেই দিন থেকে বিদেশী বিলাতী পোষাক ও দ্রব্য বর্জন করে দেশী খদ্দের কাপড় ব্যবহার শুরু করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আর কোন দিন বিদেশী পোষাক পরিধান করেননি। ঐ সভা শেষে সাধারন মানুষ বিদেশী বিলাতী মাল ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করার প্রচার শুরু করেন। এমনকি সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে অনেকে তাদের পরিধেয় বিজাতীয় পোষাক আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। মাল পত্র নদীতে ফেলে দেয় এবং ইংরেজদের তিরস্কার করতে থাকে।[৭৬] ১৯২১ খ্রিঃ ৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বাদশা মিয়া (র) বরিশালের সভা শেষে গোসাইর হাট থানার নাগের পাড়ায় সভার জন্য অবস্থান কালে মাদারীপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার সেখানে গিয়ে বাদশা মিয়াকে বন্দী করে মাদারীপুর নিয়ে আসেন। তাঁর বন্দীর সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরার পর চর্তুদিক হতে অগনিত লোক শ্লোগান দিয়ে মাদারীপুর পুলিশ সুপারের ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেতে থাকে। বাদশা মিয়া (র) উপস্থিত সকলকে আন্দোলনের স্বার্থে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বললেন। রাত্রে পীর সাহেবকে এস,ডি,ও এর বাসায় আহবান করলে বাদশা মিয়া বলেন, "আমি আপনার অতিথি নই আপনার খাদ্য খাইব কেন? জেল খানার খাদ্যই আমার জন্য যথেষ্ঠ" ।[৭৭]

এর পর তাকে আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। তিনি তা অস্বীকার করার ফলে মাদারীপুর জেলখানা হতে রাত্র ৩ টার সময় ফরিদপুর জেলখানায় তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। ফরিদপুর যাওয়ার সময় পথিমধ্যে জেলা ম্যজিস্ট্রেটের নিকট বাদশা মিয়াকে নতি স্বীকার করতে বলা হয়। তিনি তাদের দাবী প্রত্যাখান করেন। ফলে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে পাঠানোর সময় শত শত লোক রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তখন বাদশা মিয়া (র) সকলকে আন্দোলন জোরদার করতে বলেন এবং মহাকবি ইকবালের একটি বাণী বলেন- "ইসলাম জিন্দা হোতা হেয় হার কারবালাকা বাদ"।[৭৮] বাদশা মিয়া (র) এর গ্রেপ্তারের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে খেলাফত কমিটির নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও কংগ্রেসের নেতা দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফরিদপুর আগমন করে বাদশা মিযার জামিনের আবেদন করেন। কিন্তু তাদের আবেদনে কোন ফল হয়নি। চারদিক হতে শত শত লোক ফরিদপুর শহরে একত্রিত হয়ে ইংরেজদের ওপর উত্তেজিত হতে থাকে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও চিত্তরঞ্জন দাস জনগনের উত্তেজিত অবস্থা দেখে ফরিদপুর টাউনে এক সভা করে জনগনকে শান্ত করেন।[৭৯] ১৯ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলা ম্যজিস্ট্রেটের কোর্টে বিচারের তারিখ ধার্য্য করা হয়। কলকাতা হতে মাওলানা আহামদ আলী, ব্যরিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস, তদিয় পত্নী জে,এল ব্যানার্জী, শ্যাম সুন্দর ব্যানার্জী ও হেমন্ত চন্দ্র দাস গুপ্ত কোর্টে হাজির হযে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস ও অন্যান্য উকিল তার পক্ষে আরগুমেন্ট করতে চাইলেন। বাদশা মিয়া (র) বললেন, আমি কোর্টে সত্য কথা বলব বিচারে যা হয় তাই মেনে নিব এতে উকিলের প্রয়োজন কি ? বিচার শুরু হলে কোর্টে ম্যজিস্ট্রেট বরিশাল ও মাদারীপুর জনসভায় রাজবিদ্রোহীদের বক্তৃতা পাঠ করে শুনালেন এবং এ সত্যতা জিজ্ঞাসা করলেন। বাদশা মিয়া (র) উহা স্বীকার করলেন।[৮০] ম্যজিস্টেট বাদশা মিয়াকে প্রশ্ন করলেন আপনি স্বাধীনতা সমন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন উহা আইন বিরোধী নয় কি? বাদশা মিযা (র) বললেন আমি অন্যায় ভাবে কোন বক্তৃতা করিনি বরং জনগনের ন্যায্য অধিকারের জন্য এরূপ বক্তৃতা করেছি। আপনি ভবিষ্যতে রাজবিরোধী কোন বতৃতা করতে পারবেন না। এ ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে আপনাকে ছাড়া যেতে পারে। উত্তরে বাদশা মিয়া (র) বললেন, আমি এরূপ কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজি নই।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যজিস্ট্রেট বললেন আপনার অপরাধ স্বীকার করবেন কি? উত্তরে বাদশা মিয়া (র) বললেন কখনো না। ম্যজিস্ট্রেট বললেন পঁচিশ হাজার টাকার দুইজন জামিনদার দিতে পারবেন কি ? বাদশা মিয়া (র) উত্তরে বললেন আমার দ্বারা সম্ভব নয় । পূনরায় ম্যজিস্ট্রেট বললেন, তবে পঁচিশ হাজার টাকার মুছলিকা দিতে পারবেন কি ? বাদশা মিয়া (র) বললেন তাও আমার দ্বারা সম্ভব নয়।[৮১] বাদশা মিয়া (র) ও ম্যজিস্ট্রেটের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথোনের শেষে বাদশা মিয়ার কোন প্রকার নমনীয়া না দেখে বাদশা মিয়া (র) কে এক বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন।[৮২] বাদশা মিয়া (র) কারাগারে যাওয়ার পরে খেলাফত, কংগ্রেস এবং অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব শুরু করেন। ইংরেজরা আন্দোলনকে ছত্র ভঙ্গ করার জন্য অনেককে রাজবিদ্রোহী হিসেবে বন্দী করে কারাগারে প্রেরন করেন। কালকিনি থানার ভাদরী গ্রামের নিবাসী মাওলানা খলিলুর রহমান কারাগারে বাদশা মিয়া (র) এর সঙ্গী হওয়ার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুমুল প্রচার ও সভা করেন। ফলে তাকে বন্দী করে কারাগারে প্রেরণ করা হলে এর কিছুদিন পর মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা আবুল বারাকাত, আব্দুর রউফ দানাপুরী, নোয়াখালীর আব্দুর রশীদ খান, কুষ্টিয়ার মুহাম্মদ শামসুদ্দিন আহামদ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও চাঁন মিয়া সহ আরও অনেকে একের পর এক আলীপুর সেন্ট্রাল কারাগারে রাজবিদ্রোহী কয়েদি হিসেবে বন্দী হতে থাকেন। ফলে জেলখানা আন্দোলনের পরামর্শ কেন্দ্রে পরিনত হয়। ইংরেজগন রাজবিদ্রোহী কয়েদিদের দ্বারা কঠোর কাজ কারানোর প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে তাদেরকে কঠোর পরিশ্রমের কাজ হতে অব্যহতি দিতে বাধ্য হয়।[৮৩]

১৩২৯ সনের ৩০ শ্রাবন মোতাবেক ১৯২২ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশা মিয়া (র) কারাগার হতে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়ে কলকাতার খেলাফত অফিসে যান এবং আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারন করে ১৩২৯ সনের ৮ ভাদ্র মোতাবেক ১৯২২ খ্রিঃ ২৫ আগস্ট শুক্রবার বাদশা মিয়া (র) মুক্তির উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে শত শত লোক ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে কলকাতার হলিডে পার্কে সমবেত হয়। বাদশা মিয়া (র) এ সভায় সবাইকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানান।[৮৪] ১৮ ভাদ্র ২৬ আগস্ট শনিবার বাদশা মিয়া (র) কলকাতা হতে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে অবশেষে ২৭ আগস্ট ফরিদপুর এসে খেলাফত কমিটি ও অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছা সেবকদের সাথে সাক্ষাত করেন। পরদিন বিকালে বাদশ মিয়া (র) ফরিদপুরের যুবলী পুকুর মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করে ইংরেজদের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।[৮৫] অতঃপর ফরিদপুর হতে নারায়নগঞ্জ হয়ে ঢাকায় আসেন। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সফর করে ৭ সেপ্টেম্বর পিতামহ মোহসেনউদ্দীন আহমদ দুদু মিয়ার মাজার জিয়ারত করে নিজ গৃহে মিলিত হন। [৮৬] তিনি কারা মুক্তির পরে সকলকে দেশী বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা করার জন্য চরকা নির্মান করে সুতার তৈরী কাপড় বুনিয়ে কাপড়ের অভাব দূর করেন। কিছু সংখ্যক লোক লবন প্রস্তুত করে বিলাতী লবন বর্জন করেন। তিনি দিনের পর দিন মাসের পর মাস ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা করেন। যে সকল স্থানে তিনি সভা করেন তা হলো ১৬ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলার সদর টাউন, ২৮ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর কলকাতা হলিডে পার্ক। ১৯২৩ খ্রিঃ ২১ ডিসেম্বর নোয়াখালীর টাউন হল। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত স্থানে সভা সমিতি করেছেন তন্মধ্যে বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার ফরিদপুর, শিবচর, চান্দেরচর, ভাঙ্গা, পালং, ভোজেশ্বর, নাগেরপাড়া, কালকিনি, আওরডাঙ্গা, কোটালিপাড়া, ডামুড্যা। বৃহত্তর বরিশাল জিলার বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, গলাচিপা, গৌরনদী, গৈলা, বাটাজোর, মাহিলারা, উজিরপুর, ঝালকাঠি, বাবুর হাট, বৃহত্তর কুমিল্লা জিলার চাঁদপুর, মতলব, ফরিদগঞ্জ, চৌমুহনী, দৌলতগঞ্জ। এছাড়া ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, মোমেনশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানের সভাগুলো উল্লেখযোগ্য।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশদের শাসনের শেষ দিকে কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এতে বিহারে ১৪ জন মুসলমানকে হত্যার জন্য বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। এ দাঙ্গায় ২৫/৩০ হাজার মুসলমান প্রাণ হারায়। অনেক মুসলমান অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করে। বাদশা মিয়া (র) বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেন।[৮৮] কলকাতা, ঢাকা, নোয়াখালী ও বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমগ্র ভারতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাদশা মিয়া (র) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য ঘোষনা করেন যে, সাম্প্রদায়িক বিবাদ করা হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান সকল জাতির জন্য ধর্মীয় বিধান পরিপন্থী। একের অপরাধে অপরকে হত্যা করা মহাপাপ।

১৯৩২ খ্রিঃ ৪ মে ঢাকার জেলার রেকাবী বাজারে এক হিন্দু ব্যক্তি বাদশা মিয়াকে কটাক্ষ করে কথা বলার কারনে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে তুমূল সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাদশা মিয়া (র) উক্ত সম্ভাবনাময় সংঘর্ষের সমাধান করেন। [৮৯] পাকিস্তান স্বাধীনতার জন্য বাদশা মিয়া (র) খেলাফত আন্দোলন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে কারাগার বরন করেন। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে বিরোধ হলে বাদশা মিয়া (র) কয়েকবার আপোষ মিমংসার চেষ্ঠা করেন। কিন্তু তারা একমত হতে পারেন নি। ১৯৪৬ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে মুসলীম লীগ লাহোর অধিবেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে মুসলীম লীগ পাকিস্তান ইস্যুর উপর নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সকল মুসলমানদের সকল দ্বন্দ ভুলে ঐক্যের ভিত্তিতে মুসলীম লীগকে সমর্থন করার আহবান জানান। তখন বাদশা মিয়া সকল মুসলমানদের মুসলীম লীগের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আহবান জানান ও বিভিন্ন এলাকায় সভা করে মুসলীম লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার করেন। অবশেষে মুসলীম লীগ ঐ নির্বাচনে বিজয়ী হয় এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গনভোটে অগ্রনী ভূমিকা রাখেন।[৯০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ১৩৫৪ সনের ৮ চৈত্র মোতাবেক ১৯৪৮ খ্রিঃ ২১ মার্চ রবিবার পাকিস্তানের প্রথম গর্ভনর জেনারেল কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার রমনা পার্কের এক সমাবেশে উপস্থিত হন। উক্ত সমাবেশে বাদশা মিয়াকে আমন্ত্রন করা হয়। ২৩ মার্চ গর্ভণর হাউজে ত্রিপাটিতে পীর বাদশা মিয়া আমন্ত্রিত হলে উক্ত সমাবেশে যোগদান করে কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সাথে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর ২৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের চীপ সেক্রেটারীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রন করলে বাদশা মিয়া (র) কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাকে এক জেল পবিত্র কোরআন শরীফ উপহার স্বরূপ দেন।[৯১] কায়দে আযম পবিত্র কোরআন হাতে নিয়ে বাদশা মিয়ার সাথে পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার ব্যপারে আলোচনা করেন। কায়দে আযম জিন্নাহ্ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বাদশা মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের আদর্শ ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) রেখে গেছেন। অর্থাৎ কোরআন সুন্নাহ্ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। বাদশা মিয়া (র) পাকিস্তান হতে মদ, জোয়া, সুদ, ঘুষ, বেশ্যা বৃত্তি প্রভৃতি হারাম কাজ বন্ধের দাবী জানান। কায়দে আযম জিন্নাহ্ এ সকল ইসলাম বিরোধী কার্যাকলাপ অতিশ্রীঘ্র বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাদশা মিয়ার দোয়া কামনা করেন।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল লতীফ (শরীফাবাদী), হযরত পীর বাদশা মিয়া (র), প্রকাশনা, শরীয়তীয়া লাইব্রেরী, গৌরনদী। ভাদ্র ১৩৯৯ বাং, পৃ, ১১ ও মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ই. ফা. বা. মে ১৯৯৩ ইং, পৃ, ১৫১ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, প্রগতি প্রকাশনী (১ম খন্ড) মে ১৯৮৮ ইং পৃ, ১৩

2. Md. Muin-Un-Din Ahmad Khan, History of the Faridi Movement, Islamic Foundation Bangladesh, October 1984, Page.203

৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ২১৪

৫. আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল লতীফ (শরীফাবাদী), হযরত পীর বাদশা মিয়া (র), প্রকাশনা, শরীয়তীয়া লাইব্রেরী, গৌরনদী। ভাদ্র ১৩৯৯ বাং, পৃ, ৯১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ১৩

৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮ ও মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ ইং, পৃ,১৫২

৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০

১০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ১৭

১১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫ প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮

১২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৪-৩৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫ ও মোঃ আবদুস সাত্তার,ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ ইং, পৃ, ১৫২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৬

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০ ও মোঃ আবদুস সাত্তার,ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৯৩ ইং, পৃ, ১৫২

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪২-৪৫ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ২০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫২ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৩ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২-৩৩

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮১ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

২০. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৪ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

২১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৫ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৬

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬

২৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ১৬ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ শে অগ্রহায়ন ১৩৬৬ বাং, দৈনিক আজাদ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯ ইং

২৭. আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল লতীফ (শরীফাবাদী), হযরত পীর বাদশা মিয়া (র) পৃ, ১৪২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৪
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৪
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৪ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ৩০
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯১ ও মোঃ আবদুস সাত্তার,ফরিদপুরে ইসলাম, পৃ, ১৫৬
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯২
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৯-১০০ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০০ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ২৬
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০১
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০২
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৩
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৩-১০৪ ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৫
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৬
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৬
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬-১০৭
৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৭
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৮-১০৯
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১০-১১১
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১১
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৪-১৫৬ ও জুলফিকার আহমদ কিসমতী, পৃ, ৩৩-৩৪
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৪৫
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৬ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৯ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪০ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪১ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২০
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪২ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২০
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২০ এবং মোঃ আবদুস সাত্তার,ফরিদপুরে ইসলাম, পৃ, ১৫৩
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৭ ও মোঃ আবদুস সাত্তার,ফরিদপুরে ইসলাম, পৃ, ১৫৫
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৮ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৮
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৮
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৯ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৯
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫০ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫১ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৮
৭২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা , পৃ, ১৭৫
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ৭৫ও মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম,পৃ, ১৫৪
৭৪. মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম,পৃ, ১৫৪-১৫৫
৭৫. আলহাজ্জ মাওলান আবদুল লতীফ (শরিফাবাদী), হযরত পীর বাদশা মিয়া (র), পৃ, ৫২
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৩
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৬
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৬
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৮
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৯
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬০
৮২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬১
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২
৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৩ ও আব্বাস আলী খাঁন, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১ম ও ২য় ভাগ), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন, ঢাকা। জুন ১৯৯৪ ইং, পৃ, ২০৬
৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৬ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৬
৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৬ ও প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৬
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮০
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৩
৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৫
৯০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৭
৯১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৮
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

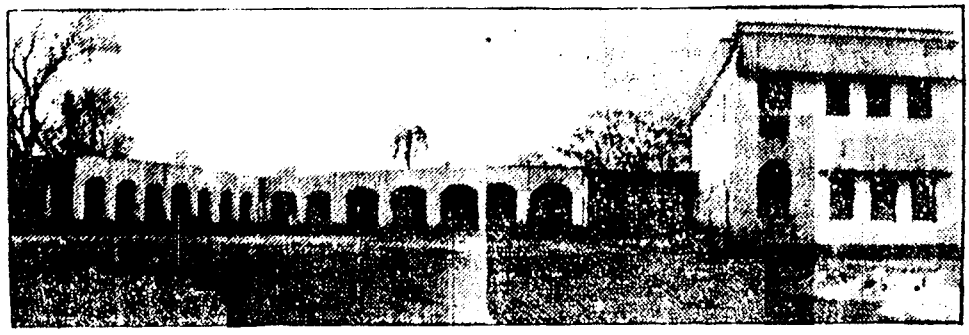

বাহাদুরপুর শরীঅতিয়া আলীয়া মাদরাসা।

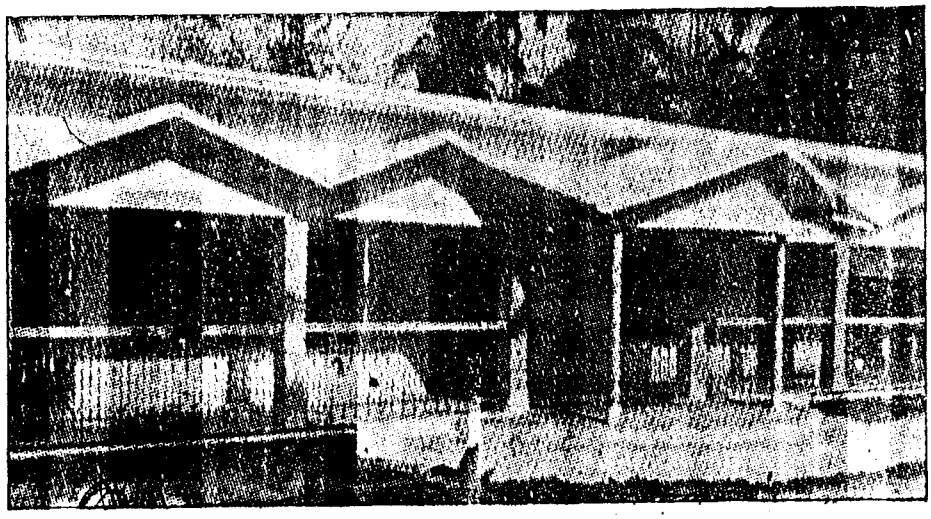

বাহাদুরপুর মঞ্জিল ও মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)

(১৮৯৫-১৯৬৯খ্রিস্টাব্দ)

যুগ যুগ ধরে দ্বীন প্রচারের জন্য বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ইন্তিকালের সাথে সাথে নবী রাসূলের ক্রমধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় উলামা মাশাইখ ও মুসলিম মুজাহিদদের উপর। বীর মুজাহিদ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। পরবর্তীতে ইংরেজরা এদেশের প্রচলিত মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয় এবং মুসলমানদেরকে কুফর, শিরক, বিদআত কার্যাবলী করতে বাধ্য করে। কেড়ে নেয় মুসলমানদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার-আচরন ও নৈতিকতা। যখন এদেশের জনসাধারন অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল ও মানুষের মনে শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই বিরাজ করছিল তখন জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় যুগের মহান ধর্মীয় সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর আগমন ঘটে। তিনি বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের মধ্য নবজাগরণ সৃষ্টি করেন। বহু ইসলামীক গ্রন্থ রচনা করে ইহুদী, খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করে ইসলামী শরীয়তের হুকুম আহকাম মুসলমানদের নিকট তুলে ধরেন। ক্ষমতা, অর্থ, মোহ্, হিংসা বিদ্ধেষের উর্দ্ধে থেকে নিষ্ঠা ও উদারতার পরিচয় দিয়ে তৎকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উলামা ও মাশাইখের স্থান দখল করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর পূর্ব পুরুষের আবাসস্থল ছিল আরবদেশ। তাঁর পূর্ব পুরুষ আউয়াল গাজী ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য এদেশে আগমন করে যশোর জেলায় বসতি স্থাপন করেন।[১] যশোর থেকে মাঝে মাঝে আউয়াল গাজী ফরিদপুর আগমন করতেন। আউয়াল গাজীর ইন্তিকালের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা চাঁদ গাজী পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দাওয়াতের কাজ করতে করতে এক সময় তিনি ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ সীমানা গাওহরডাঙ্গা এলাকায় এসে পিতার ভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পর সেখানে মাওলানা ইদরিস সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করে গাওহরডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাওলানা চাঁদ গাজীর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মাওলানা চেরাগ আলী গাজী দাওয়াতের কাজের সাথে সাথে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদী তৎপরতা শুরু করেন এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষন নিতে উৎসাহিত করেন। তৎকালীন সময় বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর (র) জেহাদী কাফেলার দাওয়াত যখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছে, তখন চাঁদ গাজী তাঁর শিষ্য-শাগরেদসহ ঐ কাফেলায় যোগ দেন এবং জেহাদী কার্যক্রম শুরু করেন। সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র) বালাকোটের ময়দানে শহীদ হলে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন।[২] মাওলানা চেরাগ আলী গাজীর ঔরসে মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন আলিম ছিলেন। তাই তাঁকে 'মুন্সি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ঔরসে মাওলানা শামছুল হক জন্ম গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক (র) ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার পাটগাতী ইউনিয়নের ঘোপেরডাঙ্গা নাকম গ্রামে বাংলা ১৩০২ সনের ২ ফাল্গুন ১৮৯৫ খ্রিঃ রোজ শুক্রবার সোবহি সাদিকের সময় জন্ম গ্রহন করেন। মাওলানা শামছুল হক (র) এর পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাতার নাম মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন।[৩] মাওলানা শামছুল হক (র) ফরিদপুর জেলায় জন্ম গ্রহন করেন বলে তাঁকে 'ফরিদপুরী' বলা হয়।[৪] মাওলানা শামছুল হক (র) যখন জন্মগ্রহন করেন, তখন বৃটিশ বেনিয়াদের অত্যাচার ও নির্যাতনে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এ অন্ধকার থেকে সমস্ত জাতিকে আলোর পথের সন্ধানের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন যুগ সংস্কারকের। তাই মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ পুত্রের নাম রাখেন শামছুল হক। অর্থাৎ 'সত্যের সূর্য'। ভবিষ্যতে এ মহা-পুরুষ পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে সমাজ থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূরিভূত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।[৫]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) যখন একটা দুটা করে কথা বলতে শুরু করেন তখন তাঁর মাতা আমিনা খাতুন তাকে পড়িয়ে দিলেন-"আল্লাহু ! আল্লাহু!! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। কিছুদিনের মধ্যেই শিশু শামছুল হক (র) আল্লাহ্ ! আল্লাহ্ !! বলা শিখে ফেললেন। এর কিছুদিন পর তিনি কালিমাও শিখে ফেললেন। এভাবে তিনি মায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করে চার বছর বয়সে আলিফ, বা এর পাঠ শুরু করেন। পিতা মাঝে মাঝে পুত্র শামছুল হক (র) কে কোলে নিয়ে চুমু খেতেন ও কালিমার তালিম দিতেন। এভাবে শুরু হয় শিশু শামছুল হক (র) এর প্রাথমিক শিক্ষা।[৬] মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় এমন সময় যখন পাক-ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজরা মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরাও ইংরেজী শিক্ষাকে বয়কট করেন। মুন্সি আব্দুল্লাহর ইচ্ছা ছিল পুত্রকে উচ্চ শিক্ষিত করে তোলা। তাই তিনি পুত্রকে সর্ব প্রথম বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাটগাতি টুঙ্গিপাড়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হিন্দু মন্ডপে জনৈক পন্ডিতের নিকট প্রেরণ করেন।[৭]

মাওলানা শামছুল হক (র) প্রখর ধীশক্তির বলে কিছু দিনের মধ্যে পন্ডিত বাবুর নিকট বর্ণমালা শিখে নিলেন। তিনি বর্ণমালা শিখার সাথে সাথে এর দ্বারা চিঠি লিখতে চেষ্টা করেন। কিছুদিনের মধ্যে মন্ডপের পড়া শেষ করে পাটগাতি প্রকাশ চন্দ্র সরকার এর কাছে টোলে পড়ার জন্য যান। অত্যন্ত স্মৃতিশক্তি গুনে টোলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সবগুলি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ চন্দ্র সরকার বাবুর নিকট সমাপ্ত করে টঙ্গীপাড়া ছোট শেখদের বাড়ি মুন্সী আজিজুল হক সাহেব ওরফে কালা মুন্সীর পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।[৮] এ সময় মুন্সী আসাদ আলীর নিকট কায়দায় বাগদাদী ও আমপারা অধ্যয়ন শেষ করেন। তিনি তৃতীয় শ্রেনী উর্ত্তীণ হয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার জন্য বরিশাল জেলার নাজিরপুর থানাধীন সুটিয়াকাঠি স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে লজিং থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে লেখা-পড়া শুরু করেন। তিনি চতুর্থ শ্রেনীতে অধ্যয়ন কালে মসজিদে নামায আদায়ের সময় নামাজের নিয়মাবলী ও জুমার খুৎবা শুনে শুনে মুখস্ত করে ফেলেন। তিনি আরবী পড়তে চাইলেও পিতার নিষেধাজ্ঞার কারণে আরবী শিক্ষা থেকে বিরত থাকেন। সুটিয়াকাঠিতে পড়া কালে কোরআন মাজীদ পড়ার প্রতি তারঁ আগ্রহ জেগে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি মাঝে মাঝে কোরআন মাজীদ চুমু খেতেন ও বুকে জড়িয়ে কাঁদতেন এবং ডুংকইর বাগানে নির্জনে কোরআনকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন। "হে ! আল্লাহ তোমার এই মহান কালামে পাককে বুঝতে দাও, জানতে দাও এবং ভালভাবে পড়ার সুযোগ দাও"। তিনি সুটিয়াকাঠি অবস্থান কালে আরবী পড়া শুরু করেছিলেন। শিন্তু একথা তাঁর পিতা জানতে পেরে পত্রের মাধ্যমে পুত্র শাছুল হককে আরবী পড়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। কেননা তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ জানতেন পুত্র শামছুল হক যদি আরবী পড়তে শুরু করে তবে তাঁর ভবিষ্যৎ ইচছা পূর্ণ হবে না এবং ইংরেজদের নির্যাতন জেল জুলুম হতে মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাই তিনি আরবী পড়া থেকে পুত্র শামছুল হক (র) কে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দেন।[৯] মাওলানা শামছুল (র) হক চতুর্থ শ্রেণী পাশ করে বরিশালের সুটিয়াকাঠি ত্যাগ করে নিজবাড়ীতে ফিরে আসেন। কয়েকদিন বাড়িতে অবস্থান করে কিছুদিন পরে গিমাডাঙ্গার স্কুলে শরীফ শামছুদ্দিন সাহেবের নিকট জ্যামিতি ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। এখানে অল্প দিনের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। শরীফ শামছুদ্দিন সাহেব গিমাডাঙ্গা হতে কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) এর পিতা মুন্সি আব্দুল্লাহ পুত্রের লেখা-পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন শরীফ শামছুদ্দীন সাহেব শামছুল হক (র) এর লেখা পড়ার জন্য যশোরের ভাগুটিয়া হাইস্কুলের কথা মুন্সী আব্দুল্লাহর নিকট উল্লেখ করেন। মুন্সি আব্দুল্লাহ শরীফ শামছুদ্দীন সাহেবের পরামর্শে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রকে শরীফ শামছুদ্দীনের সাথে যশোর প্রেরণ করেন। শরীফ শামছুদ্দীন তাকে নোয়াপাড়ায় ১৯১৪ খ্রিঃ ভাগুটিয়া স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি করে কলকাতা চলে যান। মাওলানা শামছুল হক (র) লজিং থেকে নিয়মিত ঐ স্কুলে লেখা পড়া করে ১৯১৪ খ্রিঃ ৫ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় স্কুলের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেন ।

উচ্চ শিক্ষা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ১৯১৫ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভাগুটিয়া স্কুল হতে ১ম স্থান অধিকার করে কৃতিত্ব অর্জন করেন।[১০] তিনি ভাগুটিয়া স্কুলে অধ্যয়ন কালে স্কুলের পড়া শেষ করে লজিং থেকে সাড়ে তিন মাইল দুরে মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেবের নিকট মিযান ও আরবী কিতাব পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যে মিযান কিতাব মুখস্ত করেন। পিতা যখন জানতে পাড়লেন শামছুল হক (র) আরবী শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। তখন তিনি মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম সাহেবের নিকট একটি চিঠি লিখে শামছুল হককে আরবী পড়ানো থেকে বিরত থাকতে বললেন। অপর দিকে পুত্রের নিকট এক চিঠিতে তিনি লিখেন।[১১]

শামছুল হক,

তোমাকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলছি, তুমি ভাল চাও তবে স্কুলের পড়া ভালভাবে পড়তে থাক অন্যথায় খরচতো পাবেই না, আর আমার এ আদেশ অমান্য করলে তোমাকে ত্যাজ্য করতে আমাকে বাধ্য করবে না । আমার ব্যাপারে তোমার জানা আছে যে, এহেন কাজ করতে আমি বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করবো না।[১২]

ইতি
তোমার পিতা
আব্দুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক (র) পিতার এ চিঠি পাওয়ার পর আরবী পড়া বন্ধ করে স্কুলের পড়ায় মনোযোগী হন। ১৯১৬ খ্রিঃ ফাইনাল পরীক্ষায় সমস্ত স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি স্কুলের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেও আরবী পড়ার জন্য পিতার সর্মথন পাননি।[১৩] অবশেষে পিতার হুঁশিয়ারী চিঠি ও মৌলভী ইসমাইল সাহেবের আরবী পড়ানোর অস্বীকৃতির কারণে মাওলানা শামছুল হক (র) কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন প্রথমে শরীফ শামছুদ্দীন সাহেবের বাসায় যাবেন। যদি তারঁ বাসা খুঁজে না পান তবে আরবী পড়া শুরু করবেন। তিনি ১৯১৭ খ্রিঃ কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে শরীফ শামছুদ্দীন সাহেবের সাক্ষাত পেলেন। তাঁর সহযোগীতায় কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন এইচ. এইচ. হালি। ১৯১৭ খ্রিঃ মাওলানা শামছুল হক (র) ৭ম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮ খ্রিঃ অষ্টম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।[১৪] এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে অধ্যয়নের সময় তিনি আরবী শেখার প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন। তাই তিনি কলকাতার বিভিন্ন আলেমের নিকট আরবী ভাষায় বিভিন্ন কিতাব পড়তে শুরু করেন। তিনি মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরীর নিকট ইলমে তিব্ববা চিকিৎসা বিদ্যা, মুরগীহাটা মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট ইলমে ফিক্‌হ ও শরহে বিকায়া পড়তে থাকেন।[১৫] তিনি উর্দু ভাষা শিখার ক্ষেত্রেও খুব ধীশক্তির পরিচয় দেন। তিনি প্রতিদিন খাবার খেতে যাওয়ার সময় একজন দোকানদারের নিকট কিছু সময় উর্দু পড়তেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উর্দু ভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হন। ১৯১৯ খ্রিঃ নবম শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯২০ খ্রিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা শুরু হওয়ার তিন মাস পূর্বে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) কলকাতার 'রেঙ্গুনে' আগমন করলে মাওলানা শামছুল হক (র) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া চেয়ে বলেন, "মুঝে দোয়া কি যেয়ে, কে খোদা ছীরাতে মুস্তাকীম পর কায়েম রাখ্যে"। তখন আশরাফ আলী থানভী (র) জিজ্ঞাসা করেন তুম কিয়া পড়তা হো ? মাওলানা শামছুল হক (র) উত্তরে বললেন - ইংরেজী। থানভী (র) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- তুম ইলমে দ্বীন কেউ নেহি পড়তে হো? তদোত্তরে মাওলানা শামছুল হক (র) বললেন - "মায় তো ইলমে দ্বীন পড়নে কে লিয়ে তৈয়ার হোঁ মগর মেরে ওলেদ নেহি দিতা হ্যয়"।[১৬]

অতপর মাওলানা শামছুল হক (র) যখন বের হয়ে আসছিলেন, তখন থানভী (র) লোকদের উদ্দেশ্যে দুঃখ করে বললেন- "হায় ! এইছে যামানা আয়া তু লারকা ইলমে দ্বীন পড়নে কে লিয়ে তৈয়ার হোঁ মগর ওলেদ নেহি দেতা হ্যয়"। আফসোস এমন যমানা এসেছে ছেলে ইলমে দ্বীন পড়তে চাচ্ছে কিন্তু পিতা দিচেছনা। তার একথা শুনে মাওলানা শামছুল হক (র) মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাকী তিন মাস কোন বই পড়বেন না এবং পরীক্ষার হলে এক ঘন্টার বেশী উত্তর লিখবেন না। এভাবে পরীক্ষায় ফেল করলে তাঁর পিতা আর তাঁকে ইংরেজী পড়াবেন না।[১৭] তাই তিনি স্কুলের পড়া বন্ধ করে উর্দু, আরবী ও আশরাফ আলী থানভী (র) লিখিত বিভিন্ন বই পড়তে শুরু করলেন। বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও তিনি পরীক্ষার জন্য কোন বই পড়তেন না। পরীক্ষার হলে মাএ এক ঘন্টা উত্তর লিখে প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাপ্ত করে উর্দু পড়তে লাগলেন এবং চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে আরবী পড়ার জন্য দেওবন্দ যাওয়া যায়। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায় যে, পরীক্ষায় মাওলানা শামছুল হক(র) ৫টি বিষয় লেটার মার্কসহ স্কলারশীপ পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এ ফলাফলে সন্তষ্ট হতে পারেননি, কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষায় ফেল করা ও আরবী পড়া। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর পিতার কঠোর নির্দেশে ১৯২১ খ্রিঃ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাশ শুরু করেন। কলেজের গতানুগতিক ক্লাশ তাঁর মনোপুত না হওয়া সত্বেও তিনি কলেজের ক্লাশ চালিয়ে যেতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ খ্রিঃ যুক্ত বাংলার প্রধান শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সভায় বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। উপস্থিত লোকজন বলাবলি করছিল আমরা আজ কিভাবে আসরের নামায আদায করব। এ অবস্থায় শামছুল হক (র) দাঁড়িয়ে বললেন "It is the time of prayer, please let us now pray to Allah the Almighty" সাথে সাথে আলোচনা বন্ধ রেখে এ, কে ফজলুল হক নামায আদায়ের সময় দেন। সভা শেষে কেউ কেউ রাগান্বিত হয়ে শামছুল হক (র) কে 'মোল্লা' 'মোল্লা' বলে গালি দিতে লাগল। এ গালি তাঁর কানে যাওয়ার সাথে সাথে ভাবলেন যে নামাযের জন্য বলে সে মোল্লা হয়। ঠিক আছে আমি জীবনে অবশ্যই মোল্লা হবো।[১৮]

অতঃপর ১৯২১খ্রিঃ বাংলার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক পুরুষ আচার্য্য জাগদীশ চন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্পন করেন। অধ্যক্ষের অনুরোধে তিনি একটি ক্লাশ নেন। শামছুল হক (র) ঐ ক্লাশে যোগদান করেন। জগদীশ চন্দ্র বসু ক্লাশে দুই ভাগ অক্সিজেন এবং এক ভাগ হাইড্রোজেন দ্বারা পানি তৈরী করে দেখালেন এবং বললেন দেখ, আমি যে একতোলা পানি তৈরী করলাম এতে প্রায় দশ টাকা খরচ হয়েছে অথচ এ পানি খাবারের উপযুক্ত নয়। আমরা দৈনিক কোটি কোটি গ্যালন পানি খরচ করে চলছি তার কোন হিসেব নেই। তবে তোমরা জেনে রাখ পার্থিব জগতে দৃশ্য যা কিছু রয়েছে তা এমনিই সৃষ্টি হয়নি এর পিছনে রয়েছে এক মহাশক্তি। অতএব তোমরা জানিও "Everything has a maker. The maker of the Earth and the sky is god. He is a great creator. He created all things in the Earth and the Heavens"।[১৯]

তিনি আরও বলেন যে, আমরা শুধু স্রষ্টার সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করে তা হতে কিছু বাহির করতে সক্ষম হই। কিন্তু অসীমকে সসীম চিন্তা ধারায় তাঁর নিগুঢ় তত্ত্ব বের করতে সক্ষম নই। এ বক্তৃতা শোনার পরে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আরো জেগে উঠে। ১৯২১ খ্রিঃ গান্ধীজীর Non Co-Operation Movement (অসহযোগ আন্দোলন) এর কারণে সকল স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি ভাবলেন এ সুযোগে আরবী পড়বেন। তাই তিনি বাড়ি এসে পিতা-মাতাকে দেওবন্দে আরবী পড়ার কথা জানালেন। এবারও তাঁর পিতা তাকে আরবী পড়ার অনুমতি দিতে আপত্তি করলেন। তিনি বললেন! শামছুল হককে ইংরেজী পড়তেই হবে। তবে সে যদি আরবী পড়তে চায়, তাহলে কলকাতায় গিয়ে পড়ুক। পিতার এ কথা শুনে তিনি কলকাতা চলে যান এবং পিতার অনুমতি ব্যতীত দেওবন্দে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। দেওবন্দে যাওয়ার পূর্বে তিনি পিতার নিকট একটি পত্র লিখেন।[২০]

দেওবন্দের পথে
১৯২২ ইং
(১লা রজব)

মাননীয় আব্বাজান,

পত্রে আন্তরিক সালাম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিজড়িত কদমবুচি গ্রহন করিবেন। আঁশা করি করুনাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। আমি দেওবন্দ যাচ্ছি। আমার জন্য আন্তরিক ভাবে দোয়া করবেন, যেন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতে পারি। আপনি আমাকে আরবী পড়ার জন্য কোন টাকা পয়সা না দেন, তাতে আমি দুঃখ পাবনা। শুধু আপনার খেদমতে একান্ত অনুরোধ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আপনি আমার জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না। আল্লাহ যেন আমাকে কামিয়াব করেন, আমি যেন জীবনে সাফল্য মন্ডিত হয়ে ফিরতে পারি। এই দোয়াই শুধু আপনার খেদমতে চাই। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার যাতে মঙ্গল হয় করুণাময়ের দরবারে এ দোয়াটুকু অবশ্যই করতে ভুলবেন না। আপনি দোয়া করলেই আমি সবচেয়ে বেশী খুশি

Dhaka University Institutional Repository

হব। আমি আমার উদ্দেশ্য সফল না করে দেশে ফিরব না। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানাবেন ও দোয়া করতে বলবেন। ভুল ত্রুটি ও বেয়াদবী মার্জনা করবেন।[২১]

ইতি দোয়াপ্রার্থী আপনার পুত্র
শামছুল হক ।

পিতার নিকট এ পত্র পাঠিয়ে মাওলানা শামছুল হক (র) দেওবন্দ চলে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন দেওবন্দ মাদ্‌রাসা বন্ধ। তাই তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর দরবারে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি আশরাফ আলী থানভী (র) কে একটি পত্র লিখেন।[২২] পত্রের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

দেওবন্দ মাদ্‌রাসা হতে
৫ ই রজব
(১৯২২খ্রিঃ)

শ্রদ্ধেয় হুজুর,

রিক্তের সালাম ও শ্রদ্ধা গ্রহন করুন। আশা করি খোদার রহমতে ভালই আছেন। প্রত্যেক মানুষের চলার পথে একজন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। আর আমি আপনাকেই আমার জীবন পথের একমাত্র মুরব্বী এবং সহায়ক বলে নির্বাচন করেছি। আশা করি আমি আপনার অনুমতি থেকে বঞ্চিত হব না। আমি আরো আশা করি এখন থেকে আপনার খেদমতে কিছুদিন অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।[২৩]

ইতি
আপনার একান্ত বাধ্যগত
খাদেম নাচিজ
শামছুল হক

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) পত্র পাওয়া মাত্র মাওলানা শামছুল হক (র) কে অনুমতি পত্র পাঠালেন। মাওলানা শামছুল হক (র) পত্র পাওয়া মাত্র ১৫ই রজব দেবন্দ হতে থানা ভবনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর সাহচর্যে চলে আসেন। এখানে ২ মাস ২০ দিন অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয় গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অবশেষে থানভী (র) এর পরামর্শে সাহারানপুর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়ন করে উর্দু, ফার্সী, আরবী ভাষায় পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, আকাইদ, বালাগাত, মানতিক, হিকমত ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করে ১৯২৬ খ্রিঃ জামাতে উলা প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯২৬ খ্রিঃ ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আরবী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন।[২৪] সেখানে দাওরায়ে হাদীস জমআতে ভর্তি হন। তখন সেখানে দাওরায়ে হাদীস জমআতে সিহাহ সিত্তাহ বা হাদিসের ছয় খানা কিতাব এক বছর পড়ানো হতো। কিন্ত মাওলানা শামছুল হক (র) সিহাহ সিত্তার কিতাব দুই বছরে অধ্যয়ন করেন। তিনি সেখানে শাইখুল আদিব মাওলানা এজাজ আলী (র) (মৃ.) যিনি দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও হায়দারাবাদ হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর নিকটে হিদায়া আখেরাইন (দ্বিতীয় ভাগ) পড়েন। এ ছাড়া দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) (মৃ.),

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র) (মৃ.) সহ অনেকের নিকট কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করে ১৯২৮ খ্রিঃ দাওরায়ে হাদীসে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে 'মাওলানা' উপাধি লাভ করেন। এছাড়া দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ইলমে তীব বা চিকিৎসা শাস্ত্রেও অধ্যয়ন করেন। দেওবন্দে অধ্যয়ন কালে ক্বারী আব্দুল অহীদ (মৃ.) সাহেবের নিকট হাফসের রেওয়ায়েত শেষ করে ক্বিরাতে সাবার সাত ক্বিরাতের সনদ লাভ করেন। ১৯২৮ খ্রিঃ তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[২৫]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাঠ গ্রহন করেন ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর নিকট। তিনি ১৯২২ খ্রিঃ যখন দেওবন্দ পড়ার উদ্দেশ্যে যান। সেখান থেকে ১৫ রজব থানা ভবনে থানভী (র) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইলমে মারিফত তথা আধ্যাত্মিক পাঠ গ্রহন করেন। কিন্তু যে কোন আলিমের জন্য থানভী (র) এর বায়য়াত গ্রহনের জন্য ৮/১০ বছর সময়ের প্রয়োজন হতো। কিন্তু থানভী (র) প্রথম বারেই মাওলানা শামছুল হক (র) কে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবক দেন। মাওলানা শামছুল হক (র) আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবক গ্রহন করে সেখানে ২ মাস ২০ দিন অবস্থান করেন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সকল বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেন। তিনি সাহারানপুরে অধ্যয়ন কালে ৩১২ বার থানভী (র) এর দরবারে গিয়ে ছিলেন। প্রতিবার ৩৫ মাইল পায়ে হেঁটে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর জীবনে ২২টি চিল্লা দিয়ে থানভীর দরবারে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।[২৬] শামছুল হক ফরিদপুরী (র) বলতেন, "আমার শরীরে এমন কোন লোম কুপও বাকী নেই যেখানে থানভী (র) আধ্যাত্মিকতার ইনজেকশন ও অপারেশন করেননি"। হযরত থানভী (র) শামছুল হক ফরিদপুরীকে নিজের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত মনে করে বলতেন, "তুমি আমার অন্তরের সমস্ত কথা সারাদেশে প্রচার কর"। মাওলানা থানভী (র) ইন্তিকালের পূর্ব মূর্হুতে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তাঁকে ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না তখন থানভী (র) ভিতর থেকে বলেছিলেন, 'ঐ সূর্যকে আমার কাছে আসতে দাও তা না হলে আমার দরবার অন্ধকারে আচছন্ন করে ফেলবে'। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) থানভী (র) এর ইন্তিকালের পূর্বে একাধারে আড়াই মাস থানা ভবনে অবস্থান করে থানভী (র) এর ইন্তিকালের পর দেশে ফিরে আসেন। তিনি থানভী (র) ব্যতীত অন্যান্য উলামা মাশাইখের নিকট থেকেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।[২৭]

মাওলানা শামছুল হক (র) এর কতিপয় শিক্ষকগণের নামের তালিকা ঃ

১. মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ (মৃ.) ;
২. মুন্সি আরশাদ আলী (মৃ.) ;
৩. পূর্ণ চন্দ্র সরকার (মৃ.) ;
৪. মুন্সি আজিজুল হক ওরফে কালা মুন্সি (মৃ.) ;
৫. শরীফ শামছুদ্দিন (গিমাডাঙ্গা) (মৃ.) ;
৬. মাওলানা ইদ্‌রিস সাহেব (র) (মৃ.) ;
৭. মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব (মৃ.) (নোয়াপাড়া) ;
৮. মাওলানা আঃ রউফ দানাপুরি (মৃ.) (কলকাতা) ;
৯. মাওলানা আছাদুল্লাহ্ দানাপুরী (মৃ.) (সাহারানপুর) ;
১০. মাওলানা খলিল আহম্মদ (মৃ.) (সাহারানপুর) ;

Dhaka University Institutional Repository

১১. ক্বারী মাওলানা আব্দুল অহিদ (র) (মৃ.) (দেওবন্দ) ;
১২. শাইখুল আদিব মাওলানা এজাজ আলী (র) (মৃ.) (দেওবন্দ) ;[২৮]
১৩. শাইখুল হাদীস মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) (মৃ.) (দেওবন্দ) ;
১৪. শাইখুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহ্মদ মাদানী (র) (মৃ.) (দেওবন্দ) ;
১৫. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) (মৃ.) (থানাভবন) ;
১৬. মাওলানা সাব্বির আহমদ উসমানী (র) (মৃ.) (দেওবন্দ) ;
১৭. মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন (র) (মৃ.) ;[২৯]
১৮. মাওলানা যাকারিয়া (র) (মৃ.) ;
১৯. মুফাসীর মাওলানা ইদ্‌রিস কান্দলোভী (র) (মৃ.) ;
২০. মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী (র) (মৃ.) ;
২১. মাওলানা ইব্‌রাহীম (র) (মৃ.) ;
২২. মাওলানা বদর আলম (র) (মৃ.) ;
২৩. শাইখুল হাদীস মাওলানা জাফর আহ্মদ উসমানী (র) (মৃ.) ;
২৪. মাওলানা ইলিয়াস (র) (মৃ.) ;
২৫. ক্বারী মাওলানা তৈয়ব (র) (মৃ.) ;
২৬. মাওলানা আসাদুল্লা খাঁন (র) (মৃ.) ;
২৭. মাওলানা আঃ লতিফ (র) (মৃ.) ;
২৮. মাওলানা মুফতি কেফায়াতুল্লাহ্ (র) (মৃ.) ;
২৯. মাওলানা এসহাক আহমদ বর্দ্ধমানী (র) (মৃ.) ;
৩০. ছারছিনার মাওলানা নিছারউদ্দিন আহমদ (র) (মৃ.) ;
৩১. মাওলানা হাতিম আহমদ (র) (যশোর) (মৃ.) ;
৩২. ফুরফুরার মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিক (র) (মৃ.) ;
৩৩. পীর মুহাম্মদ শাহ্ ইরানী (র) (নোয়াপাড়া) (মৃ.)।[৩০]

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে মাওলানা শামছুল হক (র) বাংলা, ইংরেজী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) কে একমাত্র শায়েখ ও পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

খিলাফত ঃ

মানুষের মধ্যে দশটি দোষক্রটি বিদ্যমান। এ গুলো হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, মিথ্যা, পরনিন্দা, কৃপণতা, রিয়া ও মনোমালিন্য। মাওলানা শামছুল হক (র) নিজের মধ্য হতে এ সকল দোষক্রটি দূর করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরার পরও প্রতি বছর ৪০ দিন করে থানভী (র) এর দরবারে অবস্থান করতেন। এভাবে নিজেকে সংশোধনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উচচ স্তরে পৌঁছার পর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) একদিন মাওলানা শামছুল হক (র) কে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সাথে বলেছিলেন- "তু মেরি দিল কি বাত দুনিয়া মে ফায়লানা " অর্থাৎ তুমি আমার দিলের সমস্ত কথা ও কাজ দুনিয়ায় বিস্তার করো। একথার মাধ্যমেই মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) মাওলানা শামছুল হক (র) কে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পন করেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক (র)-এর প্রখ্যাত ছাত্র ও মুরীদ ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) এর মুরীদ করানোর ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তিনি যাকে মুরীদ বা শাগরেদ করতেন তাকে প্রথমে শপথ করায়ে নিতেন। যেন তাদের পীর মুরীদি ব্যাপারটি কারো কাছে প্রকাশ না হয়। তিনি বর্তমান পীর মুরীদের ন্যায় হাতে হাত রেখে বায়াত করাতেন না। তিনি যদি কাউকে বায়াত করতে চাইতেন তাকে একখানা বই দিতেন উক্ত বই পড়ে সে যদি বইয়ের নিয়মাবলী পালনকারী হতেন তবে তাকে বইতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে মুরীদ করাতেন। তাঁর মুরীদ, ছাত্র ও খলিফাদের সংখ্যা ছিল অগনিত। তবে ১৯৬৫ খ্রিঃ যুদ্ধের সময় তাঁর একটি ইসতেহারে তিনি লিখেছেন, "আমার সাত লক্ষ মুরীদ, ছাত্র ও দেশবাসী যেন জেহাদের প্রস্তুতি নেয়"। এ উক্তি থেকে বুঝা যায় তিনি অসংখ্য মুরীদ, ছাত্র ও খলিফা রেখে গেছেন। নিম্নে তাঁর কতিপয় ছাত্র ও খলিফার নাম উল্লেখ করা হলো।[৩২]

ছাত্রদের নাম ঃ

১. মরহুম মাওলানা হেদায়তুল্লাহ্, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল লালবাগ মাদ্‌রাসা।
২. মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ (র), সাবেক প্রিন্সিপ্যাল গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসা।
৩. শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ঢাকা জামেয়া রহমানিয়া মাদ্‌রাসা।
৪. মাওলানা মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ঢাকা লালবাগ মাদ্‌রাসা ।
৫. মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসা ।
৬. মরহুম মাওলানা মমতাজ উদ্দিন সাহেব, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল সাত কাছেমিয়া মাদ্‌রাসা।[৩৩]
৭. মরহুম মাওলানা তাহের উদ্দীন সাহেব।
৮. মরহুম মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা।
৯. মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল বাহিরদিয়া মাদ্‌রাসা ফরিদপুর ।
১০.মাওলানা হোসাইন আহ্‌মদ সাহেব, সাবেক ইমাম কোর্টমসজিদ গোপালগঞ্জ।
১১. মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব (উদয়পুর)।
১২. মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাহেব (খতিবে বাংগাল)।[৩৪]
১৩. মরহুম মওলানা আব্দুল মজিদ সাহেব (ঢাকা)।
১৪. মরহুম মাওলানা ছালাহ্‌উদ্দীন সাহেব (তাবলীগ)।
১৫. মরহুম মাওলানা আলী আকবর সাহেব (তাবীলগ)।
১৬. মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব (তাবলীগ)।
১৭. হাফেজ মাওলানা জোবায়ের (তাবলীগ)।
১৮. মাওলানা জমিরউদ্দীন (তাবলীগ)।
১৯. ক্বারী মাওলানা আঃ ওহাব (নূরানী প্রশিক্ষক)।
২০. ক্বারী মাওলানা আব্দুল মালেক (নূরানী প্রশিক্ষক)।
২১. ক্বারী মাওলানা বেলায়েত (নাদিয়া, নূরানী প্রশিক্ষক)।
২২.মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রিন্সিপ্যাল, মিরপুর, ঢাকা দারুর বাশাদ মাদ্‌রাসা।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক (র) এর উল্লেখযোগ্য খলিফাগন ঃ

১. মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ (র), সাবেক প্রিন্সিপ্যাল গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসা।
২. মরহুম মাওলানা আব্দুল আজিজ (র), সাবেক প্রিন্সিপ্যাল বাহিরদিয়া মাদ্‌রাসা।
৩. মাওলানা খলিলুর রহমান (মাদারীপুর)
৪. মাওলানা আনোয়ারুল হক (মাদারীপুর)
৫. মরহুম মাওলানা মোমতাজউদ্দীন প্রতিষ্ঠাতা সাত কাছেমিয়া মাদ্‌রাসা।
৬. হাফেজ মাওলানা জামিল আহমদ (উদয়পুর)
৭. মাওলানা হোসাইন আহমদ, সাবেক ইমাম গোপালগঞ্জ কোর্ট মসজিদ।
৮. মাওলানা নূর মোহাম্মদ, বড়নাল কালিয়া, যশোর।
৯. মাওলানা আশরাফ আলী, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল বাহিরদিয়া মাদ্‌রাসা।
১০. মাওলানা কাজী আব্দুল মান্নান, খাদেমুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক।
১১. মাওলানা আব্দুর আউয়াল, প্রিন্সিপ্যাল, ঢাকা দারুল উলুম খিলগাঁও মাদ্‌রাসা।[৩৬]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ১৯২৮ খ্রিঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ইউনুছিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর পিতা-মাতা তাঁকে বিবাহের জন্য জোর তাগিদ দেন। বিভিন্ন স্থান হতে বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। সকলের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে পিরোজপুর মহকুমার নাজিরপুর থানাধীন ডুমুরিয়া গ্রামের জনাব রাহাত আলী মোল্লা সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তারই গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম গ্রহন করেন। ছেলে হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওমর যিনি খাদেমুল ইসলামের আমীর। কন্যা বেগম রাশিদা খাতুন, জামাতা আলহাজ আব্দুল হামিদ। মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রথম স্ত্রীর ইন্তিকালের কারণে পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। উক্ত স্ত্রীর গর্ভে এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম গ্রহন করেন। ছেলে মাওলানা মুহাম্মদ রূহুল আমীন যিনি বর্তমানে খানকায় এমদাদিয়া ও মাদ্‌রাসার নাজেম। দুই কণ্যা মোসাম্মৎ মফিদা খাতুন জামাতা মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব, গাওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ। অপর কণ্যা মোসাম্মৎ বিলকিস খাতুন জামাতা এ্যাডভোকেট মোসলেম উদ্দীন। মাওলানা শামছুল হক (র) এর দ্বিতীয় স্ত্রী বর্তমানে জীবিত আছেন।[৩৭]

ইবাদত বন্দেগী ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) শৈশবকাল হতে ইবাদত বন্দেগীর প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন হতেই জামাতে নামায আদায় করতেন। তিনি রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী এবং জিকির-আজকার করে রাত্র অতিবাহিত করতেন। সকলে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করতেন। তিনি সাহারানপুর মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে প্রতি বৃহস্পতিবার সাহারনপুর হতে থানা ভবনে আশরাফ আলী থানভী (র) এর দরবারে ৩৫ মাইল পায়ে হেঁটে রাত্রি যাপন করতেন ও শুক্রবার জুমার নামায আদায় করে সাহারানপুর ফিরে আসতেন। এভাবে দীর্ঘ চার বছরে ৩১২ বার যাতায়াত করে ইবাদতে কামালিয়াত লাভ করেন। তিনি রাত্রে জাগ্রত থেকে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। তিনি সর্বদা ফজরের নামায শেষে কোরআন তিলাওয়াত ও কিতাব লিখায় মগ্ন থাকতেন।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ পালন ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) জীবনে পাঁচ বার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। তিনি সর্বপ্রথম হজ্জ পালন করেন ১৯৫৪ খ্রিঃ এবং দ্বিতীয় বার হজ্জ পালন করেন ১৯৫৫ খ্রিঃ।[৩৯]

ছদর সাহেব উপাধি লাভ ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ১৯৫৫ খ্রিঃ দ্বিতীয় বার মক্কায় হজ্জ পালন কালে সকল মাজহাবের আলিমদের মাঝে আরবীতে দরস দিতেছিলেন এবং বিভিন্ন মাসআলার সমস্যার সমাধান দিতেছিলেন। উলামাদের দরসের এ সংবাদ সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশা আব্দুল আজিজ অবগত হয়ে উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। অনেক উলামা এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। কিন্তু বাদশা আব্দুল আজিজ তাদের নিকট থেকে কোন সন্তো-ষজনক উত্তর পেলেন না। অবশেষে মাওলানা শামছুল হক (র) কোরআন হাদীসের আলোকে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। বাদশা আব্দুল আজিজ তাঁর বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন "আনতা ছদরুল উলামা, আনতা ছদরুল উলামা" অর্থাৎ 'আপনি আলিমদের বক্ষ', 'আপনি আলিমদের বক্ষ'। এর পর থেকে তাকে 'ছদর সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪০]

ইন্তিকাল ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থ্যতার কারণে ১৯৬৮ খ্রিঃ ঢাকার জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসা হতে বিদায় নিয়ে নিজ গ্রাম গওহরডাঙ্গায় চলে যান। শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগদান বন্ধ করে দেন। অবশেষে ১৯৬৯ খ্রিঃ ২১ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩৭৫ সলের ৭ মাঘ হিজরী ১৩৮৮ সনের ৬ জিলকদ্ব রোজ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ২.৩০ মিনিটের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার সকাল ১০ টায় নামাযে জানাযা শেষে গাওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার হিফজখানার দক্ষিণ পার্শ্বে ও মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৪১]

সামাজিক কর্ম ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্য কর্মের সাথে সাথে সামাজিক কর্মেও যথেষ্ঠ ভুমিকা রাখেন। তিনি যেখানে সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন দেখেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা লেখনীর মাধ্যমে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ১৯৬১/৬২ খ্রিঃ খৃষ্টান মিশনারী, ৰিভিন্ন এন.জি.ওর মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য সেবার প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে আকৃষ্ট করার পায়তারা চালালে মাওলানা শামছুল হক (র) খৃষ্টান মিশনারীর বিরুদ্ধে ১. পাদ্রীদের গোমর ফাঁক ২. আল্লাহ্‌র প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায় ? ৩. শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাক ৪. চারি ইঞ্জিল ইত্যাদি বই লিখে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যকে নৎস্যাত করেন। ফলে ১৯৬৩ খ্রিঃ খৃষ্টানরা তাদের মিশনারীর কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হন।[৪২] ১৯৬১ খ্রিঃ ১ মে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করেন। যা কোরআন হাদীসের আইন বহির্ভূত। এ সময় মাওলানা শামছুল হক (র) মার্শাল 'ল' চলা সত্যেও মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রতিবাদ করেন এবং মুসলমানদেরকে এর কুফল সম্বন্ধে ধারনা দেওয়ার জন্য 'ইসলামী পরিবার পরিকল্পনা' ও 'পরিবার পরিকল্পনার ফতোয়া' নামে দুটি বই লিখে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সময় ঈদের চাঁদ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আইয়ুব খাঁন পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে একই দিনে চাঁদ না দেখা সত্যেও পরের দিন ঈদের ঘোষনা দেন। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) গর্ভনর হাউসে আইয়ুব খাঁনের সাথে দেখা করে উভয় অঞ্চলের জন্য একই দিনে ঈদ করা জায়েয হবেনা বলে জানান। কিন্তু আইয়ুব খাঁন ৩০ রমযান ঈদের ঘোষনা দেন। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ৩০ রমযান রোজা রাখতে বলেন এবং ঈদগাহে যেতে নিষেধ করেন। ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ব্যতীত কেহ ঈদগাহে যায়নি। এ অবস্থা দেখে আইয়ুব খাঁন পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের ৩০ তারিখের রোজাকে কাযা করার নির্দেশ দেন।[৪৪] এভাবে মাওলানা শামছুল হক (র) অসংখ্য সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছেন এবং অন্যায়কে প্রতিহত করেছেন।

ধর্মীয় কর্ম ঃ

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলে কলকাতার হায়দারাবাদ আদালতের পক্ষ হতে প্রধান বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব আসে। তিনি এ প্রস্তাব ত্যাগ করে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে দ্বীনের খেদমত করার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ঠিক তখনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুছিয়ার মুহতামিম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার মোহতামিমের নিকট একজন সুযোগ্য শায়খুল হাদীস চেয়ে পত্র পাঠান। তিনি মাওলানা শামছুল হক (র) কে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে তাকে ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি পাঁচ বৎসর অবস্থান করে মাদ্‌রাসাকে দাওরায় হাদীসে পরিণত করেন। যা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাদ্‌রাসা হিসাবে উন্নীত করেন। সেখানে তাঁর সহযোগী হিসেবে ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজী হুজুর) ও মাওলানা আব্দুল ওহাব (র)।[৪৫]

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হতে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোরআন হাদীসের বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মাওলানা শামছুল হক (র) মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজী হুজুর ও মাওলানা আব্দুল ওহাব (র) সহ তিন জন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে খুলনা জেলার বাগেরহাটের কচুয়া থানার গাজালিয়া গ্রামে এসে এক নতুন মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৪৬] তিনজনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এক বৎসর পর মাদ্‌রাসা দাওরায় হাদীস(কামিল)পর্যন্ত চালু করেন। গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মোহতামিম (অধ্যক্ষ) মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) উক্ত মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন এবং এক বৎসরে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর মাওলানা শামছুল হক (র) ভাবলেন এ অজ পাড়া গাঁ থেকে দ্বীনের প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তাঁরা মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) কে মাদ্‌রাসার দায়িত্বভার দিয়ে তিন জন একত্রে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় নির্ধারিত কোন স্থান না থাকায় লোহারপুলের পূর্ব পার্শ্বের মসজিদে অবস্থান করে কিছু ছাত্রদের মসজিদের বারান্দায় কিতাব পড়ানো শুরু করেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর ঐস্থান থেকে বাদামতলী ষ্টীমার ঘাট মসজিদে ছাত্র শিক্ষক নিয়ে চলে আসেন।[৪৭] ঐ মসজিদে বসে কিছুদিন ছাত্রদের কিতাব পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন যেতে না যেতে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসুল্লিরা বিরক্তি বোধ করেন। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) বাদামতলীর মসজিদ ত্যাগ করে জিনজিরায় হাফেজ হুসাইন আহমদ সাহেবের বাড়ি জামে মসজিদে তাফসীর কার্যক্রম শুরু করেন। হাফেজ মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজী হুজুর) ইমামতির দায়িত্ব গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল ওহাব (র) এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। তৎকালীন সময় হাফেজ হুসাইন আহমদ সাহেব জিঞ্জিরার একজন ধনাঢ্য ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বড় কাটরার কেল্লার নিকটবর্তী যে কোন স্থানে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করা। অতঃপর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে হাফেজ হুসাইন আহমদ সাহেবের সহযোগীতায় মাওলানা শামছুল হক (র) বড় কাটরায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ও হোসাইন আহমদ সাহেবের নামের সাথে মিল করে এ মাদ্‌রাসার নাম করন করেন হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসা। মাদ্‌রাসার জন্য হাফেজ হুসাইন আহমদ সাহেব একটি দালান দান করেন। উক্ত দালানে তখন কিছু সংখ্যক জটাঁধারী ফকিরের আস্তানা ছিল। মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রচেষ্টায় তাদেরকে বের করে সেখানে মাদ্‌রাসার ক্লাশ শুরু করেন। এখানে ছাত্রদের দ্বীনি শিক্ষা দানের সাথে সাথে তাদের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের বিষয়েও গুরুত্ব দেন। যার কারণে অল্প দিনের মধ্যে মাদ্‌রাসার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন ছাত্রদের কিতাব শিক্ষা দানের সাথে সাথে কোরআনের প্রসার ঘটানোর জন্য মসজিদ ভিত্তিক ছাত্রদের দ্বারা কুরআনী মক্তব শুরু করেন। শহরের প্রত্যেক মহল্লায় কোরআনের তালিমের ব্যবস্থা করেন। শহর ছাড়া নরসিংদী, রাধাগঞ্জ, জামালপুর, তালতলা, আব্দুল্লাপুরসহ বিভিন্ন স্থানে কুরআনী মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন।[৪৮] তিনি হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসাকে দাওরা (কামিল) মাদ্‌রাসা স্তরে উন্নীত করে এ মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল করে দ্বীনি প্রচার ও মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখেন। একদা তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাহফিলে গেলে মাহফিল শেষে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁকে ৩০০ টাকা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি হাদিয়ার টাকা থেকে পথের খরচ বাবদ (১.৫০) দেড় টাকা গ্রহন করে বাকী টাকা দ্বারা সেখানে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটির লোকদের আহ্বান জানান। ফলে ঐ টাকার সাথে কিছু টাকা যুক্ত করে একটি মাদ্‌রাসা করার প্রস্তাব দেন। সবাই তাতে রাজি হন। ফলে মাওলানা হাফেজ মোহসেন সাহেবের পরিচালনায় সেখানে কিছু দিনের মধ্যে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৯]

মাওলানা শামছুল হক (র) নিজ গ্রামেও একটি মাদ্‌রাসা স্থাপনের সিদ্বান্ত গ্রহন করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্ব প্রথম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মক্তব আকারে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। নাজিরপুর থানার নিবাসী মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) কে মক্তবের মোহতামিম নিযুক্ত করা হয়। মাদ্‌রাসার নাম করণ করা হয "দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা"। কারণ এ মাদ্‌রাসার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের খেদমত করা। মাদ্‌রাসাটিকে কয়েক বছরের মধ্যে দাওরায়ে হাদীসে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি ৬টি বিভাগে বিভক্ত (ক) নাদিয়া নূরানী তরিকায় নাজেরা কোরআন শরীফ শিক্ষা বিভাগ। (খ) ইলমে ক্বিরাত বিভাগ (গ) হিফযুল কোরআন বিভাগ (ঘ) বাংলা মক্তব বিভাগ (ঙ) প্রথম জামায়াত হতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত কিতাব বিভাগ (চ) ফতোয়া বিভাগ। মাদ্‌রাসায় বর্তমানে ৫৯ জন শিক্ষক ১৮২১ জন ছাত্র রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসার বার্ষিক আয় হয় ৭৫,৪২,৫৪৫/- টাকা এবং ব্যায় হয় ৭৪,২২,৭০৮/- টাকা। উদ্বৃত থাকে ১,১৯,৮৩৭/- টাকা। মাদ্‌রাসা উন্নয়নের আয়ের উৎস হলো নগদ চাঁদা, মৌসুমী চাঁদা, জমির আয়, বাড়ি ভাড়া, পুকুরে মাছ চাষের আয় ও লিল্লাহ বর্ডিংয়ের আয়। মাদ্‌রাসায় ছাত্রদের পাঠদানের জন্য প্রথম জামায়াত হতে দাওরায় হাদীস পর্যন্ত বিভাগের জন্য ২০০ হাত লম্বা দ্বিতল বিল্ডিং, ক্বিরাত খানার জন্য ৬০ হাত লম্বা দ্বিতল দালান, ক্বিরাত খানার জন্য ১৫০ হাত লম্বা দ্বিতল দালান। মাদ্‌রাসায় খাদেমুল ইসলাম নামে একটি পোষ্ট অফিসও স্থাপন করেন। মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা শামছুল হক (র) মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) কে নিয়ে এ মাদ্‌রাসাকে কওমি মাদ্‌রাসার শিক্ষা বোর্ড "বিফাকুল মাদারেসে কওমিয়ার" সদর দফতরে পরিনত করেন। গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসাকে খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও যশোর এ চারটি জেলার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় জামিয়া এমদাদিয়া ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা উহার অস্থায়ী বোর্ড রাখা হয়। মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রচেষ্টায় এ বোর্ড গঠন করা হয়।[৫১] তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসা সম্পর্কে এলাকার লোকদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত করে যান। তিনি অছিয়তে সালামান্তে বলেন ঃ-

আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে আছি, সে জন্য আপনাদের সাক্ষাতে হাযির হতে পারিনি। আপনাদের নিকট আমার দাবি ও অছিয়ত এ বছর ভাল ফসল না হওয়ার কারণে আমাদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের ঈমানের অবস্থা যেন খারাপ না হয়। এ নাচিজ গুনাহগারের উছিলায় আপনারা "দারুল উলূম খাদিমুল ইসলাম" মাদ্‌রাসা রওশন করেছেন এবং রাসূলের এ বাগিচা আপনারা লাগিয়েছেন। আমি মরিব সব মানুষেরই মরিতে হবে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পরও আপনারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এ বাগিচাটি সর্বদা আবাদ রাখিতে আপ্রান চেষ্টা করিবেন। এ বাগিচা আপনাদের আখিরাতের সফরের সঙ্গী হবে। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করিতেছি। আপনারা ও আমার জন্য দোয়া করিবেন।[৫২]

নাচিজ
শামছুল হক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ঢাকা।
তাং-৬/৪/১৯৬৫ইং

মাওলানা শামছুল হক (র) আশরাফুল উলূম মাদ্‌রাসার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি বিভিন্ন স্তরে মাদ্‌রাসা স্থাপনের পরিকল্পণা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে লালবাগ কেল্লার মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি মাদ্‌রাসা করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন উক্ত মসজিদের ইমাম ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজী হুজুর। তাঁর নিকট মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করলে তিনি তাঁকে সহযোগিতার কথা জানান। ফলে ১৯৫০ খ্রিঃ, হিজরীর ১৩৭০ সালের শাওয়াল মাসে মাওলানা শামছুল হক (র) উক্ত মসজিদকে কেন্দ্র করে মাদ্‌রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। মাদ্‌রাসার নামকরণ করেন লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া। মাদ্‌রাসা খোলার প্রথম বছর থেকেই দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ক্লাশ শুরু করেন। মাওলানা শামছুল হক (র) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্‌রাসার সূচনা লগ্নে মাদ্‌রাসার ক্লাশ নেওয়ার জন্য কোন স্থান ছিলনা। তাই মসজিদের বারান্দায় ক্লাশ নেওয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৫ খ্রিঃ মাদ্‌রাসার ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। মসজিদের পূর্ব উত্তর পাশে জামায়াতের ছাত্রদের জন্য তিনতলা ভবন তৈরী করা হয়। বর্তমানে উহা পাঁচতলা করা হয়েছে এবং দক্ষিণ পাশে চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের প্রথম তলায় দোকান দ্বিতীয় তলায় দফতর খানা, তৃতীয় তলায় হিফজখানার ক্লাশ নেওয়া হয়। এ মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা দারুল উলূম দেওবন্দের অনুকরনে বিন্যাস করা হয়েছে। যার ফলে দেশের অসংখ্য আলেম পীর মাশাইখ, লেখক সাহিত্যিক ছাড়াও অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সীর, মুফ্‌তি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ মাদ্‌রাসায় বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যসূচী করে তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র ফিকহ্, উসূলে ফিকহ্ বাংলা সাহিত্য আধ্যাত্মি, তাজবিদ, ক্বিরাত, আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সূচনা হতেই মুসলমানদের ইসলামী সমস্যার সমাধানের জন্য ইফতা (ফতোয়া) বিভাগ খোলা হয় এবং এর মাধ্যমে ফিকহ্ শাস্ত্রে শত শত মুফতী তৈরী হয়। উক্ত মাদ্‌রাসায় হিফজ বিভাগ ও রয়েছে।[৫৩] লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসা ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে প্রাকৃতিক দুযোর্গ, বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়. টর্নেডোসহ যে কোন বালা মুসিবতে ছাত্র শিক্ষকগণ সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য-সহযোগীতা নিয়ে অসহায় মানুষের নিকট এগিয়ে আসেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ মাদ্‌রাসা বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর রাজনৈতিক জেহাদী ভূমিকার মূল উৎস এ মাদ্‌রাসা। এ মাদ্‌রাসার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দেলন গড়ে তোলেন। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসায় ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ জন শিক্ষক সংখ্যা ৬০ জন।[৫৪] মাওলানা শামছুল হক (র) এ মাদ্‌রাসা পরিচালনার সাথে সাথে ঢাকা শহরের ফরিদাবাদে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে "জামিয়া এমদাদিয়া আরাবিয়া" নামে অপর একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব অসেল মোল্লার জ্যৈষ্ঠপুত্র জনাব কবির মোল্লা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে বসবাস করেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফরিদাবাদে সাড়ে তিন বিঘা জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে উক্ত জমি মাওলানা শামছুল হক (র) কে দান করে দেন। মাওলানা শামছুল হক (র) উক্ত জমি নিজের জন্য গ্রহন না করে মাদ্‌রাসা করার শর্তে গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত স্থানে তাঁর ছাত্র মাওলানা বজলুর রহমানের মাধ্যমে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা শামছুল হক (র) জীবিত থাকা অবস্থা উক্ত মাদ্‌রাসা দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। তিনি মাদ্‌রাসা ছাড়া এখানে সাহিত্যক এবং সাংবাদিকদের জন্য তৈরী করেন "ইদারাতুল মারিফ" নামে একটি গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান।[৫৫] তিনি ফরিদপুরের খাবাসপুরে শামছুল উলূম মাদ্‌রাসা, খুলনায় খাদেমুল উলূম মাদ্‌রাসা ও দারুল উলূম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ সকল মাদ্‌রাসা ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় আড়াই শতাধিক মাদ্‌রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা কারেন।[৫৬]

সর্টকোর্স মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) সমাজের সকল মুসলমানদের কোরআন ও হাদীস শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের জন্য সর্টকোর্সে বিভিন্ন স্থানে মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বপ্রথম লালবাগ জামিয়ায় কোরআনিয়া মাদ্‌রাসায় এ কোর্স চালু করেন। পরবর্তীতে মাওলানা শামছুল হক (র) এর ছাত্র মাওলানা সালমান কর্তৃক এ পদ্ধতিতে মিরপুর ১১ নম্বরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে "দারুর রাশাদ" নামে একটি সর্টকোর্স মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫৭]

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গায় খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সেখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ১৫০ ফুট দৈর্ঘ ও ১০৫ ফুট প্রস্থ বর্গাকারে দ্বিতল পরিকল্পনা নিয়ে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে। মসজিদের কাজ সমাপ্ত হলে একত্রে বহু সংখক লোক এক জামায়াতে নামায আদায় করতে পারবে। তিনি উক্ত মসজিদ ছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত সেখানে সর্বপ্রথম তিনি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তখন ঐ জমির মালিক ছিলেন পাকিস্তানের কিছু সংখক ব্যবসায়ী তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঐ জমি ক্রয় করেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার ঐ জমিকে একোয়ার করে নেয়ার নোটিশ দেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীগণ মাওলানা শামছুল হক (র) এর নিকটে এসে তাঁর পরামর্শ চান। তাঁর পরামর্শে এক রাত্রে ঐ স্থানে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে সাইনবোর্ড লাগানো হয়। ফলে ঐ জমিতে সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি। তিনি নিজ বাড়িতে আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রান সংস্থা কর্তৃক ১৪১৪ হিজরী সনে "মসজিদে হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান" নামে এক মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ ছাড়াও তিনি সারাদেশে অগণিত মসজিদ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৫৮]

কোরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) জাতিকে সার্বিকভাবে ইসলামের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে তোলার জন্য একদিকে মাদ্‌রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং কোরআনী মক্তবের সাথে বাংলা, ইংরেজী, অংক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সাধারণ মানুষ যাতে মক্তবের শিক্ষার সাথে সাথে ছেলে-মেয়েদেরকে কোরআন ও আধুনিক শিক্ষা দিতে পারেন তাই তিনি স্বীয় ছাত্র ক্বারী মাওলানা বেলায়েত ও মাওলানা আব্দুল ওহাবের মাধ্যমে নূরানী ও নাদিয়া তরিকায় প্রশিক্ষণ চালু করেন। এপদ্ধতিতে প্রাইমারী স্তরের বাংলা, ইংরেজী, অংক শিক্ষা দেওয়া হত। এভাবে তিনি কোরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কোরআনের বাণী পৌঁছে দেন।[৫৯]

কোরআন তহবিল গঠন ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) বলতেন সমস্ত জাতি তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করেন। তাই তিনি কোরআন প্রচারের জন্য একটি তহবিল গঠন করেন। তিনি প্রত্যেক মুসমানের ঘরে ঘরে কোরআন তহবিল গঠনের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করেন। তিনি সকল মুসলমানকে টাকা প্রতি এক পয়সা হলেও কোরআনের খিদমতের জন্য ব্যয় করতে বলতেন।[৬০]

ইমাম সমিতি গঠন ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) সকল মসজিদের ইমামদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৬৬ খ্রিঃ খুলনা টাউন হল মসজিদে এক সম্মেলন করে "আয়েম্মায়ে মসজিদ" বা ইমাম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্মেলন সর্বপ্রথম খুলনা বিভাগের পাঁচটি জেলার ইমামদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। তিনি চাইতেন সমস্ত লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসৃত পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করুক। এ জন্যই তিনি ইমাম সমিতি গঠন করেন।[৬১]

তাবলীগ জামায়েতের সহযোগিতা ঃ

মাওলানা ইলিয়াস (র) কর্তৃক যে তাবলীগের কাজ সারা বিশ্ব জুরে শুরু হয়। মাওলানা শামছুল হক (র) উক্ত তাবলীগ জামায়াতকে পূর্ন সমর্থন করেন এবং তাবলীগের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মাওলানা ইউছুফ (র) যখন সর্বপ্রথম জামায়াত নিয়ে কলকাতায় আসেন তখন বাংলাদেশের তাবলীগের আমীর মাওলানা আব্দুল আজিজ (র)কে নিয়ে তিনি কলকাতায় যান এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান কররেন। মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) তিন চিল্লা দিয়ে আসলে তাঁর দ্বারা খুলনায় টুটপাড়া মসজিদকে মারকাজ (কেন্দ্র) করে তাবলীগের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) কে ঢাকায় এনে লালবাগ মসজিদকে কেন্দ্র করে ঢাকায় কাজ শুরু করেন। দিন দিন তাবলীগের কাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কাকরাই মসজিদকে মারকাজ করা হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সর্বপ্রথম রমনা পার্কে ইজতিমা করা হয়। মাওলানা শামছুল হক (র) উক্ত ইজতিমায় শরীক হন। এর পর থেকে লালবাগ মাদ্‌রাসার ছাত্ররা প্রতি বৃহস্প্রতিবার কাকরাইল অবস্থান করে শুক্রবার বিকালে ফিরে যেতেন। মাওলানা শামসুল হক (র) ছাত্রদের বলতেন তোমরা বাড়ী যাওয়ার পূর্বে কারাইল গিয়ে তিন দিন তাবলীগ জামায়াতের সাথে থাকবে। এভাবে তিনি ছাএদের তাবলীগের মাধ্যমে ধর্মীয় কাজ করার উৎসাহ দেন।[৬২]

খাদেমুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) ইসলামের খিদমতে অগণিত মাদ্‌রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠার পরে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো সকল মানুষের গৃহে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন "খাদেমুল ইসলাম" নামে একটি জামায়াত । এ জামাআত কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নাম নয়। এ জামাআতের মতে বিশ্ব মুসলিম একদল, এক জামায়াত, এক স্বার্থ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় কাজ করা। আর সমস্ত মানুষকে এ জামাআতে শরীক করার জন্য এর চল্লিশটি শাখা গঠন করেন। এ শাখা গুলো যেমন খাদেমুল ইসলাম সাধারণ পরিষদ, ছাত্র পরিষদ, কৃষক পরিষদ, শ্রমিক পরিষদ, ব্যবসায়িক পরিষদ, আইনজীবি পরিষদ ইত্যাদি। এ চল্লিশটি পরিষদের উদ্দেশ্য আল্লাহ ও রাসূলের তরীকায় জীবন গঠন করা। এ জামায়াতের কর্মীর সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী খাদেম।[৬৩]

এ সংগঠনের রূপরেখা মসজিদ সংগঠন, গ্রাম সংগঠন, ইউনিয়ন সংগঠন, থানা সংগঠন, জেলা সংগঠন, বিভাগ সংগঠন, প্রদেশ সংগঠন ও আলমী সংগঠন। ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। তাই এ সংগঠনের কর্মীদের শ্রেনী ও পাঁচটি, যথাঃ মুতায়াল্লেক, মুয়তামেদ, মুজাহিদ, মুবাল্লিগ ও খাদেম। সিলেবাস দুইশত কিতাব ও অন্যান্য আলিমের কিতাবাদি, যা পাঠ করে নিজে আমল করবে ও অপরকে আমল করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যার মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভ, স্রষ্ট্রার ইবাদত, সৃষ্টির খেদমত, ইসলামী সমাজ গঠন, পাশ্চাত্যের গোলামী খতম করে ইসলামী সমাজ কায়েম, ব্যবহার, নম্র আচরণ, ইকরাম, মুখে দাওয়াত অন্তরে যিকির, ব্যবহারে ক্ষমা, শ্লোগান আল্লাহু আকবর, বাতেলের মোকাবিলায় বজ্রের ন্যায় কঠোর, মোমিনের কাছে কুসুমের মত কোমল, চলার পথে আনুগত্য, গুন অর্জনে নম্রতা, ভদ্রতা শালীনতা, সহনশীলতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, কোরবানী পরমত সহিষ্ণুতা, চিন্তায় গভীরতা ও খেদমতে বিলীনতা ইত্যাদি।[৬৪]

খাদেমুল ইসলামের উদ্দেশ্য দশ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা (১) মসজিদ কেন্দ্রিক চার তরিকায় জামাত গঠন (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম (৩) কোরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা (৪) বয়স্ক মক্তব প্রতিষ্ঠা (৫) শিক্ষিতদের জন্য দ্বীনি দারুল মোতালায়া (৬) কোরআন ফান্ড প্রতিষ্ঠা (৭) ন্যায় বিচার কায়েম (৮) দাওয়াত, তেলাওয়াত, নামায ,যিকিরের মজলিস প্রতিষ্ঠা (৯) খেদমতে খালেক (১০) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।
উক্ত দশ দফা কর্মসূচী ছাড়া ব্যাক্তিগত দশদফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। (১) ঈমান ও ইয়াকীন দৃঢ় করা (২) আমলে সালেহ করা (৩) স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ঈমান আমল ঠিক করা (৪) স্ত্রী ও মেয়েদের জন্য খাস পর্দা করা (৫) প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করা (৬) মিষ্টি মধুর ব্যবহার করা (৭) পাড়া প্রতিবেশী সকলের খেদমত করা (৮) ঘরে কুরআন ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা (৯) সপ্তাহে মসজিদের কাজ করা (১০) সর্বদা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত থাকা।[৬৫] মাওলানা শামছুল হক (র) এ জামায়াতের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের উৎখাত করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

খেলাফত ও আজাদী আন্দোনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে সর্বপ্রথম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক অঙ্গনে মাওলানা শামছুল হক (র)এর পদচারনা ঘটে। ভারত বিভাগ প্রশ্নে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার প্রানকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার আলিমগণ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এক দল অখন্ড ভারতের সমর্থক ও অপর দল খন্ড ভারত তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সমর্থক ছিলেন। মাওলানা শামছুল হক (র) এর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগন উভয় দলে বিভক্ত ছিলেন।[৬৬] মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) উক্ত পরিস্থিতিতে খন্ড ভারত তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে সুদৃঢ় নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনিসহ তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় খন্ডের বিশিষ্ট মাওলানা পীর মাশাইখের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত উলামা কনফারেন্স করা হয়। যাতে মরহুম মাওলানা শাব্বির আহম্মদ উসমানীকে প্রধান করে খন্ড ভারত তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হলে তিনি উক্ত জমিয়াতে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করেন। মাওলনা আশরাফ আলী থানভী (র) এর নির্দেশে মাওলানা সাব্বির আহমদ (র) মাওলানা যাফর আহম্মদ উসমানি ১৯৪৬ খ্রিঃ হইতে ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের অখন্ডতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের বিভিন্ন সভা সমাবেশ করলে মাওলানা শামসুল হক (র) ও উক্ত সভায় তাদের সাথে অংশ গ্রহন করেন।[৬৭]

পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র রূপান্তরিত করার জন্য মাওলানা শামছুল হক (র) ১৯৪৮ খ্রিঃ লালবাগ শাহী মসজিদে চার দফা আদর্শ প্রস্তাবের সমর্থনে মাওলানা যাফর আহম্মদ উসমানীর সভাপতিত্বে সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারেও প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯৪৯ খ্রিঃ ১৪ মার্চ চার দফা ইসলামী মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য গণ পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হলে তখন পুর্ব পকিস্তানের অধিকাংশ উলামা এর বিপক্ষে লিখিত প্রস্তাব দেন। তখন মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) উভয় প্রদেশের সদস্যদের নিয়ে এক সভা আহবান করেন। চার দফা মূলনীতির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করেন। ফলে এর পক্ষে ভোট দেন। এ সময় মাওলানা শামছুল হক (র) ১৫ ফেব্রয়ারী হইতে ১৪ মার্চ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ মূলনীতির পক্ষে কাজ করেন। ১৯৫০ খ্রিঃ তৎকালীন পকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ইসলামী আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি ঘোষনা করেন এবং সরকারি ভাবে যাকাত আদায় করার সিদ্বান্ত নেন। জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম এ আইনের বিরোধিতা করেন। লিয়াকত আলী খান পশ্চিম পাকিস্তনে এর সমর্থন না পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমিনের সহায়তায় ১৯৫০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে উক্ত আইনের সমর্থনে ময়মনসিংহে মুসলিম লীগের সম্মেন আহবান করেন।[৬৮] মাওলানা মামছুল হক (র) এ সভার বিরুদ্ধে পোষ্টারিং ও হ্যান্ডবিল বিলি করে প্রচার চালান ফলে অবস্থা সুবিধা জনক না দেখে সম্মেলন বাদ দিয়ে ঢাকায় চলে এসে পল্টন ময়দানে এক সভা আহবান করে এ আইন প্রত্যাহার করেন। লিয়াকত আলী খান যখন যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেন তখন সিদ্বান্ত নিলেন উলামাদের ঐক্য ভঙ্গ করতে হবে। তবেই যে কোন সিদ্বান্ত গ্রহন করা সহজ হবে। এ দিকে ১৯৫১ খ্রিঃ ২১ জানুয়ারি হইতে ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত করাচীতে চার দিন ব্যাপি সর্ব দলিয় উলামা সম্মেলন ডেকে সর্বসম্মতি ক্রমে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য ২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব পেশ করেন। মাওলানা শামছুল হক (র) এ সম্মেলনে বলেন, এদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাসনতন্ত্র চলবেনা। ২২ দফা প্রস্তাব পাশের পূর্বে ৩১ সদস্যের একটি উলামা দল উহাতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত সদস্য দল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাকে অবহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাওলানা শামছুল হক (র) কায়দে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (র) এর আকস্মিক ইন্তিকালের কারণে উক্ত ২২ দফা প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি।[৬৯] অতঃপর ১৯৫৪ খ্রিঃ সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন দেওয়া হয়। উক্ত নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্য তিনটি পার্টি একত্রিত হয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। মুসলিমলীগের কিছু নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী মাওলানা ভাষানী প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৫৪ খ্রিঃ গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় কৃষক শ্রমিক পার্টি। মাওলানা আতাহার আলী নেতৃত্বে গঠিত হয় নিজামে ইসলাম পার্টি। এ সকল পার্টির মূল উদ্দেশ্য এক ছিল না। একমাত্র নিজামে ইসলাম পার্টি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষ পাতী ছিলেন। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ পার্টি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। যার কারণে অন্য তিন পার্টি একত্রিত হয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করেন। মাওলানা আতাহার আলী এ, কে, ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের কথায় জমিয়াতে উলামায় ইসলামকে ভেঙ্গে ছিলেন। অথচ যারা মুসলিম লীগের মধ্য হতে ২২ দফার বিরোধীতা করেন তারাই নতুন পার্টি গঠন করেন। কিন্তু মাওলানা শামছুল হক (র) মাওলানা দীন মুহাম্মদ খান, ছারছিনার পীর সাহেব মাওলানা নিছারউদ্দীন (র), মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র) প্রমূখ উলামাদের নিয়ে জমিয়াতে উললামায় ইসলামকে ধরে রাখেন।[৭০] ১৯৫৪ খ্রিঃ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্তু পরবর্তীতে এসরকার ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৫৫ খ্রিঃ পরবর্তীতে আতাউর রহমান খাঁনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এ সময় আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশনে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের ভিত্তিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বাদ দেওয়া হয় এবং ইসলাম ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়। মাওলানা শামছুল হক (র) এ রির্পোটের প্রতিবাদ করে আতাউর রহমান খাঁনের বাড়ির সমূখে রাস্তায় জনসভা করে এর প্রতিবাদ করেন এবং এ রির্পোটের বিরুদ্ধে বই লিখে সকল মুসলমানদেরও এর কুফল অবগত করান। তখন সারা দেশে এর প্রতিবাদ শুরু হলে আতাউর রহমান খাঁন এ রির্পোট রহিত করেন।[৭১]

লিয়াকত আলী খানের নিহত হওয়ার পরে খাজা নাজিম উদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হন এবং গোলাম মুহাম্মাদ গর্ভণর জেনারেল হয়ে গণ পরিষদ বাতিল করেন। কিছু দিন পরে ইস্কান্দার মির্জা গভর্রনর জেনারেল হন। এ ধরনের রাজনৈতিক রদ বদলের কারণে ১৯৫৮ খ্রিঃ আইয়ুব খাঁন মার্শাল 'ল' জারী করে ক্ষমতায় বসেন। আইয়ুব খানঁ ক্ষমতায় এসে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সময় জারিকৃত ইসলামী শাসনতন্ত্র বিধানকে রহিত করে নতুন শাসনতন্ত্র আইন জারী করেন।[৭২] ১৯৬১ খ্রিঃ কোরআন হাদীসের আইন বিরোধী পারিবারিক আইন পাশ করেন। এ আইনে উল্লেখ করা হয়। ১.স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তিন তালাকে এক তালাক হবে। ২.তালাকের ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়। ৩.মৃত ব্যক্তির পিতা বেঁচে থাকলে পৌত্রকে পিতামহের সম্পত্তির অংশীদার করা হবে। মাওলানা শামছুল হক (র) আইয়ুব খাঁনের এ আইনের বিরুদ্ধে দেশে সামরিক শাসন জারী থাকা সত্ত্বেও কঠোর প্রতিবাদ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যেগে সাতখানা পুস্তক ও ফতোয়া লিখে জন সাধারনের মধ্যে বিতরন করেন। সরকারকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে এ আইন বাতিল করতে বলেন। সারা দেশে প্রচন্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ফলে এ আইনের অর্ডিন্যান্স সাময়িক ভাবে মুলতবী করেন। বিভাগীয় কমিশনার মাওলানা শামছুল হক (র) কে বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে ডেকে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলনের কারণ জানতে চান। তখন কমিশনারকে মাওলানা শামছুল হক (র) বলেন, আপনি কেন বারবার আমাকে ডাকছেন? কমিশনার বলেন, সকারের নির্দেশেই ডাকছি। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) বলেন, আমারও সরকার আছে তাঁর নির্দেশেই আমি কুরআন বিরোধী আইনের প্রতিবাদ করছি।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

একথা শুনে কমিশনার চুপ হয়ে যান। কিন্তু আইয়ুব খাঁন চুপ থাকেননি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আযম খানকে মাওলানা শামছুল হক (র) কে গ্রেফতারের হুকুম দেন। আযম খান তাঁকে গ্রেফতারের সাহস পাননি। কেননা তাঁকে গ্রেফতার করলে সারা দেশে এক বিপ্লব ঘটাতে পারে। তাই আইয়ুব খান তাঁকে গ্রেফতার করা হতে বিরত থাকেন। এ ঘটনার কিছু দিন পরে মাওলানা শামছুল হক (র) অসুস্থ হয়ে লাহোর হাসপাতালে ভর্তি হলে এ সুযোগে আইয়ুব খাঁন মাওলানা শামছুল হক (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় দশ লক্ষ টাকার একটি চেক প্রেরণ করেন। মাওলানা শামছূল হক (র) এ সংবাদ অবগত হয়ে উক্ত চেক প্রত্যাখ্যান করেন এবং আইয়ুব খাঁনকে লক্ষ্য করে বলেন, "টাকা দ্বারা গরু ছাগল কেনা যায় শামছুল হককে কেনা যায়না"। আমরা মুসলমান আল্লাহ্‌র হকুমের কাছে সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ সামান্য মনে করি। অতঃপর ১৯৬৬ খ্রিঃ আইয়ুব খান যখন দ্বিতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট নিবার্চনে প্রার্থী হন এবং নির্বাচনের পূর্ব মুহুর্তে পূর্ব পাকিস্তানের উলামাদের নিয়ে এক সভা আহবান করেন।[৭৪] সভায় মাওলানা শামছুল হক (র) কে দাওয়াত দেওয়া হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ (র), মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (র), মাওলানা আমিনুল ইহসান (র), ছারছিনার পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র) মাওলানা আতাহার আলী (র) মাওলানা আজিজুল হক (র) মাওলানা মুফতি মহিউদ্দিন (র) উপস্থিত হন।মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী মাওলানা শামছুল হক (র) কে উক্ত সভায় যেতে নিষেধ করেন। মাওলানা শামছুল হক (র) সকলের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সভায় উপস্থিত হন। সভায় আইয়ুব খান ভাষণে যখন বলেন, আমি বিগত দিনে ইসলামের অনেক খিদমত করেছি। ইসলাম শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতা মূলক করেছি। ইসলামী রির্চাস ইনিস্‌টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনারা যদি নির্বাচনে পূনরায় আমাকে নির্বাচিত করেন তবে ভবিষ্যতে ইসলামের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর ভূমিকা রাখব। এমন সময় মাওলানা শামছুল হক (র) দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি একজন ধোঁকাবাজ। তখন আইয়ূব খান বজ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, "আমি পাঠানের বাচ্চা পাঠান"। পাল্টা জবাবে মাওলানা শামছুল হক (র) বললেন, "আমি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান"।[৭৫]

উভয়ের মধ্যে অনেক বাক বিতর্কের পর আইয়ুব খান বললেন, আমি কিভাবে ধোঁকাবাজ হলাম বলুন, তখন মাওলানা শামসুল হক (র) অনেক গুলো উদাহরণ দিয়ে বললেন, আপনি অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন সত্য কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ করেননি। আপনি ইসলামী রিচার্স ইনিসটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য কিন্তু তার ডাইরেক্টর করেছেন একজন নাস্তিক ইসলাম বিকৃত কারী ডঃ ফজলুর রহমানকে। আপনি পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী একাডেমী করেছেন সত্য কিন্তু তার ডাইরেক্টর করেছেন ইসলাম সম্পর্কে বিকৃতকারী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে, কাজেই আপনি ধোকাবাজ নয় কি? আইয়ুব খান এ সকল কথা শোনার পর চুপ হয়ে যান এবং বলতে লাগলেন, শিক্ষামন্ত্রী এ,টি,এম মোস্তফাকে ডাক। মোনায়েম খানকে ডাক, মাওলানা কি বলেছে আমার বুঝে আসছেনা। তোমরা তাকে বুঝাও। অতঃপর আইয়ুব খান বক্তৃতা শেষ করেন। তখন কোন কোন মন্ত্রী মাওলানা শামছুল হককে রাগ দেখিয়ে বললেন, হুজুর আপনি প্রেসিডেন্টের সাথে কি শুরু করেছেন । তখন মাওলানা শামছুল হক (র) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে আসিনি, চুপ করো। এরূপ বাকবিতন্ডার ফলে তরিঘড়ি করে মোনাজাত শুরু করলে মাওলানা শামছুল হক (র) সভা থেকে বের হয়ে চলে আসেন।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ১৯৬৬ খ্রিঃ সৌদি বাদশা ফযসল রাবেতা আলমে ইসলামী সম্মেলনে মাওলানা শামছুল হক (র) কে দাওয়াত দেন। কিন্তু আইয়ুব খান তাকে পাসপোর্ট দেন নি। আইয়ুব খানের ধারনা মাওলানা শামছুল হক (র) উক্ত সম্মেলনে যোগদান করলে ইসলাম বিরোধী সকল কার্যকলাপ ফাঁস করে দিবেন। বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ থাকার ফলে মাওলানা শামছুল হক (র) শারীরিক অসুস্থ হয়ে পরেন। যার কারণে রাজনীতিতে পরবর্তীতে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯৬৮ খ্রিঃ নিজ গ্রাম গরহারডাঙ্গায় চলে যান।[৭৭]

সাহিত্য কর্ম ঃ

মাওলনা শামছুল হক (র) ইসলামী সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কলকাতায় অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে 'জেমানল ফেরদাউস' নামে একটি উর্দু কিতাব বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদ করে কিতাবের নাম রাখেন 'ফেরদাউসের পথে'।[৭৮] এ কিতাবই মাওলানা শাতছুল হক (র) প্রথম লিখিত কিতাব। এ কিতাব রচনার মাধ্যমেই তিনি লেখনীতে প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর এ অমূল্য লেখনীর ধারা নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যান। যখন তিনি অসুস্থতার কারণে নিজে নিজে লিখতে পারেননি তখন অন্যের দ্বারা লেখনির কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর লিখিত বিভিন্ন কিতাবের নামের তালিকা নিম্নরূপ।

তাসাওউফ বিষয়ক ঃ

১. তওবা নামা।
২. তাসাওউফ তত্ত্ব।
৩. কছদুচ্ছাবিল।
৪. ইসলাহে নফস।
৫. দোসরা সবক।
৬. আল্লাহ্‌র পরিচয়।
৭. প্রশ্নোত্তরে তাসাওউফ।
৮. তাসাওউফ কাহাকে বলে ?
৯. জীবনের পন ।
১০. পীরের পরিচয় মুরীদের কর্তব্য।
১১. আশরাফ নামা।[৭৯]

ইবাদত বিষয়ক ঃ

১২. ফজিলত।
১৩. আঠ রাকাত বা বিশ রাকাত।
১৪. নামাযের অর্থ।
১৫. খেদমতে খালক।
১৬. জিকিরের রোযার ফজিলত।
১৭. নামাযের ফজিলত।
১৮. দ্বীনিয়াত ও নামায শিক্ষা।
১৯. আমালে কোরআনী।[৮০]

Dhaka University Institutional Repository

আকাঈদ বিষয়ক ঃ

২০. ফুরউল ঈমান।[৮১]

তরজমা তাফসীর বিষয়ক ঃ

২১. হাক্কানী তাফসীর।
২২. সূরা ইয়াসিন পাঞ্জসূরা।
২৩. সূরা ফাতিহা পাঞ্জসূর।
২৪. সূরা ইয়াসিনের তাফসীর।
২৫. আমপারার তাফসীরসহ অনুবাদ।
২৬. পাঞ্জসূরার তাফসীর।
২৭. তাফসীরে আশরাফী।
২৮. কোরআনের তাজীম।[৮২]

হাদীস বিষয়ক ঃ

২৯. মিয়াতু হাদীস।
৩০. হাদীসে আরবাইন।
৩১. হাদীস রত্ন ভান্ডার বা শাসন পদ্ধতি শিক্ষা।
৩২. বাংলায় বোখারী শরীফ।[৮৩]

জিহাদ বিষায়ক ঃ

৩৩. জিহাদের আহবান।
৩৪. জিহাদের ফজিলত।
৩৫. যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য।[৮৪]

হজ্জ্ব বিষয়ক ঃ

৩৬. হজ্জ্বের ফজিলত।
৩৭. বিদায় হজ্জ্ব।
৩৮. হজ্জ্বের মাসায়েল।
৩৯. বিদায় হজ্জ্ব বিশ্ব মুসলমানের প্রতি রাসূল (স) এর বাণী।[৮৫]

ফিকাহ্ ও ফারায়েজ বিষয়ক ঃ

৪০. বেহেশ্‌ত জেওর।
৪১. বাংলা ফরায়েজ।
৪২. তেজারতের ফজিলত।
৪৩. জুমার খুৎবাহ্ আরবীতে কেন?
৪৪. আযান ইকামতের হাকীকক বা আল কাওলুল মাতিন।
৪৫. আদর্শ প্রস্তাব বা খুৎবায়ে ছদারত।
৪৬. তিন তালাক সমস্যা ও সমাধান।
৪৭. ঈদ, চাঁদ সমস্যা ও সমাধান।[৮৬]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ ঃ

৪৮. মুক্তির পথ।
৪৯. চরিত্র গঠন।
৫০. নামায শিক্ষা।
৫১. মুলাকাতে মকবুল।
৫২. সংক্ষেপে ইসলাম।
৫৩. ইলমের ফজিলত।
৫৪. কোরআনের তাজিম।
৫৫. সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী।
৫৬. জেমানুল ফিরদাউস।
৫৭. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।
৫৮. মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্বতি।
৫৯. প্রাথমিক আদর্শ শিক্ষা।
৬০. মোয়াল্লেম ট্রেনিং।
৬১. কুটির শিল্প ও ইসলাম।[৮৭]

ইসলাম প্রচার বিষয়ক ঃ

৬২. তাবলীগ বা ইসলাম।
৬৩. তাবলীগে দ্বীন।
৬৪. তালিমুদ্দিন।
৬৫. তাবলীগের ফজিলত।[৮৮]

মুয়ামেলা ও মুয়াশারাত বিষয়ক ঃ

৬৬. হালাল হারাম।
৬৭. সাফাইয়ে মুয়ামেলাত।[৮৯]

রাজনীতি বিষয়ক ঃ

৬৮. নেতার কর্তব্য।
৬৯. ভোটারের দায়িত্ব।
৭০. এই যামানায় ইসলামী নিজাম সম্ভব নয় কি?
৭১. ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ।[৯০]

সমাজ সংস্কারক বিষয়ক ঃ

৭২. মসজিদ।
৭৩. বিশ্ব কল্যান।
৭৪. মুক্তির পথ।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. জীবন্ত মসজিদ।
৭৬. জামাআতী জিন্দেগী।
৭৭. ইংরেজী পড়িবনা কেন?
৭৮. আদর্শ ইসলামী পরিচয়।
৭৯. খাদেমুল ইসলামের কর্মসূচী।
৮০. কন্যার বিবাহে পিতার উপহার।
৮১. শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন।
৮২. খাদেমুল ইসলাম জামাআতের পরিচয়।[৯১]

বাতিলের মোকাবেলা বিষয়ক ঃ

৮৩. শর্তাবলী।
৮৪. ভুল সংশোধন।
৮৫. পাদ্রীদের গোমর ফাঁক।
৮৬. অসৎ আলেম ও পীর।
৮৭. বেদায়াত ও ইজতেহাদ।
৮৮. বৃটিশ শাসনের বিষফল।
৮৯. শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাকা।
৯০. পবিত্র কোরআনের অপব্যখ্যা।
৯১. আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিন কোথায়?
৯২. শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের সমালোচনা।
৯৩. কোরআনের উপর হস্তক্ষেপ বরদাশত করা যাইবে না।
৯৪. তাফসীর নামে সত্যের অপলাপ।
৯৫. খেদমতে খালক বা দুস্থ মানবতার সেবা।
৯৬. চার ইঞ্জিল।[৯২]

দর্শন বিষয়ক ঃ

৯৭. তোহফা।
৯৮. মানুষের পরিচয়।
৯৯. হায়াতুল মুসলিমীন।
১০০.ধর্মের আসল উদ্দেশ্য।[৯৩]

ইতিহাস বিষয়ক ঃ

১০১. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ।[৯৪]

অর্থনীতি বিষয়ক ঃ

১০২. ইসলামের অর্থনীতি।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

মানব কল্যান বিষয়ক ঃ

১০৩. বিশ্ব কল্যান।
১০৪. জন্ম নিয়ন্ত্রন বা আযল।
১০৫. মা, বাপ ও সন্তানের হক।
১০৬. ইসলামী পরিবার পরিকল্পনা।
১০৭. জনসেবা।
১০৮. জনগণের কর্তব্য।
১০৯. মাতৃ জাতীয় মর্যাদা।
১১০. পরিবার পরিকল্পনার ফতোয়া।[৯৬]

অছিয়ত বিষয়ক ঃ

১১১. অছিয়ত নামা।[৯৭]

অন্যান্য বিষয়ক ঃ

১১২. ঘুর্নিঝড়ের কারণ কি?
১১৩. মানুষের পরিচয়।
১১৪. পতিত পাবন।
১১৫. আদর্শ প্রস্তাব।[৯৮]

পত্রিকা বিষয়ক ঃ

১১৬. নেয়ামত পত্রিকা।[৯৯]

মাওলানা শামছুল হক (র) তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রে যখনই কোন ধর্মীয় পংকিলতা, ধর্মের অপব্যাখ্যা, সামাজিক অবিচার, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি দেখেছেন তখনই তাঁর লেখনী বই আকারে গর্জে উঠে। প্রত্যেক মুসলমানকে ইলমে তাসাওউফের জ্ঞানে উদ্ধুদ্ধ করবা জন্য তাসাওউফ বিষয়র বহু পুস্তক লিখেন। সমাজের অবস্থা অবলোকন করে সমাজ সংস্কার বিষয় ও লিখেন, ইবাদত, আকাইদ, জিহাদ, রোজা, নামাজ, হজ্জ, ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলাম প্রচার, মানব কল্যান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় অবলোকন করে এ সকল বিষয়ে বহু পুস্তক লিখেন। তিনি খ্রিস্টান, ইহুদীদের কুচক্র থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকার জন্য সতর্কবাণী, পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, অসৎ আলেম ও পীর নামে বিভিন্ন পুস্তক লিখে খ্রিস্টানদের স্বার্থে কুঠার আঘাত হানেন।মাওলানা আকরাম খাঁন ১৯৬৩ খ্রিঃ 'তাফমিসরুল কোরআন' নামে এক খানা তাফসীর লেখেন। উক্ত তাফসীরে প্রকাশ্যে ৭ টি মোজেযাকে অস্বীকার করেছেন।[১০০]

মোজেযা গুলো হলো ঃ

১. হযরত মুসা (আ) জন্য সাগরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়নি, বরং ভাটার সময় পানি শুকিয়ে গিয়েছিল।
২. হযরত ঈসা (আ) বিনা পিতায় জন্ম গ্রহন করেননি, বরং তাঁর পিতা ছিলেন ইউসুফ নাজ্জার।
৩. হযরত মহাম্মদ (স) স্বশরীরে মেরাজে যাননি, বরং স্বপ্নে সব কিছু দেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. হযরত আদম (আ) কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়।
৫. হযরত আদম (আ) চিরস্থায়ী বেহেশত হতে বহিস্কৃত হননি, বরং তাঁকে দুনিয়ার কোন বাগান হতে বের করা হয়েছে।
৬. হযরত মুসা (আ) পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করে ১২টি প্রস্রবন বের করেননি, বরং পাহাড় হতে ১২টি প্রস্রবন বের করা হয়েছে।
৭. হযরত ঈসা (আ) কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠানো হয় নি, বরং তিনি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরন করেছেন।[১০১]

মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কোরআনে কিছু কিছু স্থানে অতিরঞ্জিত করেছেন। এসকল বিভিন্ন কারণে মওলানা শামছুল হক (র) ১৯৬৩ খ্রিঃ হইতে ১৯৬৮ খ্রিঃ পর্যন্ত কোরআন শরীফের প্রথম পারা হইতে আঠার পারা পর্যন্ত মোট ১৬৫০ পৃষ্ঠা তাফসীর লিখেন।[১০২] কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কারণে বাকী বার পারা কোরআন শরীফের তাফসীর লেখা সম্ভব হয়নি। তাফসীরে হাক্কানীর বিশেষত্ব হল বহু তাফসীরের বিষয় বস্তুকে একত্রিত করেন এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া। তিনি অনেক পুস্তক লিখেছেন কিন্তু কোন পুস্তকের স্বত্ব নিজে বা ছেলে মেয়ের জন্য রাখেননি। তিনি পুস্তক বিক্রয়ের অর্থ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করতেন। তিনি এ সমস্ত পুস্ত ক লিখে ইসলামী সাহিত্যে কৃতিত্বময় অবদান রাখেন।

উপদেশ বাণী ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) মুসলমানদের সৎপথের পথিক ও সত্যকে উপলব্দি করার জন্য নিম্ন লিখিত অছিয়ত করেন ঃ-

১. মাওলানা শামছুল হক (র) বলেন, আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাঁর সাথে কাউকে শরীক মনে করিনা।হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী তাঁর জীবনার্দশ ব্যতীত অন্যকোন জীবনার্দশ মানিনা। আখিরাত হিসাব-নিকাশ, বেহেশত-দোযখ বিশ্বাস করি। ইহাই আমার অছিয়ত। [১০৩]

২. আমি তকদীর ও তদবীর বিশ্বাস করি, তকদীর অর্থ এই নয় যে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতা দিয়ে কাজ করতে হবে ও জীবনের উন্নতি করতে হবে। আর উহাকেই তদবীর বলে। আর যে এ শক্তিকে কূ পথে ব্যয় করবে সেই সীমালঙ্ঘনকরী হবে ও শাস্তি পাবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি ও বিশ্বাস করিতে অছিয়ত করি।[১০৪]

৩. আল্লাহ সমালোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহর বাণীও সমালোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান,মানুষকে আল্লাহ্ শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য অন্যকে যতটুকু ভালবাসা দরকার। আমি ততটুকু ভালবেসেছি। কিন্তু ভালবাসা আল্লাহর জন্য ইহাই আমার অছিয়ত।

৪. আল্লাহর রাসূল সমালোচনার উর্ধ্বে, আল্লাহর রাসূলের কার্যকালাপ সমালোচনার উর্ধ্বে।আল্লাহর রাসূলের বাণীও আল্লাহর ওহী। ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের গুপ্ত এবং প্রকাশ্য শত্রুরা চিরকালেই ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু সে শড়যন্ত্র যাবৎ না ইসলাম পূর্নত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তা বর্তমানে কামিয়াবী হাসিল করতে পারে নাই

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই আমরা যখন অলসতা এবং বিলাসিতায় গা-ঢালা দিয়া পড়েছি তখন অবশ্যই ষক্রুদের ষড়যন্ত্র আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করছে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের এবং ইসলামের শক্রুদের চেয়েও বেশী ক্ষতি করেশুছ। উম্মতে মুহাম্মদীর সমস্ত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলন করে গেছেন। এভাবে জাহেরী শরীয়তের ইমামগণ কুরআন হাদীসের অর্থগুলোকে এবং বাতেনী তরীকতের ইমামগন আধ্যাতিক ও নৈতিক অর্থগুলোকে কোরআন হাদীস মন্থন করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এত মজবুতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যা বর্তমানে সমালোচনা করে হাজার জায়গার মধ্যে দুই এক জায়গায় ক্রটির সুযোগ পাইয়াছে। বর্তমানে নামধারী মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহনকারী এমন লোক সৃষ্টি হয়েছে, এবং আরও হবে তারা ধর্মের স্ত ম্ভগুলোকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ধর্মের বাহকদের কতল করে, ধর্মকে মানিতেছি বলে দাবি করিবে। ইমাম, আলিম, পীর, মাশাইখদের সমালোচনা করিবে। খবরদার, তাদের ধোঁকায় পড়িবে না। আবার তারা একদল অযোগ্য লোককে পীর সাজাইয়া আলেম সাজাইয়া,এমনকি নবী ও মোহাদ্দেছ সাজাইয়া পেশ করিবে। তাদের নৈতিক দূর্বলতা এবং জ্ঞানের দূর্বলতা, ধর্মের দূর্বলতা, কর্মের দূর্বলতাগুলোকে সত্যিকার আলিম ইমামগণের উপর চাপাইয়া সত্যিকার আলিমদের, ইমামদের থেকে বদ এতেকাদ করিতে চাহিবে। খবরদার! এ শ্রেণীর ধোঁকা থেকে বাঁচিয়া থাকিবে। আখেরী জামানা দাজ্জালী ধোঁকার জামানা। আমি উসমান,আলী, আয়শা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন (র) এর জীবনের কার্যাবলী গ্রহন করেছি হকের ক্ষেত্রে জীবনের মায়া করিনা। হযরত উসমান, আলী, তালহা,যুবায়ের,ইমাম হাসান হোসাইন প্রমূখ বুজুর্গ যখন শক্রও হাতে শহীদ হয়েছেন তখন আমরা শক্রও হাতে শহীদ হওয়াকে অপমান মনে করিব কেন? আর জীবনেরই বা মায়া করিব কেন? পরবর্তী ইমামগণ মুসলমান নামধারী শক্রুদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত হককে, সত্যকে ছাড়েননি, ইহাই আমার অছিয়ত ,যদি কেহ মোয়াবিয়ার সমালোচনা করিতে চান তবে ইসলামের জন্য যা কিছূ করেছেন ততটুকু গুন অর্জন করে তার পর যেন সমালোচনা করেন। অন্যথায় অনধিকার চর্চা করে নিজেকে বাতুলতার পরিচয় দিবে না। সমালোচনা করিতে হলে আগে সমতুল হউন। তার পর সমালোচনা করুন। অন্যথায় সমালোচনা হবে অনধিকার চর্চা এবং বাতুলতা।[১০৫]

৫. আমি তকলীদ মেনেছি ইজতেহাদ মেনেছি ও ইজমা মান্য করিতে অছিয়ত করিতেছি।[১০৬]

৬. আমি তরীকত ও তাসাওউফকে মানিয়াছি। কিন্ত শরীয়তের খেলাফ কোন তরীকতকে মানিনি। তরীকত অথ্যাৎ শরীয়তের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক দিক এবং আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করার মাধ্যম। কিন্তু শরীয়তের সীমার মধ্য থেকে।

৭. তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মাযহাব মেনে চলা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু যে সকল মাযহাব কুরআন ও হাদীসের হাওলা মত চলে তাদেরকে ও সম্মান করি। কেননা তারা সকলে ইত্তেবায় হুদার অনুসারী ,আমি ইমামদের স্মরণ করে তাদের উছূল পড়েছি এবং অপরকে অছিয়ত করিতেছি। কেউ যদি হানাফী মাযহাব পালন করার সাথে সাথে অন্য মাযহাবের উছুল পালন করে তবে তার হানাফীয়াত ছুটে যাবে না। বরং আরো মজবুত হবে। আমি চিশতিয়া তরীকা আমল করেছি। কিন্তু অন্যান্য তরিকাকে অত্যন্ত সম্মান করেছি। একদল লোক চিশতিয়া তরিকার জন্য গান,বাদ্য,নর্তককে লাজেমী বা তালীম মনে করে অপর একদল লোক নকশবন্দীয়া তরিকার জন্য পীরের ধ্যানকে লাজেমী বা তালিম বলে মনে করে। আমি উভয়কে গলদ মনে করি। তবে আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের জজবার ইশকে মত্ত হয়ে কেউ যদি দাঁড়িয়ে বা বসে গজল,কাসিদা, মওলুদ শরীফ পড়ে তবে আমি একে জায়েজ ও অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। কেননা এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (স) এর সানা, ছিফাত, গুনাবলী, কার্যাবলী ও মোযেজা অবগত হয়ে রাসূল (স) কে প্রানাধিক ভালবাসিতে পারে। বাদ্য যন্ত্র দ্বারা নাচ, গান করাকে হারাম মনে করি। যদিও তা আল্লাহর জিকির হয়।[১০৭]

৮. তিনি আরো বলেন, আমি মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাকে হারাম এবং মোমেনদের মধ্যে মিল-মহাব্বত রক্ষা করাকে খুব বড় মনে করি। কিন্তু কোরআন হাদীসের অবমাননাকর কোন কিছুকেই বরদাশত করতে পারিনা । দুই মাযহাব বা দুই ইমাম হলে পরস্পরের বিরোধীতা করতে হবে তার পক্ষপাতী আমি নই। সকল মুসলমান একতা বদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে হবে। এটাই আমার অছিয়ত।

৯. ইংরেজ, কাফেরগণ মুসলিম জাতির ক্ষতি করেছে, তম্মেধ্যে বড় ক্ষতি করেছে ধর্মহীন শিক্ষা। যা মুসলমানদের দ্বারা বিধর্মীরা করাতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজ কাফের বলতে আমি আমেরিকা ফ্রান্স, ইংল্যান্ড রাশিয়া সকল নাছারা ধর্মহীন এবং ধর্মদ্রোহীদের বুঝি। তারা মুসলামন সন্তানের মন, মস্তিস্ক তাদের রঙ্গে রঙ্গিন করে ইসলাম দ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী করে তুলেছে। আমি তাদের নিয়ম-নীতি সংস্কৃতি থেকে বিরত থাকার জন্য অছিয়ত করছি।

১০.আমি প্রত্যেক মুসলমানকে অছিয়ত করিতেছি যে, ছেলে-মেয়ে আল্লাহর আমানত, এ আমানতের খেয়ানত করিবে না। ছেলে-মেয়ে হলে প্রথমে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। অতঃপর বুযুর্গ আলেম দ্বারা তাহনীক করায়ে সপ্তম দিবসে সুন্দর নাম রেখে আক্বীকা করিবে। ছেলে-মেয়ের চরিত্রের দিকে খেয়াল রাখিবে। ছেলেমেয়ে কথা বলা শিখলে, আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, কালিমা তায়্যিবা বলা শিখাবেন। পড়ার মত বয়স হলে সর্বপ্রথম আরবী পড়াতে শুরু করবে। প্রত্যহ সকালে এক/দেড় ঘন্টা আরবী পড়ার জন্য মক্তবে দিবে। শুদ্ধ করে কোরআন শরীফ পড়ার সাথে সাথে বাংলা, ইংরেজী, অংক পড়ার ব্যবস্থা করিবে। স্কূল যাওয়ার বয়স হলে যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্র ভাল ঐ বিদ্যালয় ভর্তি করাবে। মেয়েদের বয়স ৮/৯ বছর হলে পুরুষের নিকট পড়িতে দিবেনা। ছেলে মেয়ের প্রাইমারী পড়া শেষ হলে নিন্মক্ত বইগুলো পড়াবে। লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম কৃত উর্দ্দু পহেলী, দুসরী,তিসরী,চৌথী, বেহেশতী জেওর,রাহে নাজাত,মেফতাহুল জান্নাত ইত্যাদি। উর্দুপড়াতে না পাড়লে বাংলা বেহেশত জেরর,তালিমুদ্দীন, হায়াতূল মুসলীমিন, ইলমের ফযিলত,নামাযের ফযিলত,জিকিরের ফযিলত পড়াবে। তারপর ফার্সী পহেলী,কারিমা,লাতায়েফে ফার্সী,পান্দে নামা, গুলিস্তা,বোস্তা পড়াবে। অতঃপর রওজাতুল আদব, কসাসুন নাবিয়্যীন, কালিউবি, ইয়াওমুল সফর ১ম, ২য়,৩য় খন্ড নাহুমীর হেদায়াতুল্লাহ ইত্যাদি বিষয় পড়ায়ে ফিকহুস সুন্নাহ, বুলুগুল মারামা, মাশারিকুল আনওয়ার, রিয়াজুছালিহীন অথবা মেশকাত শরীফ ও অর্থসহ কোরআন শরীফ পড়াবে। তারপর ছেলে যেদিক ইচ্ছা যাইতে পারে। তার ঈমানের হিফাজত কারী নিজে হবে। শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারিবেনা। তবে মেয়েদের সহশিক্ষার স্কুল কলেজে পড়াবেন না।[১০৮]

১১.আমি তাবিজ ২/১টা লিখেছি তবে একে পেশা ও রোজগারের পন্থা বানাইনি। শিক্ষকতা করেছি তবে তাকেও রোজগারের পন্থা বানাইনি।সারাজীবন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি ইসলামকে সজীব রাখার জন্য। মাদ্‌রাসা করা, কিতাব লিখা, ওয়াজ নছিহত করা, মুরীদ করাকে কখনো রোজগারের পন্থা বানাইনি। কেউ হালাল মালকে হাদিয়া দিলে তা গ্রহন করেছি হাদিয়া দেওয়া নেওয়া ঈমানী মহব্বত তাই উহা গ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

করেছি। কখনো সন্দেহ হলে হাদিয়াও গ্রহন করিনি। ওয়াজ তাবলীগ, মাদ্‌রাসা, খানকা ইত্যাদি খাঁটি নিয়ত ব্যতিত দুনিয়া হাছিলের নিয়তে করা হতে বেঁচে থাকার অছিয়ত করিতেছি।[১০৯]

১২.আমি তাসাওউফ শিখেছি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর নিকটে। আর তাসাউউফ হলো ইলম এবং যে অনুশীলন দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক সজীব ও সতেজ করা। ৬/১০ লতিফায় জিকির করে কেউ যদি নামায না পড়ে তবে তাকে তরিকা পন্থী বলা যাবে না। তদ্রুপ কেউ যদি নামাযের ফরয, ওয়াজিব, নফল, মুস্তাহাব আদায় না করে সুদ, ঘুষ, এতিমের মাল, আত্বীয়ের হক ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট না দেয় তবে তাকে তরীকাপন্থী বলা যাবে না। তবে এর মধ্যে স্তর আছে ছোট বড় আছে উপরের তলায় উঠিতে না পাড়লে নিচের তলা ভাঙ্গিয়া ফেলিভ না। নিচের তলা থেকে উপরের তলা উঠার চেষ্টা করিব। আমি এ তাসাওউফের আশেক এবং সকলকে এ তাসাওউফের অছিয়ত করিতেছি।

১৩. তরীকা পীরের ছেলেকে পীর বানানোর জন্য বলে নাই, তবে সে যদি যোগ্যতার গুণে পীর হয় তবে দোষের কিছুই নেই। হযরত আলী (র) কে তাঁর পুত্র খলীফা বানানো প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি চুপ ছিলেন । কিছুক্ষণ পর বলেন সেটার ভার তোমার উপর আমার ছেলে বলে তাকে খলিফা বানাবো আবার আমার ছেলে হওয়াটাও অযোগ্যতা নয়। তোমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে যদি উপযুক্ত মনে কর তবে খলীফা বানাতে পার। মাওলানা শামছুল হক (র) বলেন আমি আলী (র) এর সুন্নাতের উপর আমল করিতেছি। তোমরা যেন আমার ছেলে বলে তাকে পীর না বানাও। তবে মানুষ বানানোর জন্য চেষ্টা করলে নিষেধ করিব না। সকলকে আল্লাহর রেজামন্দি করার জন্য অছিয়ত করিতেছি।

১৪. ইসলাম ধর্মের অর্থ আল্লাহর বাণী ও রাসূল (স) এর জীবনী অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর। এদুটি ইসলাম ধর্মের সামগ্রীক শিক্ষার মূল। এর শিক্ষা ব্যতীত ইসলাম বেচে থাকতে পারেনা। ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য হুকুমতের যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন অর্থের। এজন্য হালাল পথে অর্থ উপার্জন করাকে ফরয করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের দ্বীন জারী করার জন্য দান করা ফরয। আল্লাহর দ্বীন জারি করার জন্য বর্তমানে পাঁচটি তরীকা প্রচলিত আছে। তরীকা পাঁচটি হলোঃ ১.যে সব মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মের আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। ২.যে সকল ওলীগণ খানকায়ে বলে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়ে লোকদের চরিত্র গঠন করেন। ৩.যে সকল আলেম দেশ বিদেশে সফর করে ওয়াজ নছিহত করে চরিত্র গঠন ও দেশের সেবা করার প্রেরণা যোগায়। ৪.যে সকল আলিম দেশ বিদেশে ঘুরে দ্বীনি শিক্ষা দেয়। ৫.যে সকল লোক কোরআন সুন্নাহ হতে জ্ঞান আহরণ করে তা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে জনসাধারনের নিকট বিতরন করে। এ পাঁচ দলের লোক পাঁচ প্রণালীতে ইসলমের খেদমত করিতেছে। ইহাই মুসলমানদের উপর ফরয। কারণ একাজের মাধ্যমে ইসলাম জিন্দা হয়েছে। আমি আমার তরীকার ভাইদের বলিতেছি তারা যেন কিছুইতে এ ফরয পালনে ত্রুটি না করে।[১১০]

১৫. সকল মাদ্‌রাসা, ওয়াজ, পীর মশাইখ, জিহাদ সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তার মাধ্যমে বাচাই করে খাঁটি ও সত্যকে গ্রহন করতে হবে। এবং মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে। ঈমান,আখলাখ ও ঈমানদারদের প্রতি কুসুমের ন্যায় কোমল খোদাদ্রোহী কার্যকলাপের প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোর হবে। আমি আমার তরীকার ভাইদের অছিয়ত করিতেছি যে, সকল ক্ষেত্রে নরম হবেন। দুঃখ,কষ্ট বিপদ-আপদ,বালা-মুছিবতে ধৈর্য ধরবে, প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না। ইহাই আমার অছিয়ত। আমি সারাজীবন ইহা পালন করেছি এবং সকল মুসলমান ভাইদের পালন করিতে অছিয়ত করিতেছি।[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শামছুল হক সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদের অভিমত ঃ

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম মুসলিম জাতির পথ প্রদর্শক, আপোষহীন রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক, হাদীস ও তাফসীর বিশারদ মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সকল অভিমত করেছেন। নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির অভিমত উল্লেখ করা হলো।

১. মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী (র) এর অভিমত ঃ

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী (র) মাওলানা শামছুল হক (র) এর ইন্তি কালের সংবাদ শুনে মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে অনেকক্ষণ পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, হায় ! বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আলিমে দ্বীন, দুনিয়া থেকে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন, মাওলানা শামছুল হক (র) এর মত উদার, তেজস্বী, মানব প্রেমিক, দুনিয়াত্যাগী, কোরবানী করনে ওয়ালা আলিম সারা দুনিয়ায় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি আমার থেকে অনেক অনেক বড় আলিম ও আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন।[১১২]

২. মাওলানা মুহাম্মদ তাক্কী উসমানী (র) এর অভিমত ঃ

ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলিম, মুফ্তী মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র) এর পুত্র পাকিস্তানের শরীয়তি আদালতের বিচারক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা তাক্কী উসমানী (র) মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে বলেন। তিনি বিনয়, নম্র, ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। ইসলামী হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে শাসকদের মাঝে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্ছুতি দেখলে তিনি অসীম সাহসের সাথে তার প্রতিবাদ করতেন। এ ধরনের স্পষ্টবাদীতার জন্য অনেক শাসক তাঁকে তিরস্কার করতেন। কিন্তু সকলে জানতেন তাঁর এ স্পষ্টতার মধ্যে নিজের কোন স্বার্থ ছিলনা। তাই কোন শাসক তাঁকে নির্যাতন করতে সাহস পাননি। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। তাঁর থাকার কক্ষ দেখলে মনে হত তিনি যেন একজন প্রবাসী অথবা পথিক।[১১৩]

৩. মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজী হুজুর (র) এর অভিমত ঃ

মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজী হুজুর (র) মাওলানা শামছুল হক (র) এর স্মৃতিচারন করতে গিয়ে বলেন, মাওলান শামছুল হক (র) ছিলেন আমার "ছের এ তাজ"। ছাত্র জীবনে তাঁর সাথে লেখা পড়া করেছি কিন্তু তিনি ছিলেন ওস্তাদের ন্যায়।তাঁর নিকট হতে আমি মনুষ্যত্ব হাসিল করিয়াছি। অনেক জটিল বিষয়ের সহজ সরল উত্তর তাঁর নিকট হতে পেয়েছি। তাঁর সহযোগিতায় মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)এর সংস্পর্শে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। ইসলামের খেদমতে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।[১১৪]

৪. শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক (র) এর অভিমত ঃ

মাওলানা আজিজুল হক (র) মাওলানা শামছুল হক (র) সর্ম্পকে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তাঁর গোটা জীবন ছিল ইখলাছে পরিপূর্ণ। তিনি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাদশাহী জীবন যাপন করতে পারতেন। তাঁর লেখা "হাক্কাণী তাফসীর "বাংলা ভাষাভাষী লোকদের জন্য অমূল্য সম্পদ। তিনি ইসলামের দূর্দিনে ত্রানকতার্র ভূমিকায় অবর্তীন হন। তিনি খৃষ্টান মিশনারী ও পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সজাগ করে তুলেন।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

৫. মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান(র)এর অভিমত ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মাদ খান বলেন, তিনি একজন কামেল ওলী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যদি ১৪০০ বছর পর সাহাবীদের নমুনা ও আদর্শের উপর যদি কোন লোককে দেখতে চাও, তবে মাওলানা শামছুল হককে দেখে নাও। তিনি ইচ্ছা করলে ঢাকায় বহু প্রাসাদ তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে বাংলাদেশে অনেক মাদ্‌রাসা ও আলিম তৈরী করেছেন।[১১৬]

৬. মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী সাহেবের অভিমত ঃ

লালবাগ জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা ফজলুল হক আমিনী মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম, রাজনীতিবিদ, লেখক, গবেষক, হাদীস ও তাফসীর বিশারদ। তাঁর মধ্যে ইখলাস, দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতা ও মানুষের ইহলৌকিক শান্তি ও পরলৌকিক মুক্তির সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামের পাশাপাশি উচ্চ স্তরের মুত্তাকী ছিলেন। তিনি অহংকার ও গর্ব থেকে মুক্ত ছিলেন।[১১৭]

৭. মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের অভিমত ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে তাঁর জামাতা গরহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আবদুল মান্নান বলেন, তিনি সাধারন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনড় ছিলেন।[১১৮]

৮. অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের অভিমত ঃ

অধ্যাপক গোলাম আজম মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন উদার মনের অধিকারী। আমার ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। আমি ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণা তাঁর নিকট হতে পেয়েছি। তাঁর প্রেরণায় ১৯৭৮ খ্রিঃ "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" বইটি লিখি। আমি তাঁর নিকট হতে এই শিক্ষাও পেয়েছি যে, সকল আলিমকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁকে আমি দ্বীনি মুরুব্বী হিসাবে এখনো শ্রদ্ধা করি। তাঁর মত যোগ্য উলামার অভাব বর্তমানে তীব্র ভাবে অনুভব করছি।[১১৯]

৯. মাওলানা আমিনুল ইসলামের অভিমত ঃ

মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বিশিষ্ট তাফসীরকারক মাওলানা আমিনুল ইসলাম বলেন, আমি যাদের সহচার্য লাভে ধন্য হয়েছি, জ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়েছি তাদের মধ্যে মাওলানা শামছুল হক অন্যতম। তিনি যে ইসলাম শিক্ষা ও ইলমে দ্বীন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন করেছেন তা বিরল আমি যা কিছু লিখেছি তাতে তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর নিকট হতে লেখার প্রেরণা পেয়েছি। ১৯৬০ খ্রিঃ আমার প্রথম রচিত গ্রন্থ "জীবন ও কোরআন" তিনি সম্পাদনা করেন। তাছাড়া "তাফসীরে নূরুল কোরআন" লেখার যোগ্যতা তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে পেয়েছি।[১২০]

Dhaka University Institutional Repository

১০. অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক সাহেবের অভিমত ঃ

অধ্যক্ষ আবদুর বাজ্জাক মাওলানা শামছুল হক (র) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন মূর্তিমান এখলাসের প্রতীক। তিনি যখন যেটাকে হক বা সত্য বলে মনে করতেন সে ক্ষেত্রে বজ্রের চেয়ে কঠোর ও হিমালয়ের চেয়ে অটল থাকতেন। কিন্তু তিনি যদি বুঝতে সক্ষম হতেন যে, যুক্তি তর্কের কষ্টি পাথরে ভুল করেছেন, তাহলে মুহূর্তেই সে ভুল সংশোধন করে নিতেন। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করাকে অমার্জনীয় অপরাধ মনে করতেন।[১২১]

মাওলানা শামছুল হক (র) বিংশ শতাব্দীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা তথা বাংলাদেশে উলামা মাশাইখদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উলামায়ের স্থান অলংকৃত করেছেন। তিনি ইসলাম প্রচারে অপরিসীম অবদান রেখেছেন যার ফলধারা বর্তমানেও প্রবাহিত রয়েছে। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। তিনি ইসলাম প্রচারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক (র) জীবনী, প্রকাশনা, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, মার্চ ১৯৯৮ ইং, পৃ, ২১ ; গোলাম সাকলায়ান, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ই, ফা, বা (৪র্থ সংস্করণ) জুন ১৯৯৮ ইং পৃ, ১৭৫

২. গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত পৃ, ১৭৫; মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, আল্লামা শামছুল হক (র) স্মরণিকা, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ (২য় প্রকাশ) ১৯৯৭ ইং পৃ, ৬

৩. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২

৪. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) স্মারক গ্রন্থ, পরিবেশক আল কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইং পৃ, ১৯ ; ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামী ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, (২৩ খন্ড) পৃ, ৫০৮ ; দৈনিক যুগান্তর ১০মে ২০০২ ইং পৃ, ১৪ (৫, ৬ কলাম) ; Nurul Islam khan, Bangladesh Distriet gazetteers Faridpur.1977,P.254

৫. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত , পৃ, ২৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের (র) সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিশ্ব নবী (স) একাডেমি, ১৯৮৯ ইং পৃ, ৪

৮. মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, মোযাদ্দেদে আযম আল্লামা শামছুল হক (র) ছদর সাহেব হুজুরের পাঠ্য জীবন, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। ১৯৯৮ ইং পৃ, ৮

৯. মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

১০. মোহাম্মদ তৈয়্যব, শরীফ মুহাম্মদ, আহ্‌লুল্লাহ্‌ ওয়াছেল, আলোর কাফেলা প্রকাশনী জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ১৯৯৭ ইং পৃ, ৫৫

১১. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪১-৪২ ; মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২

১২. মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২

১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪-৫

১৪. মাওলানা মোঃ কামরুজ্জামান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮ ; মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, আল্লামা শামছুল হক (র) স্মরণিকা, পৃ, ৫ ; মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন তাযকেরাতুল আউলিয়া (১ম খন্ড), বর্নালী প্রকাশনী ঢাকা। ১৯৯৪ ইং পৃ, ৩০৮

১৫. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৬ ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, প্রকাশনা ইসলামিক ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, ঢাকা। মে ১৯৯৩ ইং পৃ, ৫০৮

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭-৮ ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত,পৃ, ১৬২

১৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের (র) সংক্ষিপ্ত জীবনী, পৃ, ৭, ৮ ও মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন তাযকেরাতুল আউলিয়া (১ম খন্ড), পৃ, ৩০৯

১৮. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৭

১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ১১ ; মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬

২০. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত , পৃ, ৫৮

২১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৮-৬০

২২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২ ; মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর, মোযাদ্দেদে আযম আল্লামা শামছুল হক (র) ছদর সাহেব হুজুরের পাঠ্য জীবন, পৃ, ২৭

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৩ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৮

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৩ ; দৈনিক যুগান্তর ১০ মে ২০০২ ইং পৃ, ১৪ (৫, ৬ কলাম)

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৩

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৬, ৬৭ ; গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩২, ১৩৩

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬-৩১, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৬৪ ; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬২,৭২ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪-১৬

Dhaka University Institutional Repository

৩০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭, ৮ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৭-৮০, ১৩২-১৩৩

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৫-১৫৭

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৬, ১৫৭

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ,১৫৭,১৫৮

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৪ ও মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৪, ৮৫, ১৫৪, ১৫৫

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮১-৮২, ১৩৪-১৩৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪২

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪২ ; মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৩৫

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫ ; দৈনিক যুগান্তর ১০মে ২০০২ ইং পৃ, ১৪ (৫, ৬ কলাম) ; গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৭

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৬ ; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৯-৫৩

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫২-৫৪

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৬-৭৯ ; জুলফিকারআহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪৩

৪৫. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৩ ; গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৭

৪৬. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৫-৮৬

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৫-৮৭ ; জুলফিকারআহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২২

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৮-৯১ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ১২২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৪-৯৫

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৩, গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার ৬৫তম বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১৯৯৯-২০০০ ইং) ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

৫১.আহ্‌কার আব্দুর রাজ্জাক ফরিদপুরী, গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মোহতামিম সাহেবের জীবনী, পৃ, ৪১

৫২. গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার ৬৫তম বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১৯৯৯-২০০০ ইং) থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. Nurul Islam khan, Bangladesh Distriet gazetteers Faridpur.1977,P.254 ; মোহাম্মদ তৈয়্যব, শরীফ মুহাম্মদ, আহ্লুল্লাহ্ ওয়াছেল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬০-৬১

৫৪. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

৫৫. জুলফিকারআহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৪-১২৫

৫৬. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত , পৃ, ১৩০

৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯-৩০

৫৮. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

৫৯. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৫

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৬

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৬ ; জুলফিকারআহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৫৫

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২১-১২৩

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৩-১২৮ ; গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৬

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৯ ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩-২৫

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৯

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৯

৬৭. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৭

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৮

৬৯. সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ। ১৯৯৩ইং পৃ, ৪৪১, ৪৪৩

৭০. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত , পৃ, ১০৩

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৪

৭২. আবু আল সাঈদ, সাতচল্লিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, আগামী, জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং পৃ, ৯৩

৭৩. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৮

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৮-১০৯

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৯-১১০

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১১০

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৮ ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৯

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ও মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬ ; মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১

৮২. Nurul Islam khan, Bangladesh Distriet gazetteers Faridpur.1977,P.254 ,

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪

৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬

৮৫. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪

৮৭. Nurul Islam khan, Bangladesh Distriet gazetteers Faridpur.1977,P.254 ; গোলাম সাকলায়ান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৬

৮৮. মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

Dhaka University Institutional Repository

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৩ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪ ; প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৪

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৪

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০১-২০৪

১০০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৭-৫৮

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৮-৬১

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬১

১০৩. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৫

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৫-১৬৬

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৫-১৬৯

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৯-১৭০

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭০-১৭২

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭২-১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৫-১৭৭

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭৭-১৮১

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮১

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮৩

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮৩-১৮৪

১১৪. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১

১১৫. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত , পৃ, ১৮৫

১১৬. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৬০

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮৮-১৮৯ ; মোহাম্মদ তৈয়্যব, শরীফ মুহাম্মদ, আহ্লুল্লাহ্ ওয়াছেল, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৩- ৬৯

১১৮. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮৫- ১৮৭

১১৯. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১২- ৩১৩

১২০. প্রাগুক্ত, পৃ, ২০৯- ২১২

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২১২- ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

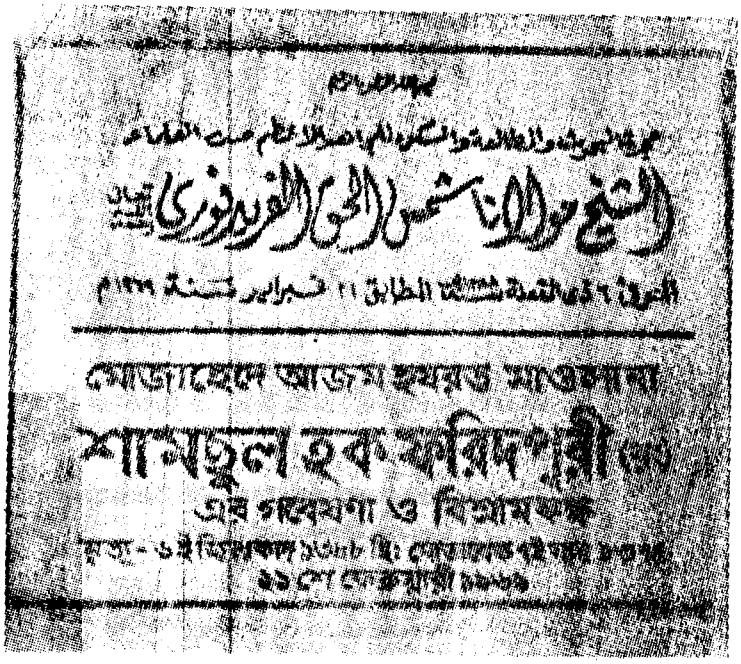

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর বিশ্রাম কক্ষের শিলালিপি।

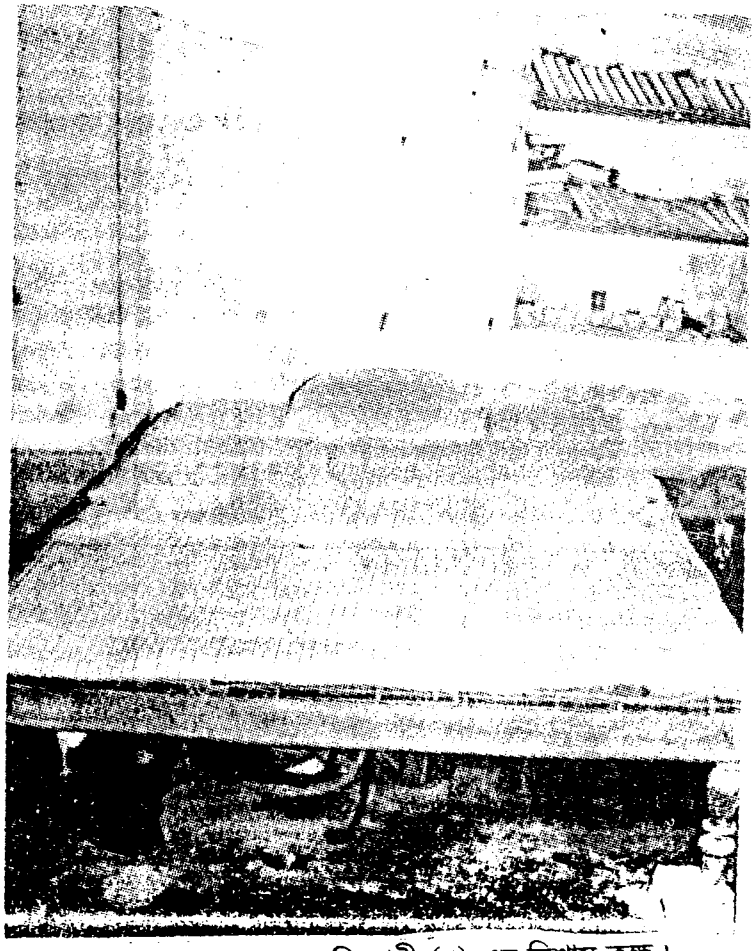

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর বিশ্রাম কক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

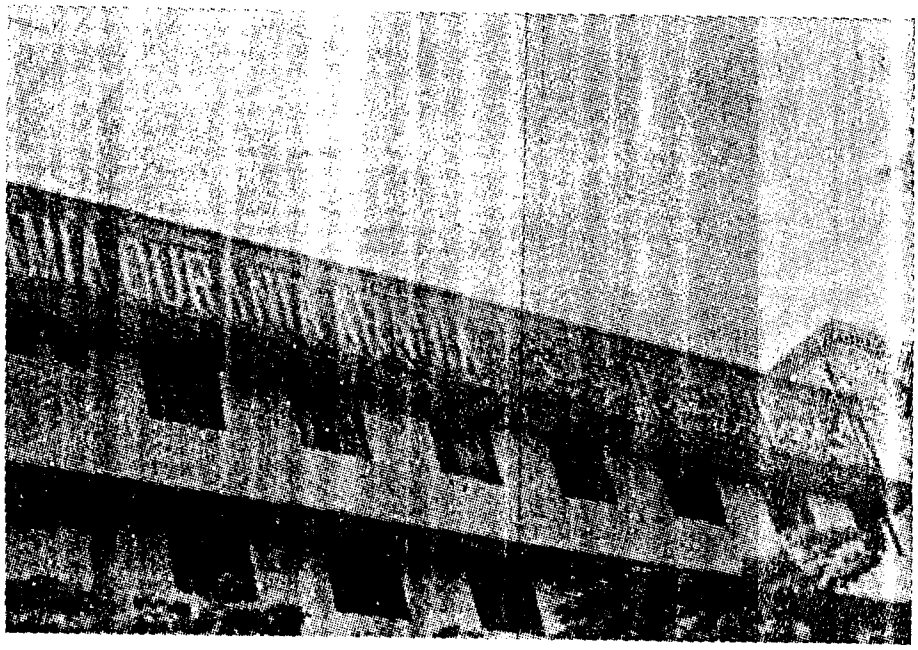

লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসা।

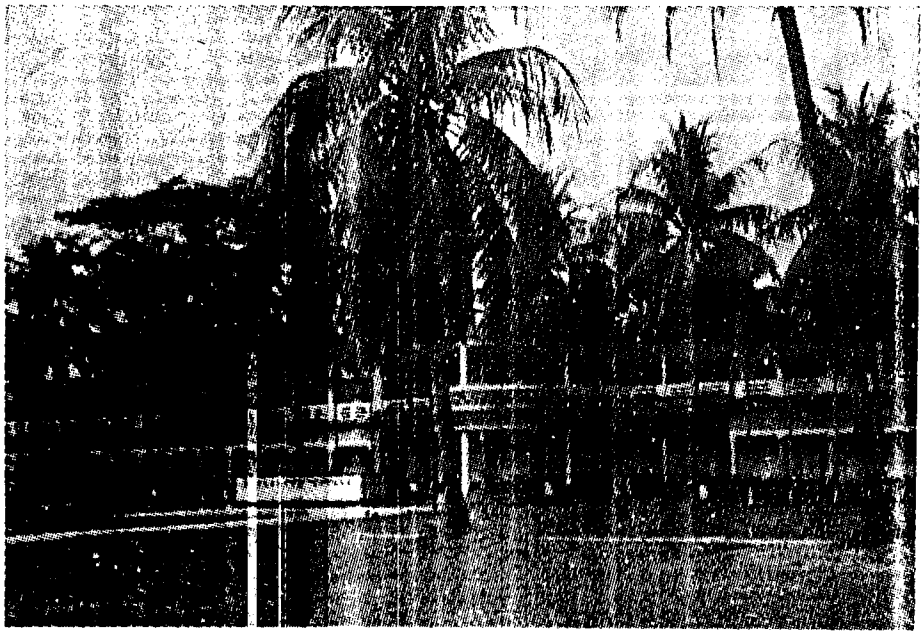

দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

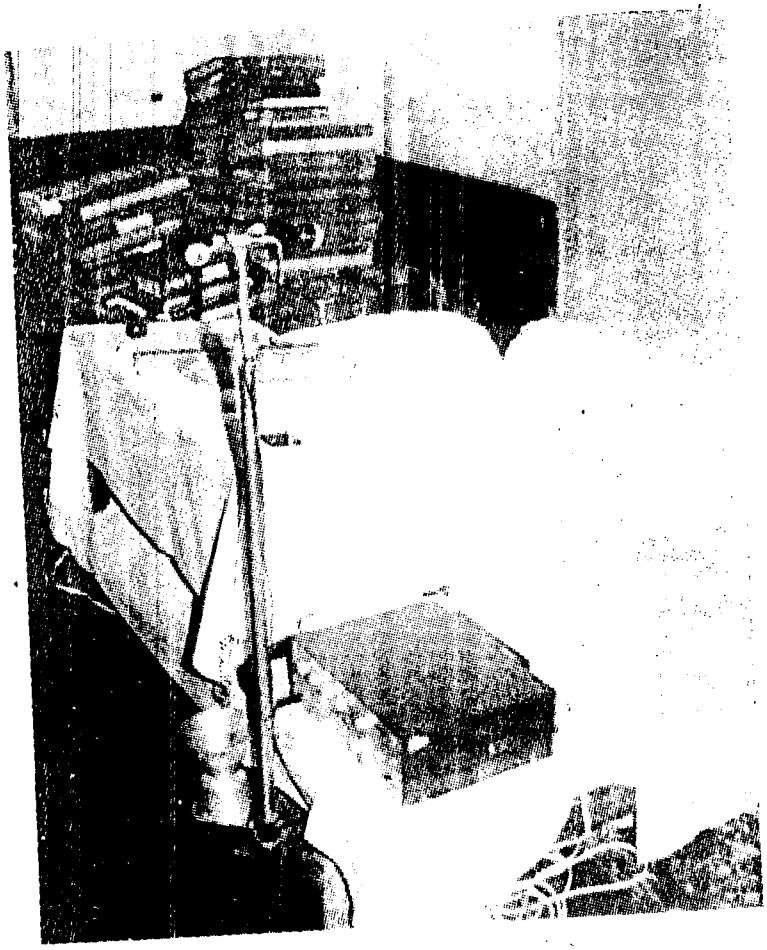

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর গবেষণা কক্ষ।

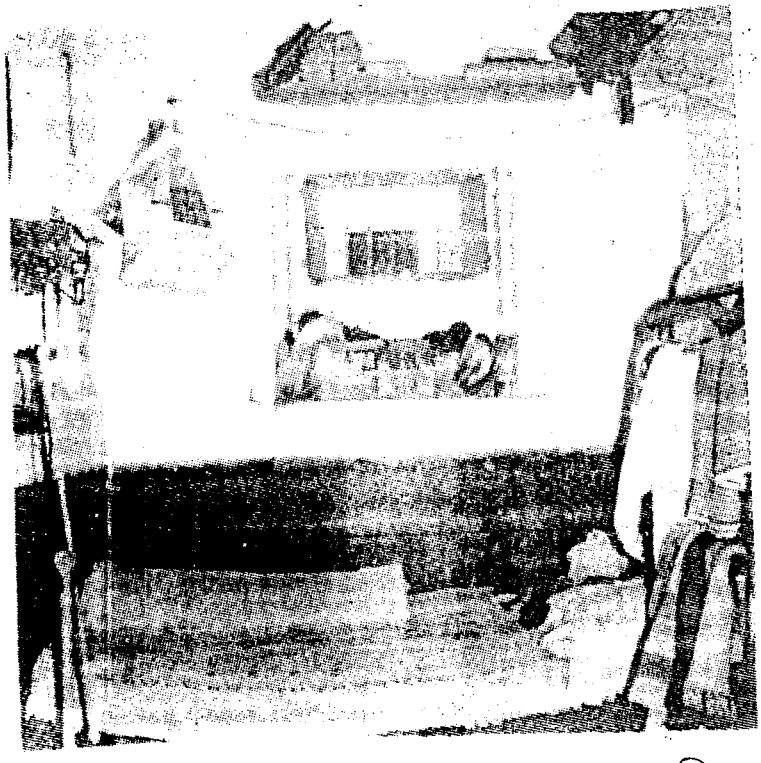

মাওলানা শামছুল হক (র) এর বিশ্রাম কক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

গওহরডাঙ্গা মসজিদ।

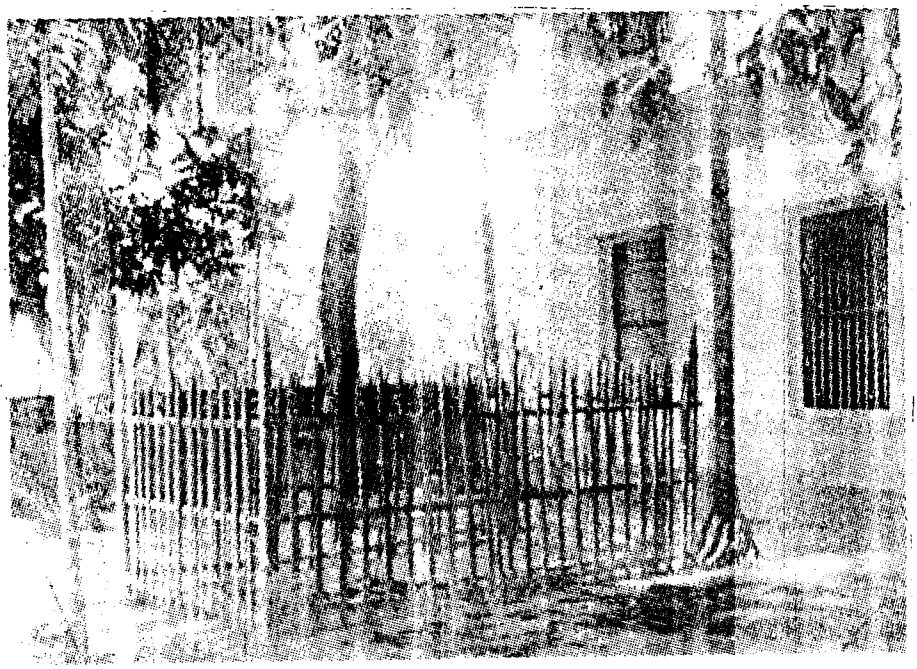

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র)-এর মাযার।

Dhaka University Institutional Repository

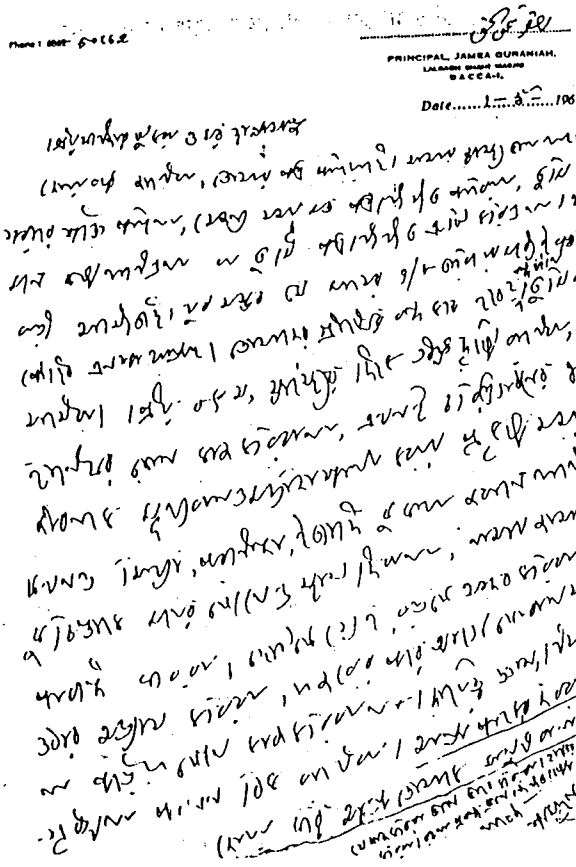

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর বড় ছেলে ওমর আহমদের নিকটে লিখিত চিঠি।

Principal Jamea Qurania
Lalbag Shahi Masjid
Dacca-1
Date: 1-5-1966

প্রিয় কলিজার টুকরা ওমর ছাল্লামাহু,

দোয়া পর জানিবা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। শরীরে শক্তি পাই না, সে জন্য সময় মত পত্র লিখিতে পারি না। তুমি তাতে মনে কষ্ট পাইও না বা তুমি পত্র লিখিতে ত্রুটি করিও না। আমি বাড়ি আসিতেছি। খুব সম্ভব মে মাসের ৭-৮ তারিখের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছব এনশাআল্লাহ। তোমাদের গ্রীষ্মের বন্ধ কবে হবে? বন্ধ হইলে তুমি বাড়ি যাইবা। প্রিয় বৎস! স্বাস্থ্যের দিকে তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবা। স্বাস্থ্যের হানিকর কোন কাজ করিবা না, এখনই চরিত্র গঠনের এবং জীবনকে মূল্যবান ও মর্যাদাশালী করার প্রকৃত সময়। কখনও মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি কুকথা জবানে আনিবা না। কু-চিন্তাকে মনের কোনেও স্থান দিবা না। নামায জামাতের পাবন্দ করিবা। ছোটকে স্নেহ বড়কে আদব করিবা। সকালে উঠার অভ্যাস করিবা। ফজরের পরে আগে কোরআন শরীফ না পড়িয়া কোন কাজ করিবা না। দায়িত্ব জ্ঞান নিয়ম শৃংখলা পালন ঠিক রাখবা। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে মানুষ বানান। যে কাজ করিবা ভালভাবে করিবা। হাতের লেখা ভাল করিবা। রচনা প্রবন্ধ ভাল লিখিতে চেষ্টা করিবা।

নাচিজ
শামছুল হক

Dhaka University Institutional Repository

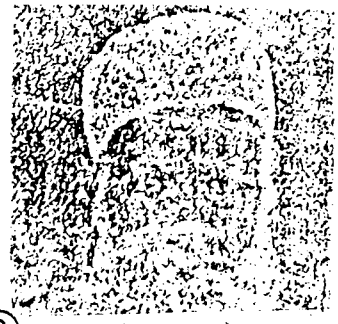

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (পখিরার পীর সাহেব)

(১৯০০-১৯৯৬ খ্রিঃ)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ইসলাম প্রচারে যে সকল উলামা ও মাশাইখ বিরামহীন অক্লান্ত সাধনা করে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন মাওলার নূর মোহাম্মদ (র) তাদের মধ্য একজন। তিনি জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। পার্থিব জীবনের সুখ শান্তি আরাম আয়েশ প্রভাব, প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি, নেতৃত্ব-কৃতিত্ব ইত্যাদির প্রতি তার কোন মোহ্ ছিলনা। তিনি ইসলামের বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশের সকল এলাকায় ওয়াজ নছিহত করে লোকদের ইসলামের দিকে আহবান করেন। তিনি মাদ্‌রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

পখিরার পীর মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলার গোবিন্দপুর এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষ পিতামহ মাওলানা শরীফ মোহাম্মদ সমির উদ্দিন পবিত্র মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আরবদেশ হতে ইসলাম প্রচারে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাংলাদেশে এসে বাকেরগঞ্জ জেলার কৃষ্ণকাঠি এলাকায় বসবাস করে এলাকায় নিজের জমিদারী পরিচালনা করেন।[১] ১৮৪০ খ্রিঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) এর পিতা মাওলানা মনির উদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য আরবদেশ গমন করেন। সেখান থেকে কোরআন, হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, বালাগাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জণ করে ১৮৮৭ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর মাদারীপুর বিবাহ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৩]

শিক্ষা গ্রহন ঃ

নূর মোহাম্মদ শিশু বয়স অতিক্রম করে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বয়সে পৌছলে পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহনণ করেন। তিনি পিতার নিকট বিশুদ্ধ করে কোরআন শরীফ পড়া আয়ত্ব করেন।[৪] পরবর্তীতে নোয়াখালীর নিবাসী মাওলানা আবু বক্কর (র) নিকটে আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ব করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

নূর মোহাম্মদ অতি অল্প সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য আনুমানিক ১৯২৩ খ্রিঃ বড় ভগ্নিপতি মাওলানা সুলায়মানর (র) নিকট চট্রগ্রাম 'দারুল উলূম' মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করে চট্রগ্রাম ত্যাগ করে ঢাকায় এসে হাম্মাদিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় গমন করেন।[৬]

উচ্চ শিক্ষা ঃ

মাওলানা নূর মুহাম্মদ ১৯৩২ খ্রিঃ কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ খ্রিঃ ফাজিল পাশ করেন। তাঁর লেখা পড়ার আগ্রহ ও মেধা দেখে ওস্তাদগণ তাকে "কিতাব কা কেরা" বা কিতাবের পোকা গুনে ভূষিত করেন।[৭] ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মাওলানা মুফতী শফী (র) তাঁকে একবার বলেছিলেন, "বাবা নূর মোহাম্মদ তুমি ইচ্ছে করলে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে পাঠদান করতে পার। তোমার ইলমে শরীয়ত শিখার আর কোন প্রয়োজন নেই"। তিনি তথায় ১৯৩৬ খ্রিঃ কামিল (হাদীস বিভাগে) সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন।[৮]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) কলকাতা থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষ করেন। এরপর তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার আগ্রহ জেগে উঠে। তাই তিনি তৎকালীন ছারছিনার পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন আহাম্মদ (র) এর নিকট মুরীদ হয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৯]

খিলাফত লাভ ঃ

ছারছীনার পীর মাওলানা নিছার উদ্দীন (র) ১৯৪২ খ্রিঃ ফরিদপুর এলাকায় শহর আলী ঢালীর বাড়িতে এক মাহ্‌ফিলে মাওলানা নূর মোহাম্মদকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে মাওলানা আঃ রহমান কবিতা আকারে বলেন ঃ-

"থাকি আমি (ছারছীনার পীর সাহেব) অনেক দূরে ,
সবসময় পাইবেন আমারে কেমন করে ,
খলিফা নিযুক্ত করি দিতে আছি এই ঘরি (এখনই)
তালিম নিবেন তাহার ধারে ।
পীরে কামেল ছারছীনার হাত খানা ধরে তাহাঁর
দাঁড়া করাইলেন তাঁহার পাশে
বলেন পখিরার মোর্শেদ তথা কোম্বল ঢাকিয়া মাথা
মোরাকাবা আছিলেন করিতে তখন,
এই মাওলানা নূর মোহাম্মদ কামেল চারি তরিকার
মস্ত বড় ওলী উনী তালিম নিবেন তাহার কাছ থেকে"।[১০]

এভাবে কম্বল আচ্ছাদন করে মাওলানা নূর মোহাম্মদকে অত্র এলাকার খলিফা নিযুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে ৬ (ছয়) জন রমনীর পানি গ্রহণ করেন। তিনি শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানায় সর্ব প্রথম ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ করেন। উক্ত স্ত্রী ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করে। তার গর্ভে ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলার টেকের হাটের গোয়ালা নামক গ্রামে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। এই স্ত্রী বারবার পর্দার বিধান লঘংন করার কারণে তাকে ১৯৫৩ খ্রিঃ তালাক দেন। অতঃপর ১৯৬০ খ্রিঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) মাদারীপুর জেলার ছোনিয়া গ্রামে তারঁ এক মুরিদের মেয়ে ছালেহা বেগমকে তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করেন । এই স্ত্রী ১৯৭৬ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন তার গর্ভে ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি চতুর্থ বিবাহ করেন ১৯৭৩ খ্রিঃ ঢাকা লৌহজং থানার বিক্রমপুরে আয়শা নাম্মী এক মহিলাকে। উক্ত স্ত্রী ১৯৮৮ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন। তার গর্ভে ৩ ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি পঞ্চম বিবাহ করেন ১৯৭৮ খ্রিঃ বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার গৈলা গ্রামে মাহমুদা বেগম নাম্মী এক রমনীকে। উক্ত স্ত্রী ১৯৯৫ খ্রিঃ ইন্তিকাল করেন। তার গর্ভে ২ ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ষষ্ঠ বিবাহ করেন ১৯৯৪ খ্রিঃ মাদারীপুর সদরে মাওলানা শামছুল হক সাহেবের কন্যা নাজমা খানমকে। তার গর্ভে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়নি। তিনি বর্তমানে জীবিত। মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) এর দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা ছগীর মাহমুদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন।[১১]

হজ্জ্ব পালন ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) তাঁর কর্মময় জীবনে (আট) ৮ বার হজ্জ পালন করে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম হজ্জ পালন করেন ১৯৪৬ খ্রিঃ ছাবছীনার পীর মাওলানা নিছার উদ্দীন আহম্মেদ (র) সাথে এবং সপ্তমবার হজ্জ পালন করেন স্বপরিবারে। [১২]

ইন্তিকাল ঃ

মাওলানা নূর মোহম্মদ (র) ১৯৯৬ খ্রিঃ ১৪ সেপ্টেম্বর ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা সম্মুখে সমাহিত করা হয়।[১৩]

কর্ম জীবন ঃ

পাখিরার পীর মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ১৯৩৬ খ্রিঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাদারীপুর তাঁতী বাড়ি মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। উক্ত মাদ্‌রাসায় কিছুদিন চাকুরী করে ইসলাম প্রচারে চাকুরী ছেড়ে ওয়াজ মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে সকলকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করেন। তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ অবদান রাখেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় কর্ম ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মের সাথে সাথে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। নিম্মে তার ধর্মীয় কর্ম আলোচনা করা হল ঃ-

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

ছারছীনার মরহুম মাওলানা নিছার উদ্দিন (র) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে পাখিরায় মাহ্‌ফিলে আসলে মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) কে বলেন, বাবা নূর মোহাম্মদ আমার মনে হয় আমি মাদারীপুর পড়েছি। আমার ইচ্ছে এখানে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হউক। তাই মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে ছারছীনার মাওলানা নিছার উদ্দিন (র) এর উপস্থিতিতে তাঁর নামের সাথে নামকরণ করে মাদারীপুর আহমামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মাদ্‌রাসা পরিখা নামক স্থানে ১৯৪২ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে উক্ত মাদ্‌রাসা ১৯৫০ খ্রিঃ কামিল শ্রেনীতে উন্নিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিঃ আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গনে উক্ত মাদ্‌রাসা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাদ্‌রাসা ভেঙ্গে যাওয়ার পর ঐ বছরই তিনি মাদারীপুর ইটের পুলের দক্ষিণে কুকরাইল নামক স্থানে মাদ্‌রাসা স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় শত শত ছাত্র ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করছে। তিনি গরীব মেধাবী ছাত্রদের কিতাব ক্রয় করে দিতেন ও বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি এক তলা বিশিষ্ট।[১৫]

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি ১৯৪২ খ্রিঃ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মাদ্‌রাসার নিকটে একটি মস্‌জিদও প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে উক্ত মস্‌জিদ দোতলায় উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৮৬ খ্রিঃ মাদ্‌রাসার সাথে সাথে উক্ত মস্‌জিদও নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মস্‌জিদ মাদ্‌রাসা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে মাদ্‌রাসার সাথে সাথে মস্‌জিদ ও কুকরাইলে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে উক্ত মসজিদ একতলা বিশিষ্ট। তিনি ওয়াজ মাহ্‌ফিল কালে বিভিন্ন এলাকায় বহু মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬]

খানকা স্থাপন ঃ

তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খানকা স্থাপন করেন। খানকার মাধ্যমে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক ওয়াজ মাহ্‌ফিল ও জিকিরের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন। [১৭]

সাহিত্য কর্ম ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) এর সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচরণ ছিল। তিনি কোরআন, হাদীস, তাফসীর, ইজমা, কিয়াস, ফিকহ্‌, বালাগাত, মানতিকসহ বাংলা ইংরেজীর ক্ষেত্রেও গভীর পন্ডিত ছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে পারতেন। আরবী ভাষায় তার লিখিত বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

পত্রাদি পড়ে অনেক আরবী ভাষাবিদ অবাক হতেন। তাঁর আরবী সাহিত্যে পান্ডিত্যের কথা উল্লেখ করে মাদারীপুর আহমদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আবুবকর সাহেব বলেন, ১৯৬৫ খ্রিঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) নোয়াখালীর চিতৈষী এলাকার মাওলানা নূরুল্লাহকে আহমদিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আরবীতে লিখিত একখানা চিঠি দিয়ে আমাকে নোয়াখালীর চিতেষী এলাকায় মাওলানা নূরুল্লাহর নিকট পাঠান। মাওলানা নূরুল্লাহর কলকাতা দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে হাদীস বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। [১৮]

হাফেজ মাওলানা আবুবকর সাহেব বলেন, আমি অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে চিঠি খানা মাওলানা নুরুল্লাহকে দিলাম। তিনি চিঠিখানা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তৃতীয় বার অধিক মনোযোগ দিয়ে পড়ে বল্লেন মাওলানা নূরুল্লাহর নিকট আরবীতে এরূপ পান্ডিত্যপূর্ণ চিঠি লিখতে সাহস করে এমন সাহিত্য বিশারদ পন্ডিত কি বাংলাদেশে আছে? অতঃপর তিনি মাদ্‌রাসায় হেড মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে একদিন মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব কামিল শ্রেনীতে বোখারী শরীফের হাদিসে জিবরাইল ক্লাসে পাঠ দান করিতে ছিলেন। ঐ সময় মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ক্লাশে অংশ গ্রহণ করে মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন ইহসান কি? এর ব্যাখ্যায় মাওলানা নুরুল্লাহ ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। উভয় আরবীতে কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমান প্রয়োগ করতে লাগলেন। অবশেষে মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) কোরআন, হাদীসের আলোকে যথার্থ প্রমান পেশ করলেন। [১৯]

অতঃপর ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) বলেন, তওবা, ইখলাস, মহাব্বত, তাওয়াকুল, জিকর, কাশফ, শোকর, ছবর, সিদক, ফানা, বাকা প্রভৃতি ব্যতীত তাসাওউফের সূত্র গুলো কিছুতে অর্জন করা সম্ভব নয়। মাওলানা নূরুল্লাহ সাহেব বলেন, আমি অনেক পীরের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন পীর সাহেব কোরআন ও হাদীসর যুক্তির মাধ্যমে মারেফাতের সূত্র গুলো প্রমান করতে পারেনি। ১৯৮৬ খ্রিঃ যখন মাদ্‌রাসা নদী গর্ভে নিমজ্জিত হলে তখন তিনি মাদ্‌রাসা পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য একজন কুয়েতীর নিকট আরবীতে একখানা চিঠি লিখেন যা ছিল নিম্নরূপ ঃ [২০]

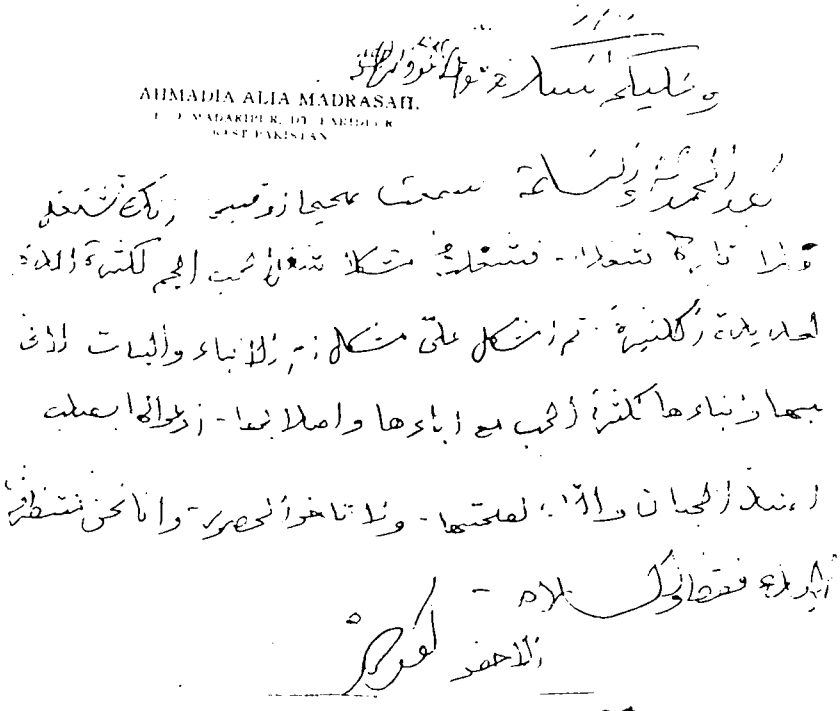

কুয়েতির নিকট লিখিত চিঠি।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দুই খানা পুস্তক রচনা করেন। যথা- ১। মাসায়েলে ছালাসা, ২। জুমার দ্বিধাভাজন।[২১] জুমার দ্বিধাভাজন নামক পুস্তক খানা লিখার পিছনে কারণ ছিল তখন গ্রামে জুমআর নামায বৈধ হবে কি হবেনা এ ব্যাপারে বাহাদুরপুরের মাওলানা মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (র) ও তৎকালীন অন্যান্য উলামাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। পীর দুদু মিয়ার মতে গ্রামে জুমআর নামায জায়েজ নয়। আর অন্যান্য উলামাদের মতে গ্রামেও জুমআর নামায জায়েজ। তখন এই সকল সমস্যা সমাধান ও সাধারন মানুষের মধ্যে ভুল ধারনা দূর করার জন্য তিনি এ পুস্তক লিখেন। এ পুস্তকে তিনি জুমআ ও বেজুমআর একটি সুষ্ঠু সমাধান দেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কারো সাথে আপোষ করেননি। তিনি ছিলেন অকুতোভয় ১৯৭১ খ্রিঃ বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ভারতীয় হিন্দুদের ইশারায় কতিপয় মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপিঠ ছারছীনা দারুসুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা ধবংশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের ধারনা ছিল এ মাদ্‌রাসা ধ্বংশ করলে এদেশে ইসলামী বুনিয়াদ শেষ করা সহজ হবে। মাদ্‌রাসা ধ্বংশের জন্য ২২টি সম্মিলিত বাহিনী কোন একদিন শেষ রাত্রে মাদ্‌রাসা আক্রমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তখন মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ছারছীনা মাদ্‌রাসার ছাত্রদের নিয়ে শত্রু বাহিনীর মোকাবিলা করে মাদ্‌রাসাকে ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করেন।[২২]

ওয়াজ নছিহত ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ১৯৪২ খ্রিঃ খিলাফত লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নছিহত করে লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। তিনি রাজশাহী, বগুরা, রংপুর, চট্রগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, খুলনা, পাবনা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ সহ বাংলাদেশের প্রায় জেলাতেই ওয়াজ নছিহত করার জন্য সফর করতেন ।[২৩] তিনি ওয়াজ নছিহত করার সময় যে সকল বিষয় লোকদের উপদেশ দিতেন তার কতিপয় বিষয় হলো ঃ-

১. তিনি বলতেন নিশ্চয় নামায মানুষকে সমস্ত খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে।

২. যেই নামায খারাপ কাজ হইতে বিরত রাখেনা সেই নামাযি ওয়েল জাহান্নামী ।

৩. এমন ভাবে নামাজ পড়বে যেন আল্লাহকে দেখতে পাও, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহ তোমাদের দেখতে পান এমন ভীতির সহিত নামায পড়বে।

৪. আত্মশুদ্ধি ছাড়া নামায হবেনা ।

৫. তুমি যেমন জিহ্‌বা দ্বারা খাদ্যের স্বাদ গ্রহন করতে পার নাক দ্বারা ঘ্রান নির্ণয় করতে পার, তদ্রুপ আল্লাহকে উপলব্দি করতে পারবে না কেন ? আল্লাহকে উপলব্দি করার এ ইলমকে ইলমে মারেফত বলে। ইলমে শরীয়তের ন্যায় ইলমে মারেফত ও অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. তিনি বলতেন, কম কথা বল, কম খাও, কম ঘুমাও। শয়তান ধোঁকা দিয়ে ঈমানী সম্পদ হরণ করছে।

৭. আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে দুটি পথ দিয়েছেন। একটি হেদায়েতের পথ, অপরটি শয়তানের পথ । শয়তান মানুষের মনে ধোঁকা দেয়। তাই শয়তানের ধোঁকা হইতে পানা চাইতে হবে।[৩৫]

৮. নবীর সুন্নাত আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। হালাল, হারাম, নামাজ, কালেমা, পর্দা-পুশিদা সর্ব স্তরে বাস্ত বায়ন করতে হবে। নারীদের যেমন পর্দা ফরজ পুরুষের জন্যও তেমনি পর্দা ফরজ। নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করা যাবেনা। কারণ ইহা মহা পাপ।

৯. আমলে আউলিয়া বেআমলে দেউলিয়া, আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করুন। তাহলে চলার পথ সহজ হবে।

১০. নিজেকে খুব বড় মনে না করে ছোট মনে করিবে। আর অভিজ্ঞদের নিকট থেকে জেনে নিও।[২৪]

ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সম্পর্কে সমসাময়িক কতিপয় ব্যক্তির অভিমত ঃ

১. **ফুরফুরা শরীফের বর্তমান পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ কাহ্হার সিদ্দিকী আল কোরায়েশী (র) এর অভিমত ঃ**

তিনি বলেন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ছারছিনার পীর মাওলানা নিছার উদ্দিন (র) এর বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তিনি ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারিফতের প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তার দ্বারা আল্লাহ দ্বীনের বহু কাজ করিয়েছেন। তিনি বহু মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে এর মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তার দ্বারা অসংখ্য লোক সৎ পথের সন্ধান পেয়েছেন।[২৫]

২. **ছারছিনার বর্তমান পীর মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মোহেবুল্লাহ সাহেবের অভিমত ঃ**

তিনি বলেন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) ছিলেন ছারছিনার দরবারের প্রবীন খলিফা। তার উছিলায় বহু লোক হেদায়েতর সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। তিনি ছিলেন উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক ওলী।[২৬]

৩. **জমিয়াতুল মোদার্রোছিনের সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবের অভিমত ঃ**

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) একজন উচ্চ স্তরের আরবী ভাষার পন্ডিত ছিলেন। ১৯৮০ খ্রিঃ আমাকে ব্যক্তিগত কাজে আরবীতে একটি চিঠি লিখেন। উক্ত চিঠি পড়ে আমি মুগ্ধ হই। কেননা তাঁর ন্যায় পান্ডিত্য পূর্ণ আরবী চিঠি অদ্যাবধী কারো নিকট হতে পাইনি। তাঁর চিঠির ধরণ আরবী সাহিত্যের হারিরীর ন্যায় সাবলীল ছিল। [২৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪. **হাফেজ মাওলনা আবুবকর শরীফ সাহেবের অভিমত ঃ**

মাদারীপুর আহ্মাদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ হাফেজ মাওলনা আবুবকর শরীফ মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সর্ম্পকে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন ইসলামী সাহিত্য তথা পবিত্র কোরআন, হাদীস,তাফসীর,ইজমা,কিয়াস,ফিকহ্,ক্বিরাত ও ইলমে তাসাওউফের গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী। তিনি ইলমে ছরফ,ইলমে নাহু ও ইলমে বালাগাতের পূর্ণাঙ্গ আলিম ছিলেন। তিনি আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। আরবীতে লিখিত তার পত্রাদি দেখে অনেক আরবী ভাষাভাষি লোক অবাক হত।[২৮]

৫. **মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের অভিমত ঃ**

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে মাদারীপুর এ, আর, হাওলাদার জুট মিলস্রে কর্মকর্তা মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের বলেন, তিনি ছিলেন খোদাভীরু দানবীর ও সাহসী নেতা। তিনি আধ্যাত্মিক ইলমে পারদর্শিতার সাথে সাথে ইলমুল কোরআন, ইলমুল তাফসীর, ইলমুল হাদীস, ইলমুল ফিকহ্ বিষয়ে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরের ওলী ছিলেন। তিনি সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং সকলকে যিকির করতে বলতেন।[২৯]

নূর মোহাম্মদীয়া গবেষনা পরিষদ ঃ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) দীর্ঘ ৬০ বছর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের সাথে সাথে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তার ইন্তিকালের পরে সেই স্মৃতিতে সাধারন মানুষের মাঝে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "নূর মোহাম্মদিয়া গবেষনা পরিষদ"। নিম্নে নূর মোহাম্মদীয়া গবেষণা পরিষদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ ঃ-

১। নূর মোহাম্মদীয়া হাফিজিযা মাদ্রাসা।
২। নূর মোহাম্মদীয়া বৃত্তি বোর্ড।
৩। নূর মোহাম্মদীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়।
৪। নূর মোহাম্মদীয়া কুতুব খানা।
৫। নূর মোহাম্মদীয়া মানব কল্যায়ণ সংঘ।
৬। নূর মোহাম্মদীয়া ছাত্রাবাস ও লিল্লাহ্ বোডিং।[৩০]

পরিশেষে বলা যায় যে, পাখিরার পীর মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র) একজন আধ্যাত্মিক ওলী ছিলেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে লোকদের ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন মাদ্রাসা মসজিদ ও খানকা। তিনি ভোগ, বিলাস, মোহ ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম (মুজাহিদ), নূর পখিরার পীর সাহেব
শাহ্ সূফী আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ (র), অক্টোবর ১৯৯৬ ইং, পৃ. ১৭ ;
দৈনিক ইনকিলাব ১৭ অক্টোবর ১৯৯৬ ইং
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ; দৈনিক ইনকিলাব ১৭ অক্টোবর ১৯৯৬ ইং
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ; দৈনিক ইনকিলাব ১৭ অক্টোবর ১৯৯৬ ইং
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ; "স্মারক গ্রন্থ" পীর সাহেবের কেবলা (র) এর ইন্তিকাল বার্ষিকী ১৯৯৭ ইং
পৃ. ৩০ প্রকাশনায়, নূর মোহাম্মদীয়া পরিষদ
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২ ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ;
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩ ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ;
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫ ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ;
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭ ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ;
১১. মাওলনা নূর মোহাম্মদ (র) এর বড় জামাতা দিগনগর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ
মাওলানা আবুল খায়ের হতে বাচনিক বিবরণ।
১২. মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৪১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯
১৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৬ ইং
১৫. মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৬. স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
১৭. দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ অক্টোবর ১৯৯৬ ইং
১৮. স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২১. মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২৪. স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৮
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বৃহত্তর ফরিদপুরে উলামা ও মাশাইখের জীবন ও কর্ম
(১৯০১-১৯৮০ খ্রিঃ)

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র)

(১৯০৩-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বিংশ শতাব্দীতে যে সকল উলামা ও মাশাইখ ইসলাম প্রচার করেন তাদের মধ্যে মওলানা আব্দুল আজিজ (র) অন্যতম। তিনি ইসলামের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার গরহারডাঙ্গা এলাকায় মাদ্‌রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের কোরআন ও হাদীস শিক্ষার প্রতি অনুপ্রানীত করে তোলেন। তিনি হিন্দু অধ্যুষিত ঐ এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আহবান জানান।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) এর প্রপিতামহ দৌলত মামুন বর্তমান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার চৌঠাই গ্রামে বাস করতেন।[১] তাঁর ঔরসে (আনুমানিক ১৮৩০খ্রিঃ) উজির মামুন ও জহের মামুন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। জহের মামুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মফিজ উদ্দীনে পরহেজগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন। যার কারণে সকলে তাঁকে মুন্সি খেতাবে ভূষিত করেন। মুন্সি মফিজ উদ্দীনের ঔরসে ১৯০৩ খ্রিঃ বাংলা ১৩০৯ সনে ফাল্গুন মাসের কোন এক শুক্রবার সোবহে সাদিকের সময় মওলানা আব্দুল আজিজ (র) জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর মাতার নাম আমেনা বিবি।[২]

নামকরণ ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ভূমিষ্ঠ হলে পিতা মুন্সি মফিজউদ্দীন পুত্রের নাম রাখেন ফকীর উদ্দীন। [৩] কিন্তু মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে শিক্ষকগণ তাঁর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন আব্দুল আজিজ। পরবর্তীতে তিনি 'মাওলানা আব্দুল আজিজ' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি গরহরডাঙ্গা 'জামিআয় ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম' মাদ্‌রাসার মোহতামিমের (অধ্যক্ষ) দায়িত্ব পালন করেন। সকলে তাকে চৌঠাই ও মোহতামিম হুজুর নামে সম্বোধন করতেন। [৪]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) কে ১৯০৭ খ্রিঃ তাঁর পিতা মুন্সি মফিজ উদ্দীন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ছবক দেন। [৫] পিতার নিকট তিনি আম পারাসহ কোরআন শরীফের প্রথম দশ পারা পাঠ করেন।[৬] অতঃপর পাশ্ববর্তী গ্রামের ক্বারী মুন্সি আব্দুল লতিফ সাহেবের মক্তবে ভর্তি হয়ে তাঁর নিকট বিশুদ্ধ করে ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ ও নামাযের নিয়মাবলী পড়া শেষ করেন।।[৭] বার বৎসর বয়সে জুমার নামাযসহ সকল প্রকার নামাযের ইমামতি করার মত যোগ্যতা অর্জন করেন।[৮] ১৯১৫ খ্রিঃ পিতার আকস্মিক ইন্তিকালে লেখা পড়া বন্ধ না করে মাতার উৎসাহে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য নিজ গ্রাম ত্যাগ করে খুলনা জেলার কচুয়া থানার বটতলা মদ্‌রাসায় ভর্তি হন। [৯] উক্ত মাদ্‌রাসায় শিক্ষক মুন্সি আঃ গফুর সাহেবের নিকট তিনি মেফতাহুল জান্নাত ও গোলেস্তা কিতাব অধ্যয়ন করেন। পরে মোল্লার হাট মাদ্‌রাসায় কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ১৯১৭ খ্রিঃ মাদারীপুর জিলার শিবচর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে গোলেস্তা, বোস্তা ও মিজান কিতাব পড়া শেষ করেন।[১০] শিবচর মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯২২খ্রিঃ পযর্ন্ত উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করে হেদায়তুন্নাহু (৮ম শ্রেনী) পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। [১১]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ খ্রিঃ বাংলাদেশের স্বনামধন্য মাদ্‌রাসা পিরোজপুর জেলার 'ছারছিনা দারুস্ সুন্নাত আলিয়া' মাদ্‌রাসায় জামাতে চাহারম (নবম শ্রেণী) তে ভর্তি হন এবং চার বছর অধ্যয়ন করে ১৯২৮ খ্রিঃ জামাতে উলা (ফাজিল) পাশ করেন।[১২] অতঃপর কিছুদিন বাড়িতে অবস্থান করে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) প্রতিষ্ঠিত খুলনা জিলার গজালিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯২৯ খ্রিঃ দাওরায় হাদীস জামাতে "ছিয়াহ্ সিত্তাহ" কিতাব সমূহ পড়া শেষ করেন। [১৩] তিনি ১৯২৯ খ্রিঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) 'ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসায়' অধ্যয়ন কালে আধ্যাত্মিক শিক্ষার গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মওলানা নিছার উদ্দীন (র) এর নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবক নেন। [১৪] অতঃপর ছারছিনা মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে মাওলানা শামছুল হক (র) এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁর নিকট হতেও তাসাওউফের বায়াত গ্রহন করেন। [১৫] তিনি মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর নির্দেশে ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর থানা ভবন দরবারে রমজানসহ ৪০ দিন অবস্থান করে তাসাওউফ শিক্ষায় পরিপূর্নতা অর্জন করেন।[১৬] তিনি মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র), মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজী হুজুর (র) ও মাওলানা আরিফ বিল্লাহ (র) সহ অনেক বিখ্যাত আলিমদের নিকট হতে তাসাওউফ শিক্ষায় পরিপূর্নতা অর্জন করেন। তবে তিনি মাওলানা শামছুল হক (র) কে তাসাওউফের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৭]

খিলাফত লাভ ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) হিজরী ১৩৩৭ সনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এর দরবারে ৪০ দিন অবস্থান করে ইলমে মারেফাতের বিভিন্ন বিষয় গভীর জ্ঞান লাভ করলে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) তাঁকে খিলাফতের অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাওলানা আবদুল আজিজ (র) মাওলানা শামছুল হক (র) এর প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন। মাওলানা শামছুল হক (র) এর ইন্তিকালের পরে মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেজী হুজুর (র) এর নিকট হতে খিলাফত লাভ করেন। [১৮]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) দুইটি বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক ছেলে আঃ রউফ ও এক মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে।[১৯] প্রথম স্ত্রীর ইন্তিকাল করলে দ্বিতীয় বিবাহ করেন।[২০] দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে চার ছেলে হাফেজ আবু ছাইদ, মৌলভী মোহাম্মদ হানিফ, মাওলানা আবু মূসা, মৌলভী আবুল খায়ের ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহন করেন। [২১]

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ্ব পালন ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) হিজরী ১৩৬০ সনে প্রথম হজ্জ্ব আদায় করেন। [২২] প্রথম হজ্জ্ব পালনের কয়েক বছর পরে গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসায় মোহতামিমের দায়িত্ব পালন কালে ১৯৩৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় বার হজ্জ আদায় করেন। তিনি দ্বিতীয় বার হজ্জ্ব পালন কালে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর লিখিত একখানা চিঠি নিয়ে যান। যা তৎকালীন সৌদি আরবের বিখ্যাত আলিম মাওলানা সৈয়দ আলবী (র) ও সৌলতিয়া মাদ্‌রাসার আলিমদের উদ্দেশ্যে লেখা ছিল। এ চিঠির ফলে মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) সৌদি আরবের আলিমদের সাথে পরিচিত হন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও মসজিদে নববী যিয়ারত করার সুযোগ পান। [২৩]

ইন্তিকাল ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ১৯৩৭ খ্রিঃ হতে ১৯৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৭ বছর গওহরডাঙ্গা জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় মোহতামিম (অধ্যক্ষ) এর দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৯৪ খ্রিঃ ১৬ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার রাত ১০টা ৫মিনিটের সময় গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ইন্তি-কাল করেন।[২৪] ১৭ সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার আছর নামায শেষে গওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে ও হেফজ খানার দক্ষিণ পার্শ্বে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) এর কবরের পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[২৫]

কর্ম জীবন ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ১৯২৮ খ্রিঃ ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা হতে জামাতে উলা (ফাযিল) পাশ করে ১৯৩১ খ্রিঃ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খুলনা জেলার গজালিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষক ও পরবর্তী বছর মোহতামিম (অধ্যক্ষ) পদে দায়িত্ব পালন করেন।[২৬] অতঃপর ১৯৩০ খ্রিঃ নিজগ্রাম চৌঠাইতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে ১৯৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত মাদ্‌রাসার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। গ্রাম্য দ্বন্দের কারণে উক্ত মাদ্‌রাসা হতে বিদায় নিয়ে ১৯৩৭ খ্রিঃ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া থানার গরহারডাঙ্গা এলাকায় জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন এবং ১৯৯৪ খ্রিঃ ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[২৭]

ধর্মীয় কর্ম ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মের চেয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ ৬৫ বছর কর্মজীবনে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও মসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেন। নিম্নে তাঁর ইসলাম প্রচারে ধর্মীয় কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ১৯৩৩ খ্রিঃ নিজ গ্রাম চৌঠাইতে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] তিনি ১৯৩৩ খ্রিঃ হতে ১৯৩৭ খ্রিঃ পযর্ন্ত উক্ত মাদ্‌রাসার পরিচালনা করেন।[২৯] কিন্তু গ্রাম্য মতবিরোধের কারণে উক্ত মাদ্‌ারাসা হতে তিনি মোল্লারহাট থানার উদয়পুর মাদ্‌সায় শিক্ষক পদে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু উক্ত মাদ্‌রাসায় চলে যাওয়ার পূর্বে মাওলানা শামছুল হক (র) এর মতামত জানতে চাইলেন। তখন মাওলানা শামছুল হক (র) তাঁর নিজ গ্রামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করেন। তখন মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ওস্তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য গরহরডাঙ্গায় মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ খ্রিঃ মাওলানা শামছুলহক (র) মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) সহ গ্রাম এলাকার সকল মুরুব্বিদের আহবান করে একটি সভা করেন।[৩০] সভায় নিজ এলাকায় একটি কোরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার কথা ব্যক্ত করলে সকলে তাতে রাজি হলেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। ঐ সভার দিনই মাওলানা শামছুল হক (র) নিজ বাড়ীর মস্‌জিদকে কেন্দ্র করে মাওলানা শামছুল হক (র) দ্বারা মাদ্‌রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম চলতে থাকলে ১৯৩৮ খ্রিঃ বাংলা কার্তিক মাসের কোন এক শুক্রবার ঐ এলাকার নিবাসী মোঃ রঈছউদ্দীন মিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ কাঠা জমি দান করেন।[৩১] মোঃ রঈছউদ্দীন মিয়ার জমিতে মাদ্‌রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত ঘর বর্তমান 'জামেআ ইসলামিয়া দারুল উমূল খাদেমুল ইসলাম' নামের মাদ্‌সার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। এক বছরের মধ্যে উক্ত মাদ্‌রাসা 'নাহুমীর' ও 'হেদায়াতুন্নাহু' পর্যন্ত পাঠ দান শুরু করেন।[৩২] ১৯৪৪ খ্রিঃ মেশকাত শরীফ জামাত পর্যন্ত পাঠ দান শুরু করেন।[৩৩] ১৯৪৫ খ্রিঃ দাওরায় হাদীস (কামিল) জামাত পর্যন্ত চালু করেন।[৩৪]

মাদ্‌রাসার শিক্ষা বিভাগ ঃ

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষা বিভাগকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় । নিম্নে বিভাগগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১. মক্তব বিভাগ ঃ- প্রাথমিক আরবী পাঠ দান বিভাগ।

২. হিফজুল কুরআন বিভাগ ঃ- কোরআন শরীফ হিফজ (মুখস্থ) করা বিভাগ।

৩. ইলমে ক্বিরাত বিভাগ ঃ- কোরআন বিশুদ্ধ করে তিলাওয়াত বিভাগ।

৪. বাংলা মক্তব বিভাগ ঃ- এ মাদ্‌রাসায় আরবী পাঠ দানের সাথে সাথে প্রাথমিক বাংলা বিষয় সমূহ পাঠ দান করা হয়।

৫. কিতাব বিভাগ ঃ- আরবী ব্যাকরণ ব্যতীত কোরআন, হাদীস, ফিকহ্, তাফসীরসহ বিভিন্ন কিতাব পাঠ দান করা হয়।

৬. ফতোয়া বিভাগ ঃ- কোরআন হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মাসআলার সমস্যা সমাধানের জন্য ফতোয়া বিভাগ খোলা হয়েছে।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল বিষয় ছাড়া এখানে রয়েছে সাংবাদিকতা, আর্ট ও বক্তৃতা প্রশিক্ষণ বিভাগ। এখানে কোরআন, হাদীস পাঠ দানের সাথে সাথে আদর্শ নৈতিক চরিত্র গঠন করে প্রতিটি ছাত্রকে সমাজের সেবক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) এ মাদ্‌রাসার দায়িত্ব পালন ব্যতীত ঐ এলাকায় অসংখ্য মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

দাওয়াতে তাবলীগে আত্মনিয়োগ ঃ

মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) ১৯৬৬ খ্রিঃ মাওলানা শামছুল হক (র) এর অনুমতি নিয়ে তাবলীগের দাওয়াতে ৪০ দিনের চিল্লায় যান। পরবর্তীতে ঈমানকে শক্তিশালী করর জন্য একত্রে ১২০ দিনের তিন চিল্লা দেন। তিনি গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসাকে কেন্দ্র করে নিয়মিত তাবলীগের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। বর্তমানেও গরহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসা কেন্দ্রীক তাবলীগের কার্যক্রম চালু রয়েছে। তিনি তাবলীগী দাওয়াত ব্যতীত ওয়াজ মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ পরিচালনা করেন। [৩৬]

অবশেষে বলা যায় যে, মাওলানা আব্দুল আজিজ (র) একজন ধর্মীয় প্রচারক ছিলেন। তিনি অসংখ্য আলিমকে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটান। তিনি গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসাকে ধর্মীয় প্রচারের কেন্দ্রে পরিনত করেন।

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. আহ্‌কর আব্দুর রাজ্জাক ফরিদপুর, গওহরডাঙ্গা মাদ্‌রাসার মেহতামে সাবেবের জীবনী, আল্লামা শামছুল হক একাডেমী, গোপালগঞ্জ। ১৯৯৪ ইং, পৃ. ৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬, ৬৭

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, ২৬

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, ৩৪

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, ৪০

৩৫. গওহারডাঙ্গা মাদ্‌রাসার ৬৫তম বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১৯৯৯-২০০০ ইং)

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, ৪০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র)

(১৯০৬-১৯৮৯ খ্রিঃ)

বিংশ শতাব্দীতে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার হিন্দু অধ্যুষ্যিত এলাকায় ইসলামের আলোর প্রদীপ জালিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় পথের নিয়ে আসার জন্য যে সকল ওলামা ও মাশায়েখ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে তাদের মধ্যে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ এলাকায় ধর্মীয় সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য নিজ এলাকায় একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র) ১৯০৬ খ্রিঃ নভেম্বর মাসের কোন এক বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার পিঙ্গলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহাম্মদ আফাজ উদ্দিন মোল্লা, মাতা মোসাম্মৎ বানেছা খাতুন। মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলীর পূর্ব পুরুষ ১৬০০ শতকের শুরুর দিকে আফগানিস্তান হতে কাশিয়ানী এলাকায় এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ইসলামী দাওয়াতী কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[১]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলীর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন তার জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা মোহাম্মদ ইমান আলীর নিকট। পরবর্তীতে তৎকালীন রীতি-নীতি অনুযায়ী হিন্দু মন্ডুপে ভর্তি করা হয়। তিনি ১৮১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত হিন্দু মন্ডুপে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২]

উচ্চশিক্ষা ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য উনিশো আঠারো খ্রীষ্টব্দে ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'দারুল উলূম দেওবন্দ' মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় ১৯২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত আরবী, ফার্সী, উর্দু সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিঃ দেওবন্দ থেকে ভারতের বটতলা মাদ্‌রাসায় দাওরায় হাদীস শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৩০ খ্রিঃ দাওরায় হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজী হুযুরের (র) নিকট হতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বায়াত গ্রহণ করেন।[৪]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র) ১৯৪০ খ্রিঃ পার্শ্ববর্তী গ্রাম বড়াশুর নিবাসী জনাব মোহন সরদারের কন্যা মোসাম্মৎ যোহরা খাতুনকে বিবাহ করেন। তিনি ৩ ছেলে ও ১ কন্যার জনক। [৫]

কর্মজীবন ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী ১৯২৮ খ্রিঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজ এলাকায় ১৯৩০ খ্রিঃ একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমেই কর্মজীবন অতিবাহিত করেন।[৬]

ইন্তিকাল ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র) দীর্ঘদিন ধর্মীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন শেষে ১৯৮৯ খ্রিঃ ৫ই মে ইন্তিকাল করেন। তাকে নিজ পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। [৭]

সামাজিক কর্ম ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র) নিজ এলাকায় ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সামাজিক কাজও পরিচালনা করতেন। তিনি কোরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধান দিতেন। [৮]

ধর্মীয় কর্ম ঃ

মাওলানা মোহাম্মদ খোরশেদ আলী (র) জ্ঞানের আলো বিস্তারের জন্য নিজ এলাকায় ১৯৩০ খ্রিঃ পিঙ্গলিয়া মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচার কার্য চালাতেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি হিন্দু জমিদারদের দ্বারা নিপিড়ীত হতেন। [৯]

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

মাওলানা খোরশেদ আলী (র) সরাসরি কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি 'হেয্‌বুল্লাহ্ সংগঠন'-এর সমর্থক ছিলেন। [১০]

পরিশেষে বলা যায় যে, মাওলানা খোরশেদ আলী একজন খোদাভীরু তাকওয়াবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান সরদার, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বড়াশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কাশিয়ানী। তাঁর শ্রুত বাচনিক বিবরণ।

২. মোহাম্মদ নাজির আহম্মেদ সরদার, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র শিক্ষক কাশিয়ানী গিড়ীশ চন্দ্র বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়। তাঁর শ্রুত বাচনিক বিবরণ।

৩. সার্টিফিকেট থেকে সংগৃহিত।

৪. শাহাদৎ হোসাইন, (অবঃ লেফটেন্যান্ট) সিনিয়র শিক্ষক, আরামবাগ হাই স্কুল ও কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। তাঁর শ্রুত বাচনিক বিবরণ।

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

৮. এখলাসুর রহমান মোল্লা, অবঃ সুবেদার বি.ডি.আর, পিঙ্গলিয়া, কাশিয়ানী। তাঁর শ্রুত বাচনিক বিবরণ।

৯. প্রাগুক্ত

১০. মেজর আকরাম হোসেন বরাশুর, কাশিয়ানী। তাঁর শ্রুত বাচনিক বিবরণ।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) (পীর সাহেব আটরশি)

(১৯১৩-২০০১ খ্রিস্টাব্দ)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ইসলাম প্রচার, ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, আর্তমানবতার সেবা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল মহান সাধকের আগমন ঘটে তাদের মধ্য মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) একজন। তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার আটরশি আগমন করে হিন্দু সভ্যতা থেকে মুসলমানদের আল্লাহর পথে আহবান করেন এবং এলাকায় গড়ে তোলেন মসজিদ, মাদ্‌রাসা সহ অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। মানবতার সেবায় গড়ে তোলেন হাসপাতাল। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন স্কুল কলেজ মাদ্‌রাসা। দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষের পাশে এসে দাড়াঁন। ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে গড়ে তোলেন অগনিত ভক্ত-মুরীদ ও জাকেরীন। তিনি আটরশি দরবারের নাম

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহর (র) জম্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে তার মৃত্যু কালীন বয়সের হিসাব অনুযায়ী তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে শেরপুর জেলার অন্তর্গত পাকুরিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন বলে ধারনা করা হয়। তার পিতা মোঃ আলীমুদ্দীন, পিতামহ মোঃ শমিরউদ্দীন। পরপিতামহ মোঃ বশির উদ্দিন। মোঃ বশির উদ্দিন শেরপুর জেলার পাকুরিয়া নামক স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। [২]

শিক্ষা জীবন ঃ

শৈশব মোহাম্মদ হাসমাতুল্লাহ্‌র (র) মাতা ইন্তিকাল করেন। অতঃপর দাদীর স্নেহে লালিত পালিত হন। মোহাম্মদ হাশমাতুল্লাহ্ (র) পাঁচ/ছয় বছর বয়সে নোয়াখালী জেলার নিবাসী মাওলানা শরাফত আলী সাহেবের নিকট আরবী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহন করেন। তিনি আরবী শিক্ষার সাথে সাথে বাংলা, ইংরেজী, ফার্সী ও শিখতে শুরু করেন। প্রখর স্মৃতি শক্তি গুনে অল্প দিনে আরবী, ফার্সী বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলের লেখাপড়াও চালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি নান্দিনা হাই স্কুল থেকে এস, এস, সি পাশ করেন।[৩] এস, এস, সি পাশের মাধ্যমেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

পাবনার এনায়েতপুর গমন ঃ

মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ্‌র (র) বয়স যখন আট বছর (বাংল্লা ১৩২৮ বঙ্গাব্দ), তখন বাংলা ও আসামের তৎকালীন প্রখ্যাত পীর পাবনার মাওলানা শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী (র) শেরপুর জেলার পাকুরিয়া গ্রামে আগমন করে মোঃ আলী মুদ্দিনের বাড়িতে অবস্থান করেন।[৪] পীর শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী বালক মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহকে দেখে তাঁর পিতা মোঃ আলী মুদ্দিনকে পুত্রের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তার দরবারে পেশ করার আবেদন করেন। তখন পিতা মোঃ আলী মুদ্দিন শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী এনায়েতপুরীর (র) আবেদনে সম্মত হন। পরবর্তীতে বাংলা ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মোঃ আলীমুদ্দিন স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ হাসমতুল্লাহ (র)কে এনায়েতপুর পীরের দরবারে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য সর্মাপন করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

মোহাম্মদ হাসমতুল্লাহ (র) দীর্ঘ ত্রিশ বছর শাহ্ সুফী এনায়েতপুরীর (র) দরবারে অবস্থান করে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। একদা শাহ্ সূফী এনায়েতপুরী (র) মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) কে ডেকে বলেন "যদি আল্লাহকে পেতে চাও তবে ত্যাগী হও"।[৬] তখন হাসমতূল্লাহ (র) সকল প্রকার অর্থ সম্পদের লোভ- লালসা, হিংসা- বিদ্বেষ, কাম- ক্রোধ ত্যাগ করে কঠোর সাধনা করে তাসাওউফের প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ স্তরের কামালিয়াত অর্জন করেন। তখন শাহ্ সূফী এনায়েতপুরী মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ (র) তাকে ইলমে মারিফতের আভাস দিয়ে বলেন, ফানা ও বাকার স্তর জয় করে হেদায়াতের জন্য প্রস্তুত হও। তখন তিনি কঠোর ইবাদত ও রিয়াদাতের মাধ্যমে ইলমে মারিফতের গভীর জ্ঞান লাভ করেন।[৭]

আটরশি গমন ঃ

মোহাম্মদ হাসমতুল্লাহ (র) শাহ্ সূফী মাওলানা মোঃ ইফনুছের (র) দরবারে অবস্থান কালে প্রচুর অর্থসংকটে পড়েন। তখন শাহ্ সূফী এনায়েতপুরী (র) তাঁকে চাকুরীর খোঁজে কলকাতায় প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় পীরের নির্দেশ পালনের জন্য কলকাতায় ৬ নং হায়াত খান লেনে তার মামাত ভাই মৌলভী আবদুস সামাদ সাহেবের বাসায় কিছু দিন অবস্থান করে চাকুরীর সন্ধান করেন। কিন্তু কোন চাকুরীর সন্ধান পেলেন না। সেখানে কিছু দিন অবস্থান কালে ফরিদপুর জেলার আটরশি নিবাসী জনাব মুহসিন উদ্দিন খাঁনের সাথে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পরিচয় হয়।[৮] মোহাম্মদ হাসমতুল্লাহ (র) চাকুরী না পেয়ে জনাব মুহসিনউদ্দিন খানকে সঙ্গে নিয়ে পাবনার এনায়েতপুরে স্বীয় পীরের দরবারে ফিরে আসেন। জনাব মুহসিন উদ্দীন খাঁন এনায়েতপুর এসে শাহ্ সূফী এনায়েতপুরীর (র) মুরীদ হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ হাশতুল্লাহ (র) জনাব মুহসিনউদ্দীন খাঁনের সাথে ফরিদপুর জেলার আটরশিতে বেড়াতে যান। তখন আটরশি এলাকা জমিদারদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রোজা, নামায, ঈদের নামায প্রভৃতি সর্ম্পকে মুসলমানরা অজ্ঞ ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তাই ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান ছিল না। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা দিত এনং হিন্দুদের ধর্মীয় পূজা-পার্বনে যাওয়ার জন্য সকল মুসলমানদের উৎসাহিত করত।[৯] মোহামদ হাশমতুল্লাহ (র) বলেন, 'আমি যে দিন সর্ব প্রথম ফরিদপুরের আটরশি অবস্থান করি সেদিন ছিল ঈদের দিন। এলাকার মুসলমনগণ ঈদের নামাযে অভ্যস্ত ছিলনা। তাই পাঁচ জন লোক নিয়ে আমি ইমাম হয়ে ঈদের নামায আদায় করি। অতঃপর আটরশির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা দেখে মমার্হত হই। অতঃপর সেখানে দুইদিন অবস্থান করে জনাব মুহসিন উদ্দীন খানকে সঙ্গে নিয়ে পূনরায় পাবনার এনায়েতপুর ফিরে এসে শাহ্ সূফী ইফনুছ আলী (র) কে ফরিদপুর আটরশির ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি'।[১০]

খিলাফত লাভ ঃ

মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ্র (র) নিকট ফরিদপুর জেলার আটরশির ধর্মীয় অবস্থা অবগত হয়ে শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী (র) মোহাম্মদ হাশমদুল্লাহ (র) কে বললেন, "তোমার জন্য আর চাকুরীর প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য এক উচ্চ স্তরের চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন"। এ বলে শাহ্ সূফী মাওলানা ইউনুছ আলী (র) কতিপয় উপদেশসহ মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) কে আটরশি প্রেরণ করেন।

তিনি উপদেশে সহকারে মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) কে বলেন, "সারা পৃথিবী ব্যাপী কঠিন মুছিবত আসবে আকাশ বাতাসে বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা । তখন একমাত্র মুমিন ছাড়া কারো বাঁচার উপায় থাকবেনা । আমি তোমাকে আল্লাহর রহমতের চাঁদরের নিচে রেখে গেলাম, তোমাকে যারা ভালবাসবে তারা আল্লাহর রহমতে চাঁদরের নিচে ঢাকা থাকবে"।[১১] তিনি আরো বলেন -"তুমি ফরিদপুরে যাও সেখান থেকেই ইসলামের দাওয়াত শুরু কর এবং সত্য দ্বীনের বিজয় নিশান উড়াও ; যে পতাকা একদিন সারা দেশসহ বিশ্বের বুকে বিজয় হবে। কারণ ফরিদপুরে তোমার দাদা হুজুর শাহ্ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (র) এর স্মৃতি বিজড়িত বরকতময় স্থান"।[১২] এসকল উপদেশের মাধ্যমে শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী (র) মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) কে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আটরশি প্রেরণ করেন। মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) এ মহান দায়িত্ব পেয়ে ফরিদপুরে এসে ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। আর এ কারণেই তাঁকে শাহ্ সূফী ফরিদপুরী নামে ভূষিত করা হয়।

বৈবাহিক জীবন ঃ

মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ১৬/১৭ বছর বয়সে মায়ের অনুরোধে নিজ এলাকায় সর্ব প্রথম বিবাহ করেন।[১৩] অতঃপর ১৯৩৮ খ্রিঃ আটরশীর নিবাসী জনাব মুহসীনউদ্দীন খাঁনের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা জনাব মাওলানা আলতাফ খাঁনের কন্যাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করেন। এ বিয়ের কারণে প্রথম স্ত্রী অসন্তোষ্ট হন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুই কন্যা জন্ম গ্রহন করে। দ্বিতীয় স্ত্রী ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তাকে আটরশির জাকের ক্যাম্পে সমাহিত করা হয়। অতপর তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর ইন্তিকালের চার বছর পূর্বে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আটরশীতে তৃতীয় বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে দুই ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম গ্রহন করে। বড় ছেলে মাহ্ফুজুল হক মোঃ বাকী বিল্লাহ যিনি বর্তমানে পিতার স্থলাভিষিক্ত। দ্বিতীয় ছেলে মোস্তফা আমীর ফয়সাল তিনি বর্তমানে তরীকা প্রচারক ও জাকের ট্রাস্টের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত।[১৪]

ইন্তিকাল ঃ

মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) দীর্ঘ ৬৪ বছর ফরিদপুর জেলার আটরশি এলাকায় দ্বীনের প্রচার করে ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটান এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ১ল মে রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর ঢাকার বনানীস্থ নিজ বাসভবনে বাধর্ক্যজনিত কারণে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে আটরশির জাকের ক্যাম্পে নিজ হুজরাখানার উত্তর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮বছর।[১৫]

সামাজিক কর্ম ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) ইসলাম প্রচার,সাহিত্য চর্চা ও ধর্মী প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক কর্মে অগ্রনি ভূমিকা পালন করেন। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল নির্মাণ ঃ

মানবতার সেবাই আল্লাহর রহমত লাভের সর্বোত্তম উপায়। শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) এ কথা শুধু প্রচারই করেননি। তিনি আটরশির মানুষের সেবার জন্য তিনি জাকের মঞ্জিলের উত্তর পশ্চিম পাশে স্থাপন করেন একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। বর্তমানে এটা ৬০০ শত শয্যা বিশিষ্ট এক আধুনিক হাসপাতাল, যার ১৫০ শয্যা চালু হয়েছে এবং প্রতিদিন বহুলোক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে হাসপাতালটি চার তলা বিশিষ্ট এবং কয়েক একর জমির উপর স্থাপিত। এ হাসপাতালে রয়েছে চিকিৎসার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ ডাক্তার।[১৬]

আটরশি লোকদের বিভিন্ন সংবাদ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য জাকের মঞ্জিলের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ডাক ঘর স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১৭] আটরশিতে আগত বিভিন্ন মুরিদের টাকা পয়সা নিরাপদে গচ্ছিত রাখা ও লেনদেনের সুবিধার জন্য জাকের মঞ্জিলের মূল ভবনের নিকটে একটি সোনালী ব্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।[১৮]

মানব সেবা ঃ

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ফরিদপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুরসহ জেলার প্রধান প্রধান থানাগুলো বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। মানুষের আশ্রয় নেওয়ার মত কোন স্থান ছিল না। খাবার সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অনেক গবাদিপশু পানিবন্দি হয়ে মারা যায়। এরুপ দুর্দিনে আটরশির পীর সমস্ত এলাকাবাসীকে আল্লাহর উপর ভরসা করার আহবান জানান এবং বন্যার্ত অসহায়দের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। তিনি জাকের মঞ্জিলের পক্ষ হতে পাঁচ হাজার মণ চাল ও তরিতরকারি বন্যার্তদের মাঝে বন্টন করেন।[১৯] জাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদ্‌রাসায় অগণিত পরিবারকে আশ্রয় দেন এবং খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সারা দেশে ১৯৩ টি ত্রান শিবির খুলে ৫৩,০০০ মণ চাল, ১৪,০০০ মণ আটা, প্রায় দুলাখ লুঙ্গি ও শাড়ি বিতরন করেন। তিনি ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ত্রান তহবিলে তিন লক্ষ টাকা দান করেন।[২০] ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় ৬৩ টি লঙ্গরখানা তৈরী করে খাবার বিতরনের ব্যবস্থা করেন।[২১] বন্যা শেষে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পূর্ণবাসনের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাঠ তৈরী, স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, সেতু নির্মাণে সহায়তা করেন।[২২] এভাবে আটরশির পীর বন্যাদূর্গতদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

ধর্মীয় কর্ম ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাসমতুল্লাহ (র) বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। নিম্নে তাঁর কতিপয় ধর্মীয় কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

জাকের ক্যাম্প স্থাপন ঃ

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) শাহ্ সূফী ইউনুছ আলী (র) এর নির্দেশে ফরিদপুর জেলার আটরশিতে আগমন করে সর্ব প্রথম মহসিন উদ্দীন খান সাহেবের বাড়ির পার্শ্বে আট টাকা মূল্যে একখানা কুড়ে ঘর ক্রয় করে উহাকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু করেন।[২৩] ইসলামের দাওয়াতের ফলে দিন দিন মুরিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বাংলাদেশ ব্যাপী প্রত্যেক এলাকায় এ তরিকার কার্যক্রম শুরু করেন। ফলে জাকেরদের সাহায্য-সহযোগিতায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে কুড়ে ঘরের পরিবর্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন "বিশ্ব জাকের মঞ্জিল" এখানে প্রত্যেহ রাত ৩টা হতে পরবর্তী দিন ১২টা পর্যন্ত চলে শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত ও মারফতের প্রশিক্ষণ। যার ফলে সকল মুরীদ দ্বীনের সঠিক দিক নির্দেশনা জানতে পারে। আর জাকের মঞ্জিলে দুর দুরান্ত হতে আগত সকল জাকেরানদের জন্য রয়েছে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।[২৪]

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) শুধু মুরীদানদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি ইলমে দ্বীনের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মোতাবেক ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১৬ পৌষ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী কর্তৃক জাকের মঞ্জিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন 'বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আলিয়া মাদ্‌রাসা'।[২৫] এ মাদ্‌রাসায় প্রথম শ্রেণী হতে কামিল (টাইটেল) শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ মাদ্‌রাসায় কোরআন, হাদীস, বাংলা, ইংরেজী শিক্ষার সাথে সাথে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বি,এন,সি,সি) এর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামুলক করেন। বর্তমানে মাদ্‌রাসাটি তিন তলা বিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং একটি ২৫০ফুট অপরটি ৩৫০ফুট। মাদ্‌রাসার নিচতলায় ছাত্রদের জন্য ছাত্রবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা শ্রেনী কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে।[২৬] এখানে একটি হিফজখানাও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[২৭]

স্কুল প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সদরপুর "বিশ্ব জাকের মঞ্জিল হাই স্কুল" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ।[২৮] তিনি সদরপুর ডিগ্রী কলেজের উন্নায়নে অর্থ দ্বারা কলেজের উন্নায়ন মুলক কাজে সহযোগিতা করেন।[২৯]

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ(র) ১৯৮৬ খ্রিঃ ১২ রবিউল আউয়াল ২৬ নভেম্বর বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ইসলামী স্থাপত্য ও আধুনিক কারুকার্য খচিত পাথরে ঢালাই করে এক গম্বুজ ও চার মিনার বিশিষ্ট দ্বিতল একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[৩০] মসজিদের নিচে রয়েছে মার্কেটের ব্যবস্থা। বর্তমানে মসজিদের মূল ভবনের কাজ শেষের দিকে। মসজিদটি ২০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫০ ফুট প্রস্থ। মিনার ও অজুখানার কাজ বাকি রয়েছে। মিনারের উচ্চতা নির্ধারন করা হয়েছে ১০১ ফুট। উক্ত মসজিদ ছাড়া তিনি ১৯৮৫ খ্রিঃ ভাঙ্গা থানার জানপুর মোড়ে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একতলা বিশিষ্ঠ একটি মসজিদ নির্মান করেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

বাৎসরিক উরশ শরীফ ঃ

বিশ্ব জাকের মঞ্জিল আটরশি প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শনিবার হতে মঙ্গলবার পর্যন্ত একাধারে চার দিন উরশ পালন করা হয়। উক্ত চার দিন উরশ পালনের উৎস পাবনার এনায়েতপুরী মাওলানা ইউনুছ আলী (র)-এর জন্ম দিবস শনিবার, ওফাত দিবস রবিবার ও সমাহিত দিবস সোমবার। উক্ত তিনদিন এনায়েতপুরী আত্মার সওয়াবে রেসানীর উদ্দেশ্যে ওরশ পালন করা হয়। বাকি মঙ্গলবার চতুর্থ দিবস মাওলানা ইউনুছ আলী (র) এর পিতা সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (র) এর বেছাল দিবস উপলক্ষে উরশ পালন করেন। এছাড়া ১৮ই ফাল্গুন ফাতেহা শরীফ পালন করেন । উক্ত অনুষ্ঠান ছাড়া পবিত্র আশুরা দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ), শবে মিরাজ, শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষ্যে বিশেষ ধর্মী অনুষ্ঠান পালন করেন। এসকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূল (র) এর গুনগান বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে সৎপথে পরিচালনায় উৎসাহিত করেন।[৩২]

খানকা মাধ্যম ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) পীর মুরীদ সম্পর্কের মাধ্যমে মুরীদদের (যারা হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করে) কিছূ উপদেশ দেন ও ধর্মীয় বিধি বিধান পালনের আদেশ দেন। এ সকল মুরীদানদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে অসংখ্য খানকা শরীফ। যার মাধ্যামে এলাকার মুরীদগণ একত্রিত হয়ে জিকির, ওয়াজ-মাহফিল ও ধর্মীয় আলোচনা করেন।

উপদেশ বাণী ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কিছু নছিহত করে যান। তিনি নছিহতে বলেন ঃ-

(১) একমাত্র ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম ভালবাসা লাভ করা সম্ভব। আর একারণেই ইসলাম ধর্ম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাও তবে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম মেনে চল তবে মারেফতের জ্ঞান অর্জন করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।[৩৩]

(২) কামিল পীরের তাওয়াজ্জুহ হলে মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব । আর মুর্দা দিল জিন্দা হলে ঐ দিল দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল (স) এর খাস ফয়েজ লাভ হতে থাকে। তখন মানুষ হুজুরী দিল অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়।[৩৪]

(৩) বর্তমান জামানা অত্যন্ত মুছিবতের জামানা। এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ জলে স্থলে সর্বস্থানে বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা। তখন ঐ সকল মুছিবত হতে তারাই বাঁচবে যারা তরীকার কাজ সঠিকভাবে পালন করবে এবং জামানার মুজ্জাদ্দিদের রজ্জুকে শক্তভাবে ধারন করবে।[৩৫]

(৪) ওলী আল্লাহগণ একটি জ্বলন্ত লৌহ খন্ডের ন্যায়। একখন্ড লৌহখন্ড যেমন আগুনে পুড়ে আগুনের রঙ ধারন করে সেই রুপ আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নূরের তাজাল্লিতে জ্বলিয়া আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হন।[৩৬]

(৫) রাসূল (স)-এর মহব্বত প্রকৃত মহব্বত। রাসূল(স)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু। যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পেতে চাও তবে কামিল পীরের সাহচর্য গ্রহন কর।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করেননি। তবে ইসলামী হুকুমত কায়েম, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের পূর্ণজাগরনের জন্য ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে জাকের সংগঠন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮] তিনি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে রক্ষা করতে জাকেরদের নিয়ে প্রতিটি জেলা, থানা ও গ্রাম পর্যায়ে এ সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। এ সংগঠন রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রকাশ পায়নি তবে পরবর্তীতে ১০ই আগস্ট ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এ সংগঠনটি রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) থাকেন এ সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।[৩৯] তিনি আধুনিক যুগ ও ইসলামী চাহিদার ভিত্তিতে রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের জন্য ১৯৯১ খিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে তার ভক্ত মুরীদান তথা জাকেরানদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহনের অনুমতি দেন।[৪০] তিনি নিজে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন নি। তবে তার ভক্ত মুরীদগণ বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় "গোলাপফুল" প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন। তবে ১৯৯১ এর নির্বাচনে জাকের পার্টী কোন আসন থেকে বিজয়ী হতে পারেন নি। শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য এ রাজনীতিকে স্বীকৃতি দেন।[৪১]

সাহিত্য কর্ম ঃ

শাহ্ মূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) মসজিদ মাদ্‌রাসা, প্রতিষ্ঠা, তালিম, তরিকত ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছাড়াও সাহিত্য কর্মে ও অনেক অবদান রাখেন। তিনি সাহিত্যের প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বহু গ্রন্থ রচনা করে মুসলমানদের কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় প্রচারের পথ প্রশস্ত করেন। শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) নিজে বহু পুস্তক রচনা করেন। তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ-

১। আদাবুল মুরীদ, প্রকাশকাল ১৯৯৪ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

২। তরীকতের পাঁচ রোকন, প্রকাশকাল-১৯৯৪ ইং , প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৩। মোজাদ্দেদে আলফেস্‌সানী (র) ও খাজা মোঃ বাকী বিল্লাহ্ (র), প্রকাশকাল, ১৯৯৪ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৪। বায়েজীদ বোস্তামী (র) ও খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দী (র), প্রকাশকাল, ১৯৯৪ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৫। লতিফা সমূহের পরিচয়, প্রকাশকাল ১৯৯৪ইং , প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৬। সুলতানুল আযকার ও নফী ইসবাত জিকের, প্রকাশকাল, ১৯৯৪ ইং ১০ নভেম্বর, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৭। আত্মদর্শনের পথে-মাকাম মঞ্জিল, প্রকাশকাল, ১১ মার্চ ১৯৯৫ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

৮। বেলায়েতে নবুয়ত ও কামালাতে নবুয়াত, প্রকাশকাল ১৯৯৫ইং ১১ মার্চ , প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

Dhaka University Institutional Repository

৯। মহরাম, প্রকাশকাল ১৯৯৫ ইং ৮ জুন, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১০। বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা-পদ্ধতি, প্রকাশকাল ১৯৯৫ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১১। হাকিকতে আম্বীয়া ও হাকিকতে ইলাহীয়া, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১২। জাত ও সিফাত, প্রকাশকাল ২২ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৩। ফানা ও বাকা, প্রকাশকাল ২২ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৪। তাজাল্লিয়াতে যাত সিফাত ও আফয়াল, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৫। তৌহিদে ওজুদী ও শাহুদী এবং ছায়ারে আফাক ও আনফাস, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৬। ঈদে মিলাদুন্নবী এবং জাকের পার্টীর আদল ও লক্ষ্য, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনয়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৭। ইবাদত ও মহব্বত, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৮। মেরাজ তত্ত্ব, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

১৯। জাহেরী ও বাতেনী শরীয়ত এবং সূফীবাদ ও বিজ্ঞান, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

২০। কামেল পীরের আবশ্যকতা, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

২১। রমজান ও ঈদ, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

২২। অজিফার গুরুত্ব এবং ওরশের তাৎপর্য, প্রকাশকাল ১৯৯৬ ইং, প্রকাশনায়, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

২৩। শাহ্ সূফী এনায়েতপুরী (কুঃ ছেঃ আঃ) সাহেব কুদ্দুসা ছিরহুল আজিজ, প্রকাশকাল ১৯৯৭ ইং, প্রকাশনায় বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।[৪২]

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) এ সকল পুস্তকে মুরিদের আদব-কায়দা, তরিকতের স্তর, বিভিন্ন সূফী সাধকদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইলমে মারেফতের বিভিন্ন তত্ত্ব, আল্লাহর ইবাদতের স্বরুপ, কামেল পীরের আবশ্যকতা সহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। তিনি এ সকল পুস্তক রচনার মাধ্যমে মুরীদানদের বিভিন্ন নছিহত ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতা ঃ

দৈনিক পত্রিকা আল মুজাদ্দেদ প্রকাশনা ঃ

শাহ্ সূফী মোহাম্মদ হাশমতুল্লাহ (র) এর পুস্তক রচনার সাথে সাথে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের একটি স্বপ্ন ছিল। তিনি 'দৈনিক আল মুজাদ্দেদ' নামের পত্রিকাটি প্রকাশ করে তার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেন। তিনি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সর্ব প্রথম 'আল মুজাদ্দেদ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায় প্রতিদিন ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ে দুটি পাতা থাকত। যার মাধ্যমে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সাধারণ মানুষ পত্রিকা পড়ে জানতে পারত। তিনি এ পত্রিকা প্রকাশ করার মাধ্যমে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট অবদান রাখেন।[৪৩]

তথ্যনির্দেশ ঃ

১। মোস্তফা আমীর ফয়সাল, বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা-পদ্বতি, শাহ্ সূফী ফরিদপুরী (র), বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর ১৯৯৫ ইং, পৃ, ১৩৪

২। মোঃ আবদুস সাত্তার, ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৩ ইং, পৃ, ১৭৮

৩। শিকদার তোফাজ্জল হোসেন, আটরশির "দরবার", জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা, আকরুবিয়াত, ১ মার্চ ১৯৯৬ইং, পৃ, ২৩

৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৪

৫। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫

৬। মাহ্ফুযুল হক, সংক্ষিপ্ত ওজিফা, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর (১৯ তম সংস্করণ) ২০০০ ইং পৃ, ১৩

৭। মোঃ আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮০

৯। প্রাগুক্ত, পৃ, ৮০

১০। প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

১১। মোস্তফা আমীর ফয়সাল, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০

১২। প্রাগুক্ত, পৃ, ২০

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ, ২০

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৪

১৫। দৈনিক ইত্তেফাক-৩ মে রোজ বৃহস্পতিবার , ১ম পৃ, ৪, ৫ কলাম,

১৬। আটরশির দরবারঃ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালাঃ প্রাগুক্ত, পৃ, ১২

১৭। আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের খাদেম জনাব মোতালেব হোসেন শিকদারের বাচনিক বিবরণ হতে।

১৮। আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের খাদেম জনাব মোতালেব হোসেন শিকদারের বাচনিক বিবরণ হতে।

১৯। আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৭

২০। প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৭

২১। প্রাগুক্ত, পৃ, ৬০

২২। প্রাগুক্ত, পৃ, ৬১

২৩। বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্বতি, শাহ্ সূফী ফরিদপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৭

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ১৮-১৯

২৫। মাদ্‌রাসার-নেইম প্লেট থেকে সংগৃহীত।

২৬। আটরশির দরবারঃ জাগতিক ও আধ্যাতিক কর্মশালা, প্রাগুক্ত, পৃ, ১১-১২

২৭। আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের খাদেম, জনাব মোতালেব-হোসেন শিকদারের বাচনিক বিবরণ হতে।

২৮। আটরশির দরবারঃ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২

২৯। আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের খাদেম জনাব মোতালেব হোসেন শিকদারের বাচনিক বিবরণ হতে।

৩০। মাহ্‌ফুযুল হক, আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা ১ম খন্ড, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল-(৩য় সংস্করণ) ১৯৯৪ ইং, পৃ, ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৪

৩২। বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৫- ৫৬, ৭৫- ৭৬

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ ২৭-২৮

৩৪। আটরশির দরবারঃ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫

৩৯। মাহ্‌ফুযুল হক, আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা দ্বিতীয় খন্ড,
বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, (১ম সংস্করণ) ১৯৮৯ ইং, পৃ, ৩২

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৭

৪১। আটরশির দরবার, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কমর্মশালা, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪-১৫

৪২। বিশ্ব জাকের মঞ্জিল প্রকাশনা ও গবেষনা কাউন্সিল থেকে সংগৃগিত।

৪৩। আটরশির দরবারঃ জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আটরশী পীর সাহেবের হুজুরা খানা।

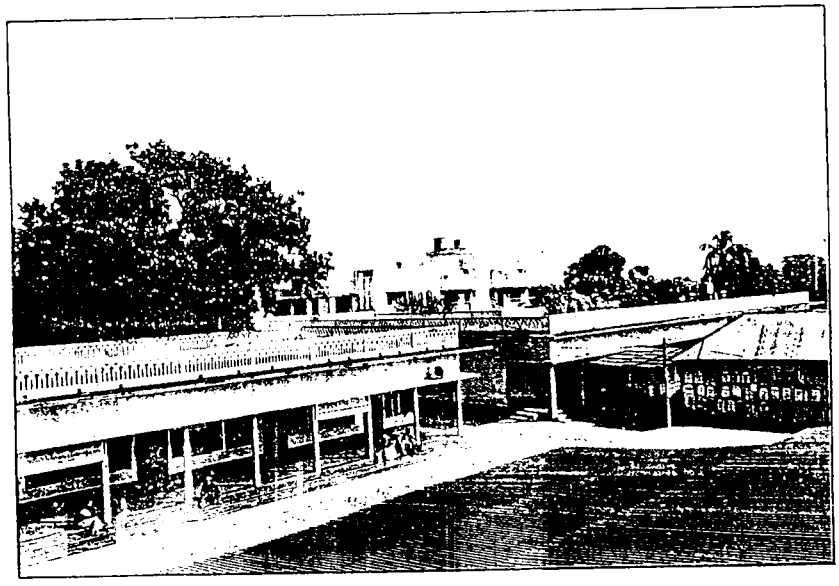

হুজরা খানা ও মুজ্জাদ্দেদীয়া লাইব্রেরীর একাংশ।

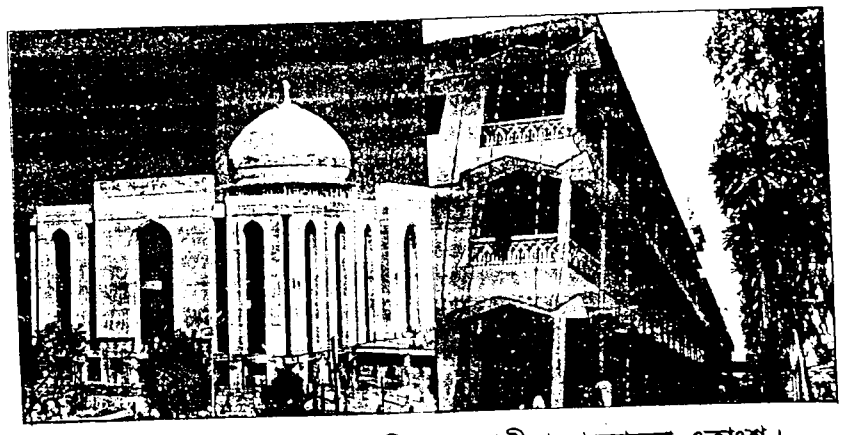

আটরশী বিশ্বজাকের মঞ্জিল, মসজিদ ও আলীয়া মাদ্‌রাসার একাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

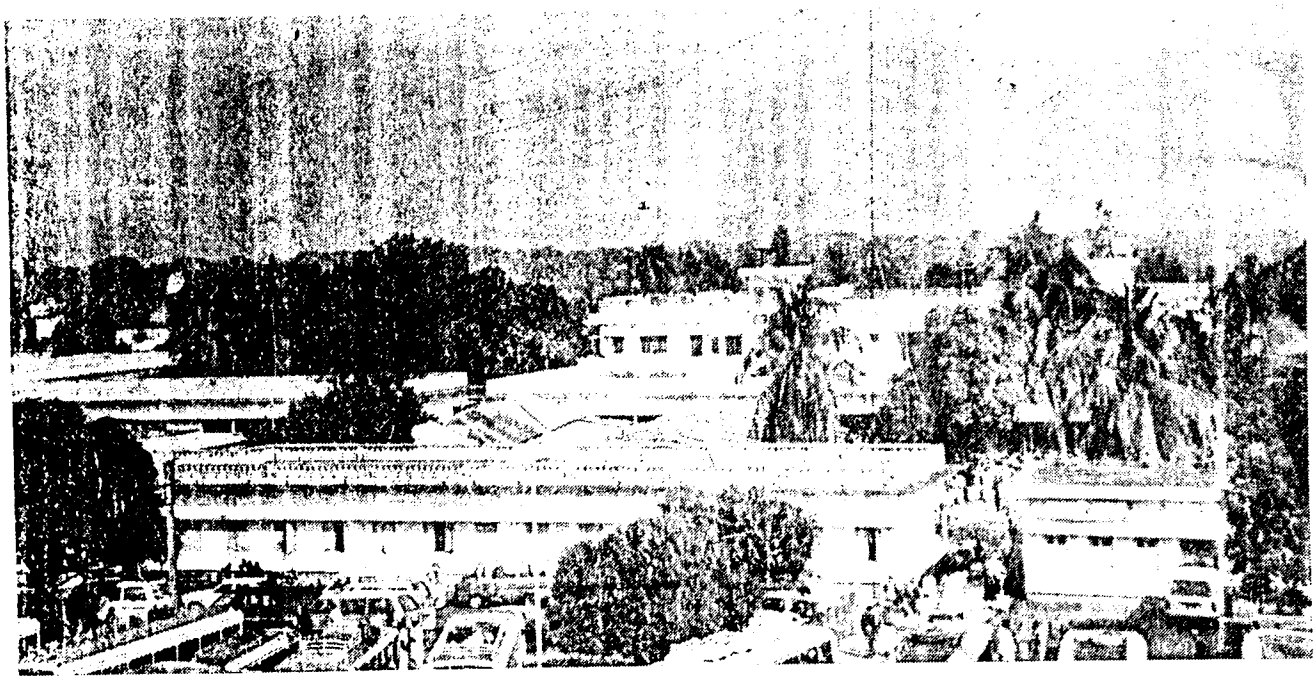

আটরশী বিশ্বজাকের মঞ্জিল।

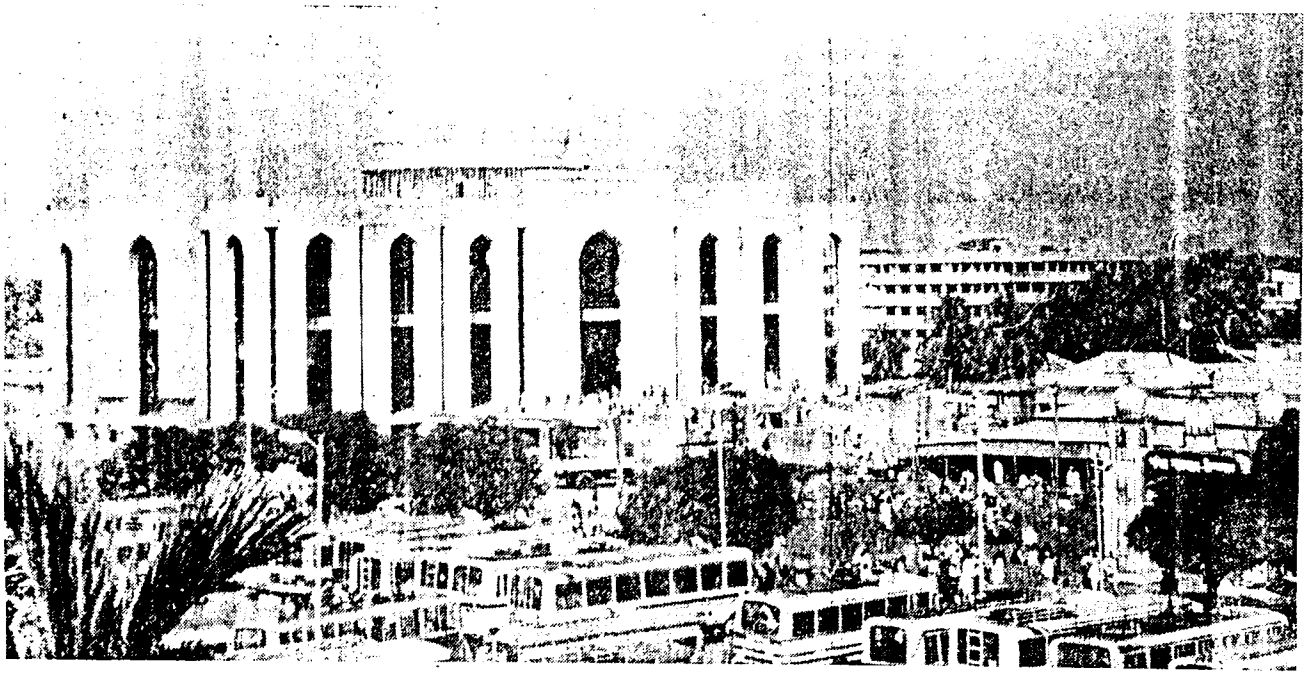

আটরশী বিশ্বজাকের মঞ্জিল, মসজিদ ও হাসপাতাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র)

(১৯১৭-১৯৯৭ খ্রিঃ)

যুগে যুগে পথভ্রষ্ট জনগোষ্ঠীকে পথের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। মহানবী (সঃ) হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তারই তীরোধানের পরে আল্লাহর দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঊনিশ শত ত্রিশ দশকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শিবচর মহকুমায় জন্ম গ্রহন করেন পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া(র)। তিনি আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথকে আদর্শ পথ হিসেবে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সকলকে এ পথের পথিক হবার আহবান জানান। তিনি ইসলাম প্রচার কালে অগণিত মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব, খানকা, জনহিতকর কার্যাবলী, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিয় ঃ

বর্তমান মাদারীপুর জেলার বরহামগঞ্জ থানার বাহাদুরপুর গ্রামে ১৯১৭ খ্রিঃ ২২ ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩২৩ বাংলা সালের ১০ ফাল্গুন পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া (র) জন্ম গ্রহন করেন। তার মাতা ছিলেন নবাব পরিবারের খাজা রাসূল বখ্‌শের কন্যা মোসাম্মৎ ছালেহা খাতুন।[১]

তাঁর পিতা আবা খালেদ রশীদ উদ্দিন আহম্মদ বাদশা মিয়া (র), পিতামহের নাম সাইদুদ্দিন (র) এবং প্রপিতামহের নাম মাওলানা পীর মোহসেন উদ্দীন আহমাদ দুদু মিয়া (র)।[২]

নামকরণ ঃ

আবু খালেদ রশীদ উদ্দিন আহমদ বাদশা মিয়া (র) (১৮৮৪-১৯৫৯) অনুধাবন করলেন। ফরায়েজী আন্দোলন তাঁর পূর্ব পুরুষ মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়ার (র) (১৮১৯-১৮৬২) ন্যায় বলিষ্ঠ ভূমিকা ব্যতীত চলতে পারেনা। তাই আগামী প্রজন্মকে ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে দরকার দুদু মিয়ার। তাই তিনি ভাবলেন তার প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নাম রাখবেন মেহসেন উদ্দীন আহম্মদ দুদু মিয়া, যিনি মুসলমানদের বিজাতীয় সভ্যতা ও পরাধীনতার নাগ পাশ থেকে মুক্ত করতে সংগ্রামে নিজের জীবন বিলিন করে দিয়েছিলেন। তাই দুদু মিয়ার নামকে আবার এদেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাদশা মিয়া (র) পুত্রের নাম রাখেন মোহসেন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া (র)। তিনি 'দুদু মিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়ার প্রাথমিক শিক্ষার সবক গ্রহন করেন পিতা বাদশা মিয়ার (র) নিকটে। তিনি পিতা ও মাতার নিকট কোরআন শিক্ষা শুরু করেন। লেখা পড়ার প্রতি তাঁর অদম্য স্পৃহা দেখে তাকে ঢাকা শহরে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করেন। তিনি কৃতীত্বের সাথে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জামায়েতে উলা অর্থাৎ ফাজিল চূড়ান্ত পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা ঃ

তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জামায়েতে উলা পাশ করে ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় গমন করেন। সেখান হতে তিনি উক্ত মাদ্‌রাসা হতে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হাদীস বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।[৫]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে পিতা বাদশা মিয়া (র) এর নিকট ইলমে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন।[৬]

খিলাফত লাভ ঃ

পীর মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়ার (র) পিতা মাওলানা বাদশা মিয়া ১৯৫৯ খ্রিঃ ১৫ ডিসেম্বর ইন্তিকাল করেন। তিনি ইন্তিকালের পূর্বে কাউকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যাননি। তাই তাঁর ইন্তিকালের ফলে ফরায়েজী আন্দোলনের আসন শূন্য হয়ে পরে। উক্ত আসন পূরণের জন্য গদ্দিনশীন মনোনীত করা আবশ্যক হয়ে পরে। কার উপর এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হবে কেই বা এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত? এ ব্যাপারে মাদ্‌রাসার শিক্ষক বৃন্দ নিজ বংশের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিলে। অনেকে মোহসেন উদ্দীন আহমদ দাদন মিয়ার নাম উল্লেখ করেন। তখন অন্দর মহল হতে পীর বাদশা মিয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যা মোহসেনা বেগম খবর পাঠান আব্বা ঢাকায় অবস্থান কালে মোহসেন উদ্দীন দুদু মিয়াকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহনের পূর্বাভাস দিয়েছেন। তখন দুদু মিয়ার ছোট ভাই মোহসেন উদ্দীন দাদন মিয়া বড় ভাই দুদু মিয়ার হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহন করেন এবং দুদু মিয়াকে ফরায়েজী জামআতের পঞ্চম গদ্দিনশীন বলে ঘোষণা করেন। তখন পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) এ মহান দায়িত্ব গ্রহন করে সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে এক ভাষন দেন। তিনি ভাষনে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে আজ যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন সেই গুরু দায়িত্ব যেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি, সে জন্যে আল্লাহর মদদ ও আপনাদের সাহায্য চাই। আমি যদি কোন ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করে দিবেন। আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবেন।[৮]

ইবাদত বন্দেগী ঃ

পীর মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) ছিলেন সুন্নাতে রাসূল (স) এর পূর্ণ অনুসারী। তিনি ফরয, ওয়াজীব, সুন্নাত নামায ব্যতীত নফল নামাযেও মশগুল থাকতেন। যখন থেকে তিনি নামায আদায় করা শূরু করেন তখন থেকেই তাহাজ্জুদের নামায ও আদায় করা শুরু করেন। কঠিন রোগ ব্যতীত কখনো তাহাজ্জুদের নামায ত্যাগ করতেন না। সর্বক্ষণ জিকির করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি রমযান মাসে বেশী বেশী ইবাদত ও ইতিকাফে মশগুল থাকতেন। তিনি কয়েকবার মসজিদে হারামে ইতেকাফ করেন। [৯]

হজ্জ্ব পালন ঃ

পীর মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) দশবার পবিত্র হজ্জ পালন করেন। তিনি ১৯৭৮ খ্রিঃ মরহুম রাষ্ট্রপ্রতি জিয়াউর রহমানের সাথে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেন। [১০]

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) দীর্ঘ ১৯৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করে ক্লান্ত হয়ে পরেন। শারীরিক দূর্বলতার কারনে দীর্ঘ দিন যাবৎ ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল রোড বাহাদুরপুর মঞ্জিলে অবস্থান করেন। অবশেষে ১৯৯৭ খ্রিঃ ৬ আগস্ট দুপুর ৩ টায় ইন্তিকাল করেন। ৮ আগস্ট শুক্রবার তাঁকে বাহাদুরপুর মঞ্জিলে দাফন করা হয়। [১১]

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

তিনি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। তিনি বৃটিশদের শোষনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনীতির সূচনা করেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ বৃটিশ শাসন কালে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে ১৯৬২ খ্রিঃ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন এবং বিবৃতি প্রদান করেন। [১২] ১৯৬৫ খ্রিঃ পি, ডি, এম, এর নির্বাচনী প্রতীকে নির্বাচন করে জয় লাভ করেন এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে খতমে নবুয়াতকে অস্বীকার কারী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভ্রান্ত মতবাদকে ও কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষনা করেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে
পাকিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন।[১৩]

১৯৫৪ খ্রিঃ শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়াদী, মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও পীর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিজামে ইসলাম ও আওয়ামী মুসলিমলীগের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৯৬৯ খ্রিঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে পীর দুদু মিয়া বক্তব্য রাখেন। এন, ডি, এফ এর পক্ষে জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ও জনাব মোহাম্মদ আলী, পি, ডি, এম, এর পক্ষে নবাবজাদা নছরুল্লাহ্ খান ও জনাব আব্দুস সালাম খান, জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলামের পক্ষে মুফতি মাহমুদ, আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম, নিজামে ইসলামের পক্ষে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মৌলভী ফরিদ আহাম্মেদ, মুসলিম লীগের মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও খাজা খায়েরউদ্দিন, জামায়াত ইসলামীর সাইয়্যদ আবুল আলা মওদুদী ও অধ্যাপক গোলাম আজম, ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহাম্মেদ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরাধী দলীয় নেতা জনাব নূরুল আমীন, স্বতন্ত্রের পক্ষে এয়ার মার্শাল জনাব শওকত হায়াত খান ও খন্দকার মোশতাক আহাম্মেদ একটানা আলোচনা করে উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানান। পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়া (র) দীর্ঘ বক্তৃতায় সমগ্র পাকিস্তানে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধির নেতাকে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানান। উপস্থিত নেতৃবর্গ পীর দুদু মিয়ার (র) বক্তব্যর সাথে একাত্বতা ঘোষনা করেন।[১৪]

১৯৭০ সালে সিলেটকে পাকিস্তান ভূক্তির গণ ভোটে হোসেন শহীদ সোহ্‌রায়াদী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সহ দেশ বরণ্য নেতাদের সাথে সিলেট সফর করে সিলেট বাসীকে গণভোটে অংগ্রহন করে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবার আহবান জানান।[১৫] ১৯৭০ সালের ২১শে ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি শেখ মজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৩৭৪ বাংলা সনের ১৩ ফাল্গুন বাহাদুরপুর শারীতিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় বার্ষিক মাহফিলে ফরায়েজী জামায়েতের আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আহবান জানান।[১৭] ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারী ঢাকায় জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সম্মেলনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হন।[১৮] ১৯৭০ খ্রিঃ ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করার উদ্দেশ্যে দেশের বরণ্যে উলামা ও মাশাইখগণ ঢাকার আজরাবাদ (মীরপুর) এ সমবেত হয়ে ঐক্যজোট গঠন করেন। তিনি উক্ত সভার সভাপতি মনোনীত হন।[১৯]

সাহিত্য কর্ম ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) ছিলেন জ্ঞান পিপাসু। তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ্ সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বহিঃবিশ্বে ভ্রমন কালে তিনি ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থসমুহ ঃ

১. **তরীকুস্ সুলুক ঃ**

তরীকুস্ সুলুক গ্রন্থটি মারিফতের উপর রচিত। এ গ্রন্থখানা রচনা করে দেশের তরীকা পন্থীদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ গ্রন্থখানা পড়ে ছারছীনার মরহুম পীর মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ্ (রা) বলেছিলেন, তরীকুস্ সুলুক কিতাবের চেয়ে মারিফতের উত্তম কিতাব আমি আর দেখিনি।[২০]

২. **সুরা ফাতিহার তাফসীর ঃ**

তিনি এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহার বিস্তারিত তাফসীর করেন এবং সূরা ফাতিহার ফাজিলত ও মর্তবা আলোচনা করেন।[২১]

৩. **গ্রামে জুমার নামায জায়েজ না নাজায়েজ ঃ**

হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ (র) গ্রামে জুমার নামায জায়েজ নয় বলে ঘোষনা দেন। যার ফলে এ বিষয়ে অন্যান্য উলামা ও মাশাইখের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। পীর দুদু মিয়াও গ্রামে জুমার নামায জায়েজ না হওয়ার ঘোষনা দেন। তাই এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তিনি গ্রামে জুমার নামায জায়েজ না নাজায়েজ এর উপর এ গ্রন্থটি রচনা করেন। যাতে গ্রামে জুমার নামায জায়েজ না হওয়ার দলীল প্রমান ও যুক্তি উপস্থাপন করেন।[২২]

অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঃ

পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) অন্যায় ও বাতিলের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁর পূর্ব পূরুষ হাজী শরীয়ত উল্লাহ (র) ও দুদু মিয়ার (র) মত আপোষহীন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কখনো আপোষ করেননি। ১৯৬৯ খ্রিঃ ২০ জানুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্র ও পুলিশ সংঘষে একজন ছাত্র নিহত হয়। পীর দুদু মিয়া, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মোহন মিয়া, সৈয়দ আজিজুল হক, মান্না মিয়া, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক মোজাফর আহমদ ও জনাব মহীউদ্দীন আহমদ সহ পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবিন্দ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে নিহত আসাদুজ্জামানের হত্যার প্রতিবাদ জানান।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ

তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করতেন। ১৯৬৯ খ্রিঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হলে তিনি মানুষের সাহায্যের জন্য 'ফরায়েজী জামায়েতের' পক্ষ হতে দূর্গত এলাকায় ছুটে যান। সেখানে দূর্গতদের মাঝে জামা, কাপড়, চাউল, আটা, লবণ, থালা-বাটিসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টন করেন।[২৪] তাছাড়া ১৯৬৯ খ্রিঃ ১৪ এপ্রিল প্রলয়ংকরী এক টর্নেডো ঢাকা শহরের উপকণ্ঠ ডেমরা এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যায়। যার ফলে মানুষের ঘর-বাড়ি, মিল-কারখানা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি সেখানেও ব্যাপক ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন।[২৫]

বিদেশী সম্মেলনে যোগদান ঃ

মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) বিভিন্ন সম্মেলনে ও সফরে চীন, ফ্রান্স, বৃটেন, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, ইস্তাম্বুল ও সৌদিআরব সফর করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মাজার ও তাঁর শিষ্য মাওলানা ইসমাইল শহীদের মাজার জিয়ারত করেন। ১৯৬৫ খ্রিঃ ৭ আগস্ট পাকিস্তানের প্রখ্যাত ওলী মাওলানা নূর উদ্দীন মোহম্মদ জায়গীরের মাজারও জিয়ারত করেন। [২৬] ১৯৬৬ খ্রিঃ ৬ আগস্ট চীনের মাও সেতুং এর আমন্ত্রণে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের একটি দল মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) এর নেতৃত্বে চীন সফরে যান। [২৭]

মাওলানা মোহসেন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া (র) ছিলেন পরহেজগার ও খোদাভীরু আলিম। তিনি ইসলাম প্রচার করাকে জীবনের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই তিনি ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. হাজী জোনায়েদ আহমদ, মাসিক শরীআত, (৮ম বর্ষ) দ্বাদশ সংখ্যা, ২০০০ ইং, মুনাদ আহমদ, মদীনা প্রিন্টার্স ঢাকা, পৃ. ৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, ৯
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০,২৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র)

(১৯২৯-১৯৯১খ্রিস্টাব্দ)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ইসলাম প্রচারের ক্রমধারায় বিংশ শতাব্দীতে যে সকল উলামা ও মাশাইখ ইসলাম প্রচারে যথেষ্ঠ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র) অন্যতম। তিনি ইসলাম প্রচারে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মক্তব,খানকা, ওয়াজ নছিহত ও জনহিতকর কার্যাবলী সহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ও বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে নিজের জীবনের অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার মকসুদপুর থানাধীন দাশের কান্দী নামক গ্রামে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তার পিতা মুন্সি মোঃ দলিল উদ্দিন এবং মাতা মালিকা বিবি। তিনি পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ।[২]

শৈশব কাল ঃ

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারীর মাতা ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করলে পরবর্তীতে দাদীর স্নেহে লালিত পালিত হন।[৩]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী পিতা মুন্সি মোঃ দলিল উদ্দিনের নিকট সর্বপ্রথম ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন ধর্মপরায়ন লোক। তিনি পুত্রকে আরবী ও বংলা শিক্ষা দিতে থাকেন। শিক্ষার প্রতি পুত্রের আগ্রহ দেখে তিনি ১৯৩৪ খ্রিঃ নিজ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি করে দেন।[৪] ১৯৩৯ খ্রিঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে ঐ এলাকায় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় পিতা তাকে ১৯৪০ খ্রিঃ স্থানীয় গোহালা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন।[৫] মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে খাপুরা এলাকার দরবেশ মাওলানা আঃ রাজ্জাক সাহেবের অনুরোধে পুএকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য তাঁর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারীকে নিজ মক্তবে আরবী শিক্ষা দিয়ে ১৯৪২ খ্রিঃ দিগনগর মাদ্‌রাসায় ভর্তি করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিঃ পযর্ন্ত এ মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষাঃ

মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী দিগনগর মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন শেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্যক্তা হাজী শরীয়ত উল্লাহ্ স্মৃতি বিজড়িত শিবচর থানার বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন।[৭] এ মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জামাতে উলা (ফাজিল) পাশ করেন।[৮] উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি পাশ করেন।[৯] অতঃপর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য ছারছিনা দারুসুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন। উক্ত মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে হাদীস সাস্ত্রে উচ্চতর কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।[১০]

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঃ

তিনি বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তিনি বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে বাহাদুরপুরের পীর সাহেব মাওলানা বাদশা মিয়ার (র) শিষ্যত্ব লাভ করেন।[১১] পরবর্তীতে ছারছিনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন কালে মরহুম মাওলানা নিছারউদ্দিন (মৃ.১৯৫২ খ্রিঃ) (র) ও মাওলানা নিয়াজ মাখদুম (মৃ.)(র) এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। সর্বশেষে ১৯৫৭ খ্রিঃ চরমোনাইর পীর সাহের মরহুম মাওলানা এছহাক (র) এর হাতে তাসাওউফ তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষার বায়াত গ্রহন করেন।[১২]

খিলাফত লাভ ঃ

তিনি ১৯৬৮ খ্রিঃ মরহুম পীর সাহেব মাওলানা এছহাক (র) কর্তৃক খিলাফত লাভ করে তরিকার দাওয়াত এর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।[১৩]

আনছারী উপাধি লাভ ঃ

তিনি ১৯৫০ খ্রিঃ শিবচর থানার বাহাদুরপুর শরীয়তিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহার, বিনয় নম্রতা অপরের প্রতি সহানুভুতিশীলতা দেখে শিক্ষক মন্ডলী তাঁকে 'আনছারী' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৪]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র) দুটি বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান হয়নি দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে চার ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। বড় ছেলে মাওলানা মোঃ আবু হাসান আনছারী বর্তমানে গদ্দীনিশিন । মেঝ ছেলে মাওলানা মোঃ কামরুল ইসলাম আবু সাঈদ আনসারী ইসলাম প্রচারক ও কোরআন তাফসীর কারক হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ ছেলে অধ্যয়নরত। বড় জামাতা গোয়ালগ্রাম মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা সূফী আঃ ছাত্তার সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উক্ত মাদ্‌রাসার বর্তমান পরিচালক মাওলানা মোঃ আবু নাঈম। ছোট জামাতা ঢাকা ডেমরা দারুন্নাজাত মাদ্‌রাসার মোহাদ্দেস পদে নিয়োজিত।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ্ব পালন ঃ

মাওলানা মোঃ দেলওয়ার হোসাইন আনছারী (র) জীবনে দুই বার হজ্জ্ব পালন করেন। তিনি প্রথম বার হজ্ব পালন করেন ১৯৭৬ খ্রিঃ । দ্বিতীয়বার হজ্ব পালন করেন ১৯৮৬ খ্রিঃ। দ্বিতীয়বার হজ্জ্ব পালন কালে অনেক শিষ্য তার সাথে হজ্জ্বে সফরসঙ্গী হন।[১৬]

ইন্তিকাল ঃ

তিনি ১৯৯১ খ্রিঃ ২২ নভেম্বর দিবাগত রাত্রে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ২৩ নভেম্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরমঙ্গল টেকের হাট রশিদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।[১৭]

রাজনৈতিক কর্ম ঃ

তিনি ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী চিন্তাবিদদের পরামর্শ ক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে তৎকালীন খাদ্য মন্ত্রী ফনীভূষন মজুমদারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে মরহুম হাফেজী হুজুর (র) এর সাথে রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করেন।[১৮]

সাংগঠনিক কার্যাবলী ঃ

তিনি দীর্ঘদিন দ্বীনের খেদমত করার পরে অনেকে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, ফলে ইসলামকে একটি নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে এর ৩৫০ টি শাখা রয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মোঃ আবুল হাসান উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত। [১৯]

বিদেশে সম্মেলনে যোগদান ঃ

তিনি যথাযথভাবে দ্বীনের দায়িত্ব পালন ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পৃথিবীর কয়েকটি দেশ, ভারত,পাকিস্তান,লিবিয়া,ইরান ও সৌদী আরবসহ বিভিন্ন দেশে সফর করেন। ১৯৮৬ খ্রিঃ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা মরহুম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (র) এর দাওয়াতে বাংলাদেশের উলামা মাশাইখের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ইরান সফর করেন। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (র) ও সেই দেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন।[২০]

ধর্মীয় কর্ম ঃ

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। তিনি দ্বীনের প্রচারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ নছিহত এর কাজে সফর করেন। তিনি মরহুম মাওলানা এছহাক সাহেব (র) এর প্রধান খলিফা হিসাবে বিভিন্ন সভায় কোরআন, হাদীসের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বীনি প্রতিষ্ঠান করার মানষে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা,মক্তব,খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি ইসলাম প্রচার কালে ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বীন শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তৎকালীন সময়ে মাদারীপুর মহকুমা ও গোপালগঞ্জ এলাকায় কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান না থাকায় একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। নিজের জন্মস্থান দাশের কান্দিতে অনুকুল পরিবেশ না থাকায় তিনি বর্তমান মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানাধীন টেকের হাট বাজারের পূর্ব পার্শ্বে জমি ক্রয় করে ১৯৬৫ খ্রিঃ 'সরমঙ্গল টেকের হাট রশিদিয়া' মাদ্‌রাসা নামে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২২] উক্ত মাদ্‌রাসায় দ্বীন শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদের সুন্নাতে রাসূল (স) এর আদর্শে গড়ে তোলেন। উক্ত মাদ্‌রাসা ১৯৭৮ খ্রিঃ আলিম এবং ১৯৮২ খ্রিঃ ফাজিল শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। উক্ত মাদ্‌রাসায় বর্তমানে ৬০০(ছয়শত) ছাত্র অধ্যয়ন করছে।[২৩]

হিফজখানা প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি কোরআনের প্রসার অনুধাবন করে একটি হিফজ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন। তাই তিনি ১৯৭৩ খ্রিঃ ফাজিল মাদ্‌রাসার নিকটে একটি হিফজখানা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪]

এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ঃ

ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অনেক এতিম ছেলেদের মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়। তাদের থাকা খাওয়া দাওয়ার জন্য ১৯৭৩ খ্রিঃ মাদ্‌রাসার সন্নিকটে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫]

আল হেরা মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি ইলমে দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সাথে মহিলাদের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে উক্ত এলাকায় একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক ইন্তিকালের ফলে উক্ত মাদ্‌রাসা চালু করে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মোঃ আবুল হাছান আনছারী ১৯৯৯ খ্রিঃ উক্ত মাদ্‌রাসা চালু করেন। বর্তমানে উক্ত মাদ্‌রাসায় ৫০০ ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।[২৬]

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ঃ

তিনি টেকের হাট সরমঙ্গল রশিদিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসার নিকটে ১৯৬৬ খ্রিঃ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত মসজিদ ছাড়া ও দীর্ঘ ৪০ বছর ওয়াজ নছিহত কালে বিভিন্ন এলাকায় বহু মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৭]

খানকা প্রতিষ্ঠা ঃ

ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভিক যুগে যখন মসজিদ বা মাদরাসার অস্তিত্ব ছিলনা। তখন ইসলাম প্রচারের একমাত্র মাধ্যম ছিল খানকা।[২৮] মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র) সারা বাংলাদেশে বহু খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে সকল খানকা প্রতিষ্ঠা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খানকা হলো নিম্নরূপ ঃ-

১. ঢাকা চিটাগাং রোড সিদ্দিরগঞ্জ, খানকা শরীফ।
২. আদমজী নগর নিউ কলোনী, খানকা শরীফ।
৩. সেগুন বাগান ওয়ারলেছ কলোনী পাহাড়তলী, চট্রগ্রাম।
৪. বাধের হাট ও ওয়াদের হাট মাইজদী, নোয়াখালী।
৫. ইচ্ছাপুর লাকসাম, কুমিল্লা।[২৯]
৬. আমিন জুট মিল, চট্রগ্রাম।
৭. কালুঘাট ইস্পাহানী জুটমিল, চট্রগ্রাম।
৮. গাদিঘাট শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।
৯. আর,কে,মিমন রোড গোপীবাগ, ঢাকা।
১০. চালিভাংগা হুমনা, কুমিল্লা।[৩০]

ওয়াজ মাহ্ফিল ঃ

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনসারী (র) ইসলাম প্রচারে খানকা প্রতিষ্ঠা ছাড়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা,থানা ও গ্রামে অঞ্চলে মাহফিল করেন এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা রেখে লোকদের ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণীত করে তোলেন। তিনি চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার প্রচারের জন্য ১৯৬৩ খ্রিঃ থেকে প্রতি বছর নিজ বাড়িতে ফাল্গুন মাসের ৯,১০ ও ১১ এবং কার্ত্তিক মাসের ২৭,২৮ ও ২৯ তারিখে বছরে দুটি মাহ্ফিল করেন।[৩১]

সাহিত্য কর্ম ঃ

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনসারী (র) বাংলা, ইংরেজী,আরবী,উর্দু,ফার্সী সহ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ওয়াজ নছিহতের সাথে সাথে লেখনীর মাধ্যমে অনেক পুস্তক রচনা করে ইসলামের খিদমত করেন। তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করেন তা নিম্নরূপ ঃ-

১.মারেফাত পন্থীদের জীবন ও ইসলামী জিন্দেগী, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ। গোপীবাগ-ঢাকা (প্রকাশকাল-১৩৯৫বাংলা)
এ পুস্তক তিনি মুরীদের প্রতি পীরের আদেশ উপদেশ, আশেকীনদের পরিচয়, নফসের ইসলাহ্ ও আমল আকিদা সহ বিভিন্ন বিষয় আলেচনা করেন।
২.বিছমিল্লার তাফছির ও বরকতের তাদবীর, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ।
গোপীবাগ-ঢাকা। (প্রকাশকাল-১৩৯৫বাংলা)
এ পুস্তক তিনি 'বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ তাফসীর করেন এবং বিসমিল্লাহ্ এর বরকত বর্ণনা করেন।
৩.বাবুল মারেফাত বা মারেফাতের দরজা, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ।
গোপীবাগ-ঢাকা (প্রকাশকাল-১৯৮৯ ইং)
এ পুস্তক তিনি শরীয়াতের প্রকারভেদসহ ইমামে মারিফাতের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং মোরাকাবা মোশাহিদার সবক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।
৪.মিফতাহুল মারেফাত, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ (প্রকাশ কাল-১৯৯০ইং)
এ পুস্তক মারেফাতের বিভিন্ন স্তর ফানা, বাকাসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.আমার নামাজ ও আল্লাহ পাকের দিদার, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ। গোপীবাগ -ঢাকা (প্রকাশ কাল -১৯৮৮ইং)

এ পুস্তক তিনি ইসলামের বুনিয়াদ নামায ফরজ হইল কেন? নামাযের তাৎপর্য সহ নামাযের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

৬.তাবিজাতে হুসাইনিয়া, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ, গোপীবাগ ঢাকা - (প্রকাশকাল ১৯৮৮ইং)

৭.বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বনবীর মিরাজ বা রকেট, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ। গোপীবাগ-ঢাকা(প্রকাশ কাল-১৯৯২ইং)

এ পুস্তকে তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)এর মিরাজকে রকেটের সাথে তুলনা করে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেন। এ গ্রন্থখানি সকলের কাছে সমাদৃত। এ পুস্তক পাঠ করলে মহানবী (স) এর মিরাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

মাওলানা মোঃ দেলায়ার হোসাইন আনসারী (র) এ সকল পুস্তক ছাড়া ও অন্যান্য বিষয় লেখা শুরু করেন। কিন্তু সে সকল বিষয় তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

মাওলানা মোঃ দেলায়ার হোসাইন আনছারী (র) ওয়াজ মাহ্ফিলের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ইসলামের বাণী প্রচার করেন।

<u>তথ্যনির্দেশ ঃ</u>

১. পীরে কামেল মরহুম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ দেলায়ার হোসাইন আনছারী (র) এর জীবন ও কর্ম, বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ ঢাকা। তারিখবিহীন, পৃ, ৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩

৩. প্রাগুক্ত ,পৃ, ৩

৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৩

৫. প্রাগুক্ত ,পৃ, ৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪

৮. প্রাগুক্ত,পৃ, ৪ ও মাওলানা কামরুল ইসলাম (টেকের হাট) হতে তার বাচনিক বিবরন হতে।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪

Dhaka University Institutional Repository

১০. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃ ,৪

১২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫

১৩. প্রাগুক্ত,পৃ, ৫ ও মাওলানা কামরুল ইসলাম (টেকের হাট) হতে তার বাচনিক বিবরন হতে।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪

১৫. মাওলানা আবুল হাসান (টেকের হাট) কর্তৃক তার বাচনিক বিবরন হতে।

১৬. মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র) এর জীবন ও কর্ম,পৃ, ৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬

২১. প্রাগুক্ত, পৃ, ৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫ ও সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ৫

২৪. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

২৫. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

২৬. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

২৭. সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ।

২৮. (ফার্সী শব্দ খানকার অর্থ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ কালেমা, নামায, রোজা, হজ্ব , যাকাত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা কেন্দ্র। একজন সাধককে কেন্দ্র করে এ খানকা গড়ে ওঠে। শয়েখ কোরআন সুন্নাহর আদর্শ ভিত্তিতে তার অনুসারীদের তালিম দিয়ে থাকেন। এ খানকার মাধ্যমে পীর সাহেব কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা মূলক ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেন। ফরিদপুর জেলায় শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (১১৭৭-১২৫৯ খ্রিঃ) এর ইসলাম প্রচারের শুরু থেকে এ খানকার সূচনা । আর সে ধারা পরবর্তী উলামা ও মশাইখদের মধ্যে প্রচলিত থাকে)। আবদুস সাত্তার , ফরিদপুরে ইসলাম,পৃ, ৯৮,৯৯

২৯. বাৎসরিক মাহ্ফিলের সময় সূচী থেকে সংগৃহিত।

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র)এর জীবন ও কর্ম,পৃ, ৬

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র)

(১৯৩৫-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে যে সকল উলামা ও মশাইখের আবির্ভাব ঘটে মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি এ দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অপরিণত বয়সে ইন্তিকালের ফলে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের সবগুলো বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। অতএব, তাঁর কালজয়ী অবদান ও কর্মময় জীবন আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার সাহেরামপুর গ্রামে ১৯৩৫ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মুন্সী আবদুল করিম। তাঁর পূর্ব পুরুষ সাহেবরামপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন।[১]

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী মায়ের নিকট সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ গ্রহন করেন। পিতার নিকট কোরআন শিক্ষা গ্রহন করেন। অতঃপর নিজ এলাকা সাহেবরামপুর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন ।[২]

উচ্চতর শিক্ষা ঃ

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজ এলাকায় জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হন। তিনি জুনিয়র স্কুলে অধ্যয়ন শেষে কালকিনি থানার স্নানঘাটা সিনিয়র মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৪৪ খ্রিঃ পযর্ন্ত অধ্যয়ন করেন।[৩] অতঃপর ১৯৪৫ খ্রিঃ চাঁদপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। ১৯৪৭ খ্রিঃ চাঁদপুর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের আধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উক্ত মাদ্‌রাসা হতে ১৯৪৯ খ্রিঃ ফাজিল পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৫০খ্রিঃ ঢাকা মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া হতে প্রথম শ্রেণীতে কামিল হাদীস বিভাগে উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।[৪]

অতঃপর মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী আরবী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য ১৯৫১ খ্রিঃ তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে মিসর আল আযাহার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর অধ্যয়ন করে ১৯৫৩ খ্রিঃ ধর্মতত্ত্বে তাখাস্‌সুস(অনার্সসহ) প্রথম শ্রেণীতে "আলামিয়্যাহ" ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর তিনি মিসরের রাজধানী কায়রোস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৫ খ্রিঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পূনরায় আল আযাহার বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়াহ অনুষদে ভর্তি হয়ে ১৯৫৬ খ্রিঃ তাখাসসুস (অর্নাসসহ) শরীয়াহ্ বিষয়ে "আলামিয়্যাত" ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৬ খ্রিঃ তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম জীবন ঃ

মাওলনা মুহাম্মদ আলউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৫৬ খ্রিঃ মিসর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ইনিষ্টিটিউট অব রিলিজিয়নে খন্ড কালীন প্রভাষক পদে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিঃ পযর্ন্ত তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রিঃ অধ্যাপনা শেষে দেশে ফিরে এসে বাংলা একা ডেমীতে অনুবাদ শাখায় অফিসার পদে যোগদান করেন। ১৯৫৯ খ্রিঃ পযর্ন্ত এ দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন।[৬] অতঃপর ১৯৫৯ খ্রিঃ ঢাকা মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ায় আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রধান মাওলানা পদে উণ্নিত হন। তিনি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যাপনার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের খন্ডকালীন প্রভাষক পদে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পযর্ন্ত তিনি এ দুটি পদে নিয়োজিত ছিলেন।[৭]

বৈবাহিক জীবন ঃ

মাওলনা মুহাম্মদ আলউদ্দীন আল-আযহারী (র) ১৯৫৯ খ্রিঃ ৩ জুন ঢাকা মগবাজারস্থ এলাকার মাওলানা গোলাম কবির সাহেবের কন্যা বেগম জাহানারাকে বিবাহ করেন। মাওলনা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) এর কোন সন্তান ছিলনা।[৮]

হজ্জ্ব পালন ঃ

মাওলনা মুহাম্মদ আলউদ্দীন আল-আযহারী (র) মিসরে অধ্যয়ন কালে ছাত্র অবস্থায় একবার হজ্জ্ব পালন করেন।[৯]

ইন্তিকাল ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী ১৯৭৮খ্রিঃ ২৭ মার্চ সকালে পিজি হাসপাতালে ইন্তি কাল করেন। তাঁকে ঢাকা মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ স্বীয় বাস ভবন সংলগ্ন মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে যান। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিলনা। তাঁর স্ত্রী বর্তমানে জীবিত রয়েছেন।[১০]

সামাজিক কর্ম ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযাহারী (র) বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য "বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি" ও "বাংলদেশে মসজিদ মিশন" নামে দুটি সমিতির মাধ্যমে যুব সমাজকে সামাজিক অবক্ষয় থেকে সচেতন করার বিভিন্ন মুখী কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক ইন্তিকালের ফলে গৃহীত পদক্ষেপের সবগুলো কার্যক্রম শেষ করে যেতে পারেনি।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় কর্ম ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলউদ্দীন আল-আযহারী (র) ধর্মীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। "বাংলাদেশে মসজিদ মিশন" প্রতিষ্ঠা করে মসজিদ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরবী পত্রিকা,রেডিওর মাধ্যমে আরবী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বাংলদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সরকার মাদ্‌রাসা শিক্ষা বন্ধের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মাওলানা মুহাম্মদ আলউদ্দীন আল-আযহারী ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক, ডঃ এনামুল হক, মাওলনা তর্কবাগীশ, মাওলানা মুহিউদ্দীন শামী এবং মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ প্রমুখের সহযোগিতায় মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নতি কল্পে "বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্কার সমিতি" গঠন করে ইসলামী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন।[১২]

সাহিত্য কর্ম ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে সাহিত্যর ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ইসলামের খেদমতে তাফসীর গ্রন্থসহ অন্যান্য বিষয় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ-

১. তিনি ১৯৬১ খ্রিঃ সর্ব প্রথম "The Theory and Sovrces of Islami law for Non Muslims" নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া কর্তৃক ১৯৬১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়।
২. "আরবী বাংলা অভিধান" ৮০ হাজার শব্দ সম্বলিত বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত (৫ খন্ডে সমাপ্ত) প্রকাশকাল, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৩. "নীতি ও দূর্নীতি"। প্রকাশকাল-১৯৬১খ্রিঃ।
৪. "তাজরীদুল বোখারীর অনুবাদ",(২ খন্ডে বিভক্ত)।
৫. "সহজ আরবী শিক্ষা"। প্রকাশকাল- ১৯৬২ খ্রিঃ।
৬. "আল আদাবুল আছরিয়া" (পাঠ্য পুস্তক) প্রকাশকাল-১৯৭১ খ্রিঃ।
৭. "ইসলামিয়াত" (পাঠ্য পুস্তক), প্রকাশকাল, ১৯৭১ খ্রিঃ।
৮. "বাংলা আরবী অভিধান" (১ম খন্ড),প্রকাশ কাল, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
৯. "তাফসীরে মাজহারী" (১ম খন্ড), প্রকাশ কাল, ১৯৬৩ খ্রিঃ।
১০. "জমহুরীয়াতুল পাকিস্তান আরবী পুস্তক"।
১১. "আরবী বাংলা কথোপকথন"।
১২. "তাফসীরে আযহারীর ভূমিকা", প্রকাশ কাল, ১৯৬৩ খ্রিঃ
১৩. "বিশ্ব জনীন দার্শনিক ধর্ম ইসলাম"।
১৪. "ঢাকা আলিয়া মাদ্‌সার ইতিহাস", ঢাকা মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত।
১৫. "আল ফালাছিফাতুল ওয়হিদিয়া"(আল আযাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাপুস্তকের অর্ন্তভূক্ত ছিল)।
১৬. "হাযিহি হিয়া বাংলাদেশ" আরবী ভাষায় বাংলাদেশের পরিচিতি মূলক পুস্তিকা।
১৭. "আল ইনশাউল আছরী"।
১৮. "যাহা বাংলাদেশ"
১৯. "ইংরেজী ভাষা ও উহার উপকারীতা"।
২০. "কোরআন ও বিজ্ঞান" (পান্ডুলিপি),প্রকাশকাল ১৯৬১খ্রিঃ।
২১. "আল আযহারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" (পান্ডুলিপি)।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত গ্রন্থ ছাড়া মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযাহারী বহু গ্রন্থ লিখেছেন যা প্রকাশিত হয়নি। অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে।

১. "বাংলা আরবী অভিধান" (ব্যঞ্জনবর্ণ অনুযায়ী বিন্যাস্ত)
২. "উর্দু বাংলা অভিধান" ।
৩. "তাফসীরে আযহারী" ।
৪. "কোরআন কোষ অভিধান" ।
৫."ইসলামের ইতিহাস" (৭ খন্ডে)[১৪]

তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে ইসলাম শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি রেডিওতে "পথ ও পাথেয়" নামক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে ইসলামী বিষয় আলোচনা করতেন এবং আরবী অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তিনি আরবী সাহিত্যে উচ্চস্তরের পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ঊনিশ শত ষাট দশকে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের বাংলাদেশে আগমন করেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে আরবীতে এক নাতিদীর্ঘ ভাষন দেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী উক্ত বক্তৃতার আরবী বাংলায় অনুবাদ করে সকলকে বুঝিয়ে দেন। তিনি বাংলা একাডেমী ও "ইসলামীক একাডেমীর"(ই,ফা,বা) আজীবন সদস্য ছিলেন।[১৫]

পত্রিকা প্রকাশ ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) বাংলাদেশে আরবী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এদেশে সর্ব প্রথম "আস্ সাকাফা" নামে একটি মাসিক আরবী পাত্রিকা প্রকাশ করেন। যার মাধ্যমে আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আরব বিশ্ব বাংলাদেশে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করে।[১৬]

বিদেশী সম্মেলনে যোগদান ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি সৌদি আরব, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, আরব আমীরাত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তিনি ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে দু'বার সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে যোগদান করেন এবং "লেলিন গ্রান্ডের চাবি" উপহার হিসেবে লাভ করেন।[১৭]

পরিশেষে বলা যায় যে, মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) এক কীর্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ইসলাম প্রচারে বাংলাদেশের আরবী সাহিত্যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যে সকল কর্মমূখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর আরদ্য কাজগুলো পূন পরিচালনার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ঃ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকল্প, (২য় খন্ড) পৃ, ৬৪২ ;
জুলফিকার আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ (২য় খন্ড)
১৯৮৮ ইং পৃ, ১১৯

২. বার্ষিকী "প্রতয়" ২০০০ ইং হাকিমুননেছা প্রাথমিক বিদ্যালয় কালকিনি, মাদারীপুর, ২০০০ ইং পৃ, ১৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৯

৪. মাসিক মাদ্‌রাসা ৫ম বর্ষ,৭ম সংখ্যা, মার্চ ২০০১ ইং পৃ, ২১

৫. প্রাগুক্ত, পৃ, ২১

৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১১৯

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৪২

৮. মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) এর স্ত্রীর বাচনিক বিবরণ হতে।

৯. মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী (র) এর স্ত্রীর বাচনিক বিবরণ হতে।

১০. মাসিক মাদ্‌রাসা ৫ম বর্ষ,৭ম সংখ্যা, মার্চ ২০০১ ইং পৃ, ২৩ ; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৪২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ, ২২

১২. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৪-১২৫

১৩. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২০

১৪. মাসিক মাদ্‌রাসা ৫ম বর্ষ,৭ম সংখ্যা, মার্চ ২০০১ ইং পৃ, ২২-২৩

১৫. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২১-১২৪

১৬. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২০-১২১

১৭. জুলফিকার আহমদ কিসমতি, প্রাগুক্ত, পৃ, ১২০;
মাসিক মাদ্‌রাসা ৫ম বর্ষ,৭ম সংখ্যা, মার্চ ২০০১ ইং পৃ,

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

সার্বিক বর্ণনার আলোকে পরিশেষে বলা যায় যে, উনিশ শতকে বৃহত্তর ফরিদপুরের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফরিদপুরে ইসলাম আগমনের পূর্বে ফরিদপুর জেলায় আরব বণিকগণ কোটালিপাড়ায় আগমন করেন। যার কারণে প্রাচীন কালে কোটালিপাড়ায় রাজন্যবর্গরা তাদের বসতি স্থাপন করেন। কালের স্রোতে একসময় কোটালিপাড়ায় আগমনের নদী পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ব্যবসা বানিজ্যের ক্রমধারা ফরিদপুর জেলায় বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে আঠার শতকে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি ফরিদপুর জেলায় তাদের আধিপত্য বিস্ত -ার করে। তাদের ছত্র ছায়ায় হিন্দু জামিদারগণ মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন চালায়। মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালনের পরিবর্তে হিন্দু রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠি কৃষকদের একমাত্র সম্বল ফসলী জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। কিন্তু মুসলমানগণ সহজেই তাদের চাপিয়ে দেওয়া আদেশ মেনে নেয়নি। তবে অনেকে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে করদান ও নীল চাষ করতে বাধ্য হয়। যারা মেনে নেয়নি তাদেরকে অমানবিক নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছে। হিন্দুরা তাদের স্বার্থ উদ্ধার ও ক্ষমতার লোভে বৃটিশদের গোলামের জাতিতে পরিনত হয়। বৃটিশ শাসক গোষ্ঠির নিকট মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা অধিক বিশ্বস্ত ও প্রিয় বিশ্বাসের পাত্রে পরিনত হয়। হিন্দুরা এ সুযোগ নিয়ে তাদের অবস্থান পাকা-পোক্ত করে নেয়। ফলে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠি হিন্দুদের ক্ষমতার কিয়দাংশ দান করে ক্ষমতা পেয়ে হিন্দুরা স্বল্পকালে জমিদারী অবস্থানে পৌছে।

মুসলমানগণ বৃটিশ শাসক ও হিন্দুদের নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন সংগ্রামী নেতার সন্ধান করছিল। মুসলমানদের সে আশা পুরনে বলিষ্ট নেতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিয়ে জনসম্মুক্ষে আসে হাজী শরীয়ত উল্যাহ (র)। তিনি ফরায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ধর্মীয় অনুশাসন পালনের জন্য সকলকে আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে অনেক মুসলমান এগিয়ে আসে। কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন জীবনের আন্দোলনে ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের নির্যাতন নিপিড়ন থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁরই সন্তান মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া (র) ফরায়েজী আন্দোলনের হাল ধরে ইংরেজ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেন এবং ইংরেজদের আরোপিত অবৈধ কর দিতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করেন। তাঁর এ আহবানে অসংখ্য মুসলমান সাড়া দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ইংরেজ ও হিন্দুরা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাঁকে বারবার কারাগারে বন্দী করে কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতেও ফরায়েজী অনুসারীরা তাদের আন্দোলনকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেয়। তাঁর আকস্মিক ইন্তিকালের ফলে পরবর্তী যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজী আন্দোলন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ (র) ও মোহসেন উদ্দিন আহমদ দুদু মিয়ার পরে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) কোরআন ও হাদীসের আলো বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। লিখনির মাধ্যমে তুলে ধরেন ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা ও আ'দর্শ। আরো অসংখ্য উলামা ও মাশাইখ ১৮০০-১৯৮০ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুরকে ইসলামের আলোক বর্তিকা প্রজ্জলিত করতে সক্ষম হন। সুতরাং সমাজ সেবা, আধ্যাত্মিক উন্নায়ন, ইসলাম বিস্তার ও শিক্ষার উন্নয়নে ফরিদপুর জেলার উলামা ও মাশাইখের অবদান বর্তামন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য চির স্মরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ঃ

Nurul Islam Khan ঃ Bangladesh District Gazetteers Faridpur Bangladesh Govermment Press. Dacca-197

Dr. Mun-ud-din Ahmad Khan ঃ History of the Faridi Movement, Islamic Foundation of Bangladesh, 1948.

Board of Researchers ঃ Islam in Bangladesh Through Ages Islamic Foundation of Bangladesh. 1995.

P. K. Hitt ঃ The Aryan. London. 1965

Dr. Mohammad Mohar Ali ঃ History of the Muslims of Bengal. Vol. IB. Riyath. 1985

Md. Abdur Rahim ঃ Social and Cultural History of Bengal. Vol. 1. Karachi

Dr. Md. Enamul Haq ঃ A Historyof Sufim in Bengal. Dhaka .1975

গোলাম সাকলায়েন ঃ বাংলাদেশে সূফী-সাধক, ই. ফা. বা. ১৯৮৭ ইং

মোঃ আবদুস সাত্তার ঃ ফরিদপুরে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৩ ইং

আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০ ইং

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ১৯৪৮ ইং

মোশারফ হোসেন খান ঃ হাজী শরীয়তুলাহ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা, ১৯৯৫ ইং

মাওলানা আবদুল লতিফ (শরীফাবাদী) ঃ হাজী শরীয়ত উলাহ সাহেবের অমর জীবনী, শরীয়তিয়া প্রকাশনী গৌরনদী, বরিশাল, ১৯৫৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository

ডবিউ. ডবিউ. হান্টার	ঃ	দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ (অনুবাদঃ এম আনিসুজ্জামান) খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০০ ইং
মোঃ আবদুল জলিল খান	ঃ	ফরিদপুর গাইড, ১৯৯৮ ইং
আজিজুল হক বান্না	ঃ	বরিশালে ইসলাম, ই. ফা. বা. ১৯৯৪ ইং
ডঃ আবদুল করিম	ঃ	বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রিঃ) বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং
রাজিয়া মজিদ	ঃ	শতাব্দীর সূর্য শিখা, (১ম খন্ড) ই. ফা. বা. ১৯৯৩ ইং
রাজিয়া মজিদ	ঃ	শতাব্দীর সূর্য শিখা, (২য় খন্ড) ই. ফা. বা. ১৯৯৪ ইং
ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প	ঃ	ই.ফা.বা. (২য় খন্ড)
ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প	ঃ	ই.ফা.বা. (১৩ খন্ড)
ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প	ঃ	ই.ফা.বা. (১৪ খন্ড)
ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প	ঃ	ইসলামী ফাউন্ডেশান বাংলাদেশ, (২৩ খন্ড)
জুলফিকার আহমদ কিসমতী	ঃ	বালাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ প্রগতি প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৮ ইং
মিসবাহুল হক	ঃ	পলাশীর যুদ্ধত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ ই. ফা. বা. ১৯৮২ ইং
মোহাম্মদ মোদাব্বের	ঃ	ইতিহাস কথা কয় (১ম সংস্করন), ১৯৮১ ইং
নূরুন্নাহার বেগম	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৮৮ ইং
গোলাম রসূল মিহ্‌র	ঃ	মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড) ই. ফা. বা. ১৯৮৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক নোমান রাজা	ঃ	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৮৪ ইং
ডক্টর আজিজুর রহমান মলিক	ঃ	বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ইং
হুমায়ন আবদুল হাই	ঃ	মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, ১৯৮৩ ইং
মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দীন	ঃ	তায্‌কেরাতুল আওলীয়া (১ম খন্ড) বর্নালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪ ইং
সিরাজুল ইসলাম	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (১ম খন্ড রাজনৈতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং
সিরাজুল ইসলাম	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (২য় খন্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং
সিরাজুল ইসলাম	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (৩য় খন্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং
ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম ডঃ আবদুল মমিন চৌধুরী ডঃ এ.বি.এ. মাহমুদ ডঃ সিরাজুল ইসলাম	ঃ ঃ ঃ ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (৯ম সংস্করন) নওরোজ কতাবিস্তান ঢাকা, ২০০১ ইং
আব্বাস আলী খান	ঃ	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১ম ২য় ভাগ) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন ঢাকা, ১৯৯৪ ইং
অধ্যাপক কে. আলী	ঃ	মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৭৯ ইং
ডক্টর আব্দুল করিম	ঃ	মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২ ইং

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার	ঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), ৩য় সংস্কারন কলিকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ
মোহাম্মদ আমীর হোসেন	ঃ	সমাজ বিজ্ঞান, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮০ ইং
শরীফ মুহাম্মদ মুজিবুল হক	ঃ	হযরত শাহ্ সাইয়েদ বদিউদ্দীন শাহ্ মাদার (র), ১৯৯৯ইং
পীরজাদা মুহীবউদ্দী আহমাদ	ঃ	আপোষহীণ এক সংগ্রামী বীর দুদু মিয়া শরীয়াতিয়া প্রাকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ ইং
গোলাম মোর্তাজা	ঃ	চেপে রাখা ইতিহাস,
মোহাম্মদ মোদাব্বের	ঃ	ইতিহাস কথা কয়, ১৯৮১ ইং
মোহাম্মদ ছিদ্দিক খাঁন	ঃ	পীর দুদু মিয়া, ১৯৯১ ইং
মোস্তফা আমীর ফয়সাল	ঃ	বিশ্ব জাকের মঞ্জিল পরিচালনা পদ্ধতি, ফরিদপুর, ১৯৯৫ ইং
শিকদার তোফাজ্জেল হোসেন	ঃ	আটরশি দরবার, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মশালা, ১৯৯৬ইং
মাহফুযুল হক	ঃ	আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা ৩য় সংস্করন (১ম খন্ড) ১৯৯৪ ইং
মাহফুযুল হক	ঃ	আটরশির দরবার, আটরশির কাফেলা ১ম সংস্করন (২য় খন্ড) ১৯৮৯ ইং
মাহফুযুল হক	ঃ	সংক্ষিপ্ত ওজিফা, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর, ২০০০ইং
আহকার আব্দুর রাজ্জাক ফরিদপুরী	ঃ	গওহারডাঙ্গা মাদরাসার মোহতামেম সাহেবের জীবনী গোপালগঞ্জ, ১৯৯৪ ইং
মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক	ঃ	সমাজ সংস্কারক আল্লামা শামছুল হক (র) জীবনী খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, মার্চ ১৯৯৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ সালমান ঃ ✓ হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র) স্মারক গ্রন্থ আল কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ইং

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ঃ ✓ মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেবের (র) সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিশ্ব নবী (স) একাডেমি, ১৯৮৯ ইং

মোহাম্মদ তৈয়্যব ঃ
শরীফ মুহাম্মদ ঃ আলোর কাফেলা, প্রকাশনী জামেয়া কোরআনিয়া
আহ্‌লুলাহ্‌ ওয়াছেল ঃ আরাবিয়া লালবাগ, ১৯৯৭ ইং

মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর ঃ মোযাদ্দেদে আযম আলামা শামছুল হক (র)

✓ছদর সাহেব হুজুরের পাঠ্য জীবন, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ১৯৯৮ ইং

মাওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন ঃ তাযকেরাতুল আউলিয়া (১ম খন্ড),

বর্নালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪ ইং

আবু আল সাঈদ ঃ সাতচলিশের অখন্ড বাংলা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তান

থেকে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং

মাওলানা মোঃ কামরুজ্জমান কবীর ঃ ✓ আলামা শামছুল হক (র) স্মরণিকা, খাদেমুল ইসলাম

পাবলিকেশন্স টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ (২য় প্রকাশ) ১৯৯৭ ইং

মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন ঃ জীবন ও কর্ম

মাসিক মাদ্‌রাসা ঃ ৫ম বর্ষ , ৭ম সংখ্যা মার্চ ২০০০ ইং

মাসিক শরীয়ত ঃ ৮ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, ২০০০ ইং

বার্ষিকী প্রত্যয় ঃ হাকিমুন্নেছা প্রথমিক বিদ্যালয়, কালকিনি, মাদারীপুর, ২০০০ ইং

প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ঃ নূর মোহাম্মদ কেবলা, ১৯৯৭ ইং

দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ৩ মে, ২০০১ ইং

দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ বাং

দৈনিক ইনকিলাব ঃ ১৭ অক্টোবর, ১৯৯৬ ইং

দৈনিক যুগান্তর ঃ ১০ মে, ২০০২ ইং

দৈনিক আজাদ ঃ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ইং